গল্পদের গল্প

গল্প সবারই খুব প্রিয় জিনিস। সবাই গল্প শুনতে ভালবাসে। অনেক সময় এমনও হয় যে অনেকেই গল্প শুনতে শুনতে ক্ষিদে , ঘুম, পিপাসা সব ভুলে যায়। গল্প বলতে বা শুনতে কার না ভালো লাগে!

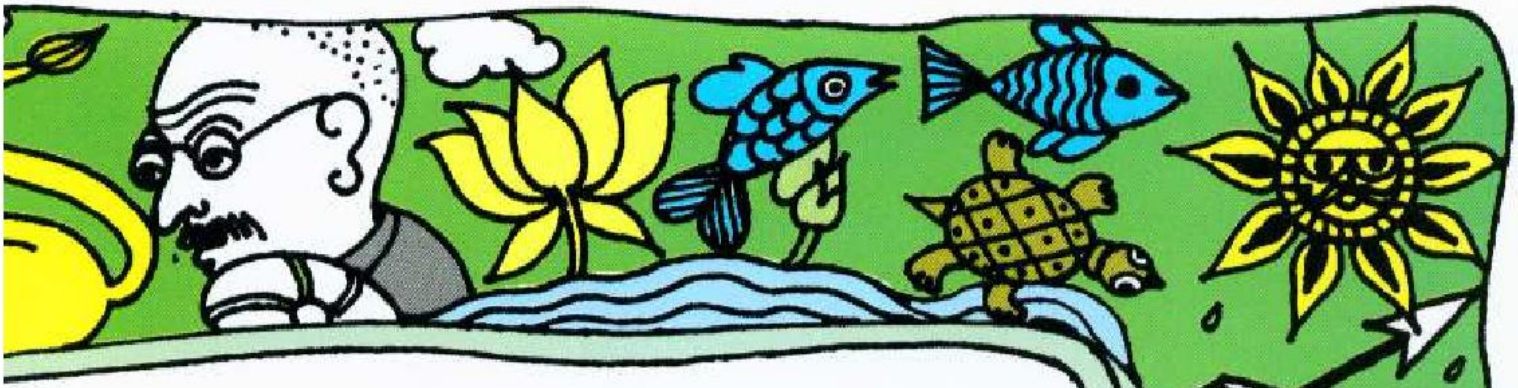
আমরা সবাই জীবনে যে কত গল্পই শুনেছি বা শুনিয়েছি- তার কোন হিসেব নেই। তা গুনেও শেষ করা যাবে না। এই সব গল্প নানান রকমের হয় – যেমন গাছ গাছালির, পশু পাখির, রাজা রানীর, বীর পুরুষের, জাদুগরের, ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, দাদু-দিদিমাদের, হাসি তামাশার। আবার অনেক গল্প এরকম হয় যা নাকি সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে।



তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে এই গল্প গুলো এল কোথা থেকে? এসো, আজ তোমাদের সেই গল্প শোনাই।

এক গ্রামে একজন সজ্জন থাকত। একদিন তার এক বন্ধু ওকে একটা গোপন কথা জানায়। বেশ কিছুদিন ধরে সে সেই কথা তার মনেই লুকিয়ে রেখেছিল। কাউকে বলতে না পেরে তার পেট রোজ ফুলছিল। থাকতে না পেরে সে একদিন নিজের বউকে সেই গোপন কথাটা জানায়।

তারপর আর কি? ওর বউয়েরও পেট ফুলতে থাকে। সেও এই গোপন কথাটা বেশি দিন চেপে রাখতে পারল না। সে করল কি? বাগানে গিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে, গর্তকেই কথাটা বলল। আর তারপরে গর্তটাকে মাটি দিয়ে ভরিয়ে ফেলল। কিছুদিন পর, ওই জায়গায় একটা গাছ গজাল। তারপর সেই গাছের কাঠ দিয়ে একটা বাঁশি বানানো হল। এরপর সেই বাঁশিটা সারা গ্রামময় গল্পটি শুনিয়ে বেড়াতে লাগল।



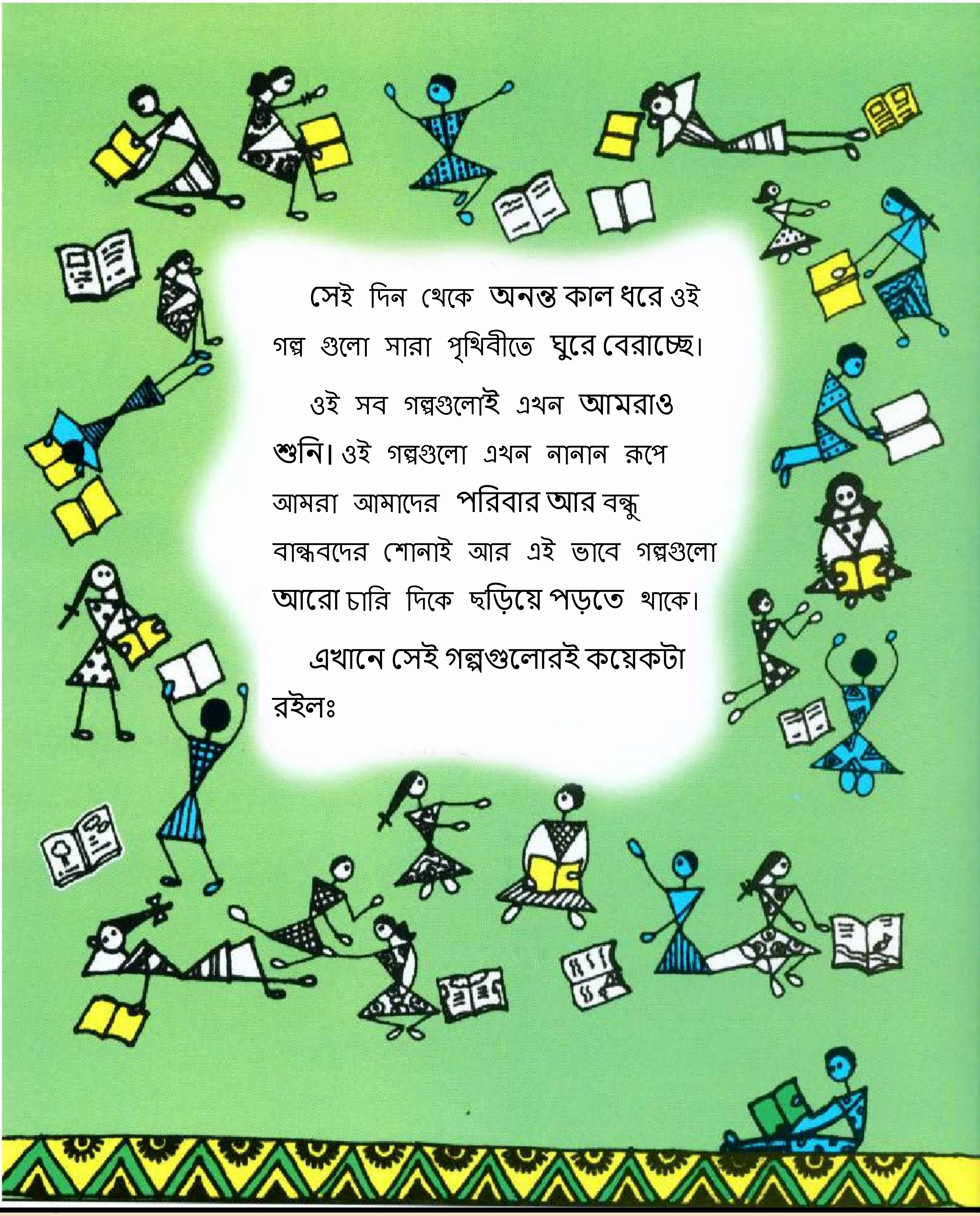
এবার শোনো সুদূর আফ্রিকার একটা গল্প। বহু আগে একটা ইঁদুর (মেয়ে) ছিল। সে সব জায়গায় দাপিয়ে বেড়াতো। কখনো রাজার মহলের ভেতর, কখনো ঝোপে ঝাড়ে বা কখনো এর বাড়ি – ওর বাড়িতে।

আর ইঁদুরটি প্রতিটা বাড়ির দেওয়ালের গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থেকে সবার কথা শুনতো। আর তার পর সেই কথাগুলো গাছের নিচে একটা গর্তের মধ্যে সাবধানে লুকিয়ে রাখত। ও গল্প গুলোকে খুবই ভালো বাসতে লেগেছিল।

একটা চালাক শেয়াল রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ইঁদুরটির এই কাণ্ড দেখতো। একদিন শেয়ালটা ওই গর্তটাকে খোঁড়া শুরু করল। সাথে সাথে সব গল্পগুলো কাঁপতে কাঁপতে নড়ে চড়ে উঠল। তারা সব হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে এদিকে ওদিকে দৌড়ে পালাতে থাকল- এ শহর থেকে ও শহরে, শহর থেকে গ্রামে, খামারে, প্রান্তরে, চারিদিকে...







সেই দিন থেকে অনন্ত কাল ধরে ওই গল্প গুলো সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেরাচ্ছে।

ওই সব গল্পগুলোই এখন আমরাও শুনি। ওই গল্পগুলো এখন নানান রূপে আমরা আমাদের পরিবার আর বন্ধু বান্ধবদের শোনাই আর এই ভাবে গল্পগুলো আরো চারি দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এখানে সেই গল্পগুলোরই কয়েকটা রইলঃ

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

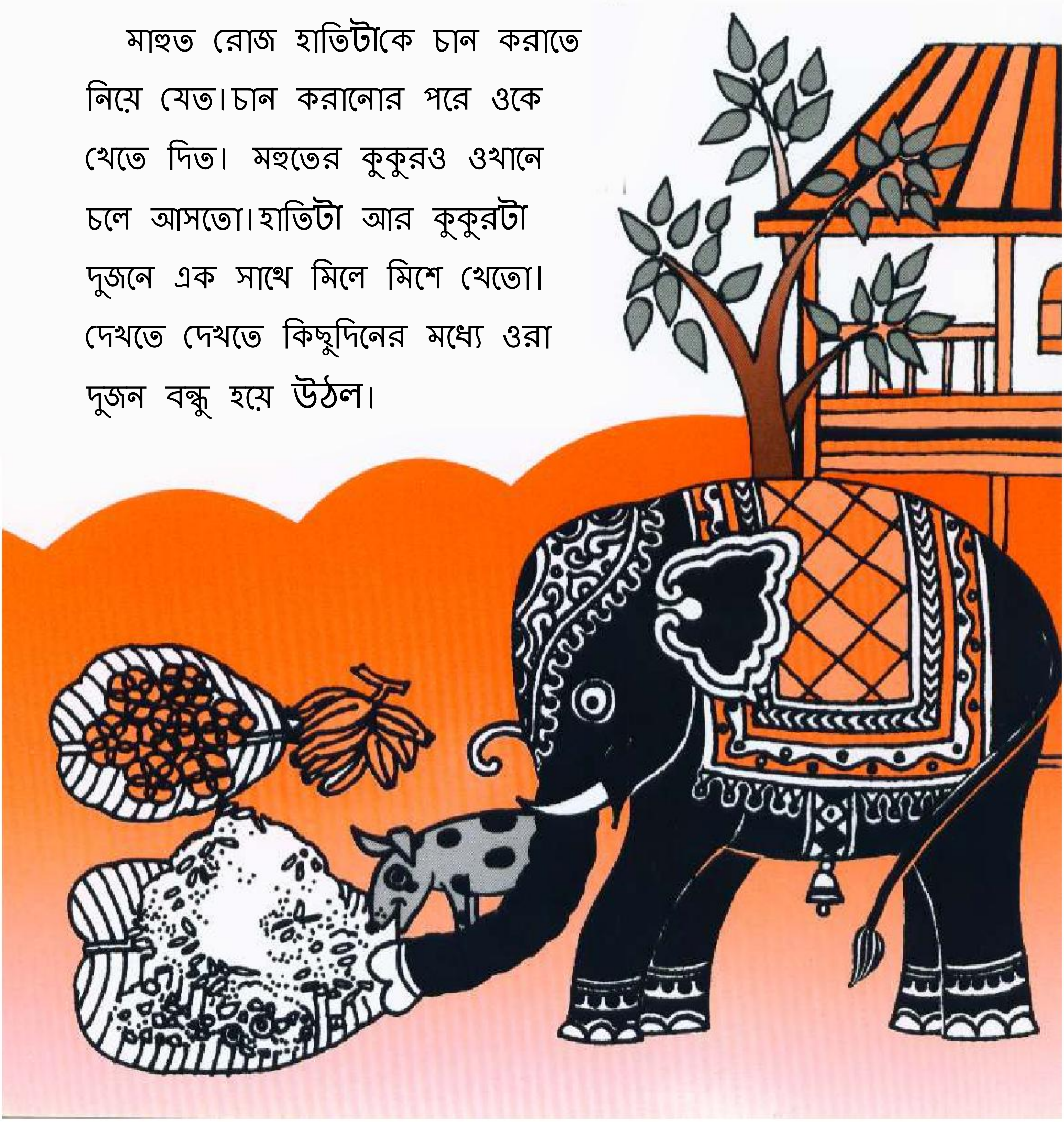
Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

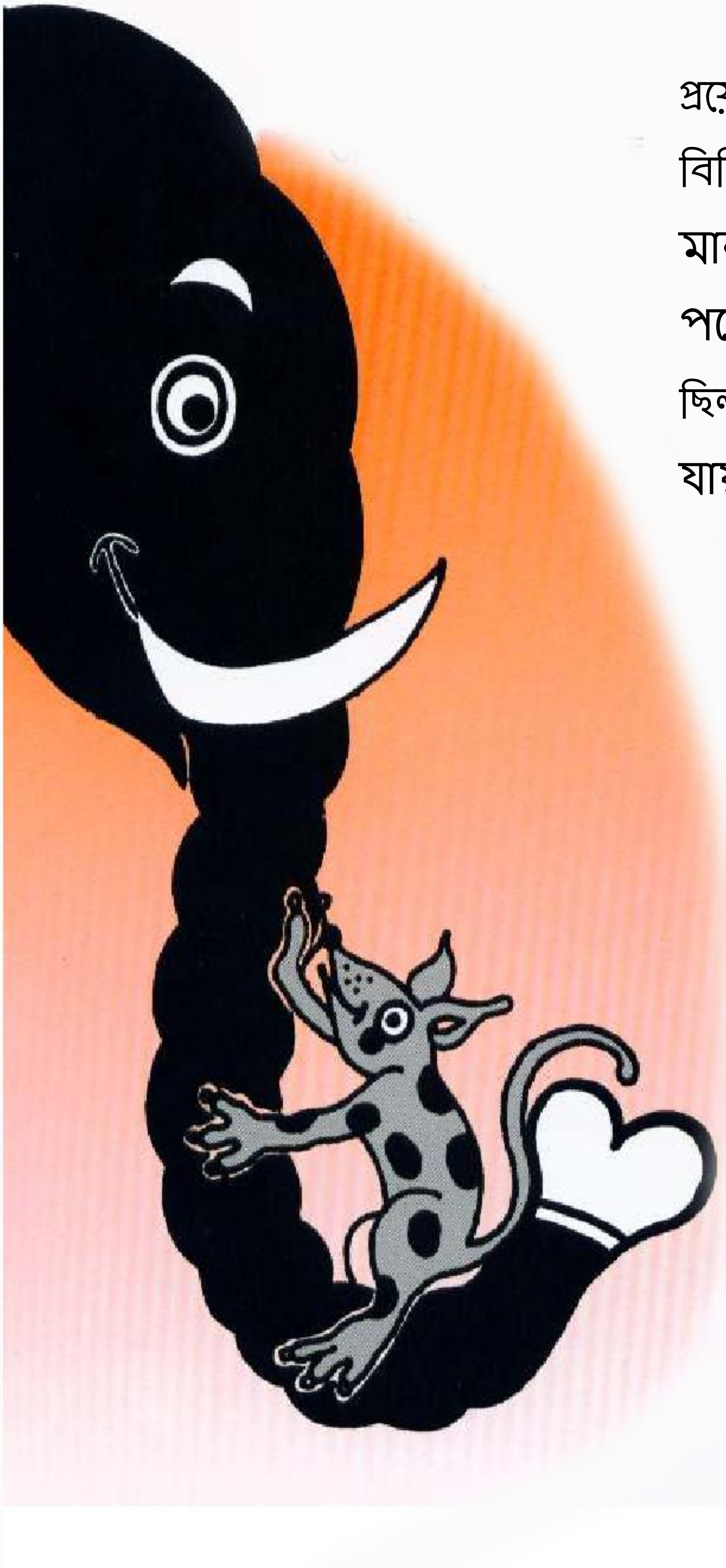
হাতি আর কুকুরের বন্ধুত্ব

বহুকাল আগের কথা। কাশীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করত। সেই রাজার কাছে একটা হাতি ছিল।

মাহুত রোজ হাতিটাকে চান করাতে নিয়ে যেত।চান করানোর পরে ওকে খেতে দিত। মহুতের কুকুরও ওখানে চলে আসতো।হাতিটা আর কুকুরটা দুজনে এক সাথে মিলে মিশে খেতো। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে ওরা দুজন বন্ধু হয়ে উঠল।



হাতিটা রোজ কুকুরের জন্যে অপেক্ষা করত। যদি কোনো দিন কুকুরটা না আসতো সেদিন হাতিটা খাবার খেতো না। কুকুরটাও হাতিটার সাথে খুব খেলত। সে হাতির শুঁরে চড়ে ঝুলতো।



একবার মাহুতের কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। সে তার কুকুরটাকে বিক্রি করে দেয়। কুকুরটার মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পরে। কিন্তু বেচারার কিছুই করার ছিল না। চুপচাপ নুতন বাড়িতে চলে যায় সে।

এদিকে হাতিটার নিজের বন্ধুকে আর দেখতে না পেয়ে মন খারাপ হয়ে যায়। হাতিটা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। চান করতে চায় না। সারা দিন সে মন মরা হয়ে বসে থাকে।

হাতির খাওয়া দাওয়ার না করার কথা রাজা শুনতে পায়। রাজা তখন মাহুতের কাছে হাতির খবর নেবার জন্যে নিজের মন্ত্রীকে পাঠায়।

মন্ত্রী ওখানে গিয়েই হাতিটাকে ভালকরে পর্যবেক্ষণ করে। হাতিটা শারীরিক ভাবে ঠিকই ছিল। মন্ত্রী বুঝলো নিশ্চই হাতিটার মন ভাল নেই কোনো কারণে।



উনি আশে পাশের লোকেদের সাথে কথা বলেন। লোকেরা জানায় যে কুকুরটা চলে যাবার পর থেকেই হাতিটা এমন মনমরা হয়ে আছে। যবে থেকে কুকুরটি চলে গেছে ও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

মন্ত্রী তখনই রাজাকে খবর পাঠায়। রাজা তখন চারিদিকে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে যে 'যায় কাছে ওই কুকুরটি আছে সে জেনো তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেয়।'

যে লোকটি ওই কুকুরটা কিনেছিল তার কাছেও এই খবর পৌঁছায়।

ব্যস। ওই লোকটি কুকুরের গলার দড়িটা কেটে দেয়। কুকুরটা তখন লাফাতে লাফাতে দৌড়ে হাতির কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

দুই বন্ধু একে অপরকে দেখে খুবই খুশি হয়। হাতিটা তখন কুকুরটাকে নিজের সুঁড়ে তুলে মাথায় উপর বসিয়ে দেয়। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

মাহুত তখন দৌড়ে গিয়ে খাবার নিয়ে আসে। হাতি তখন আগে কুকুরকে খাওয়ায় আর তার পর নিজেও খায়।

জাতক কথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

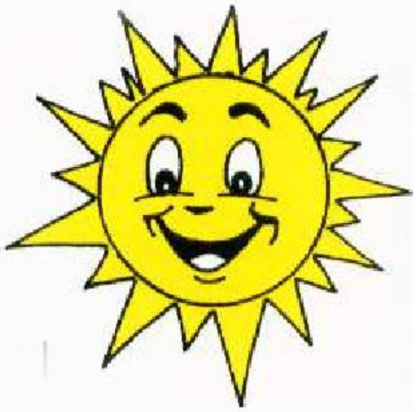
Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

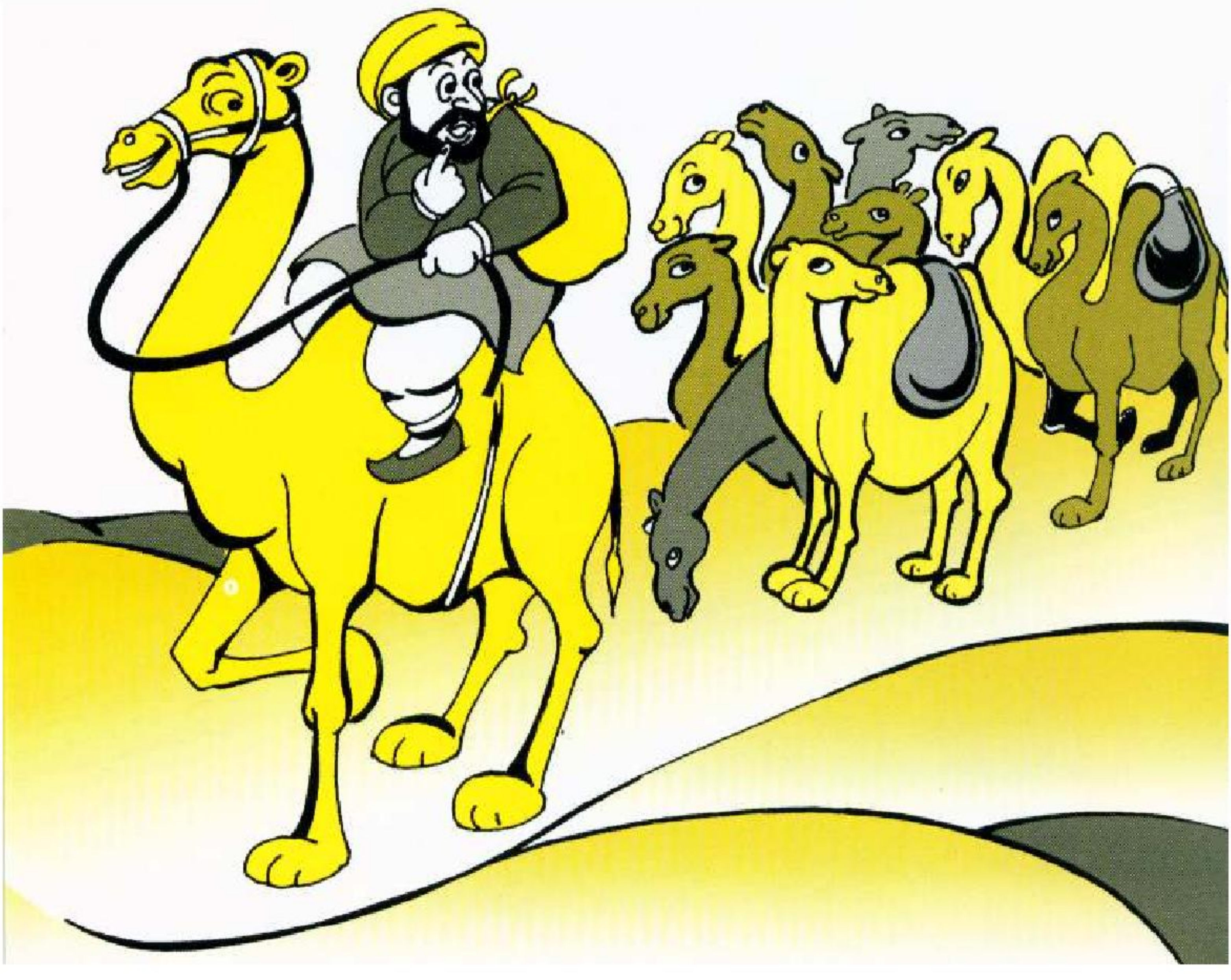
03

নয়টা না দশটা

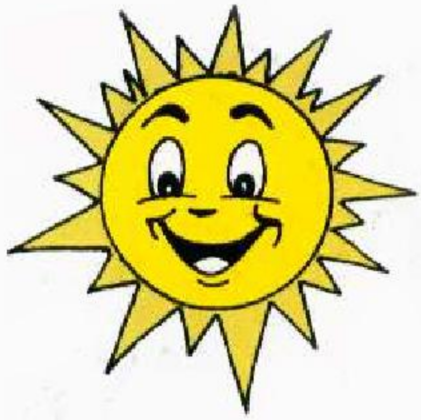


অনেক আগেকার একটা ঘটনা। এক ব্যবসায়ী নিজের দশটা উট নিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে। সে নিজে একটা উটের পিঠের উপর বসে। সে উট নিয়ে আগে আগে চলে আর বাকি উটগুলো চলে তার পেছনে পেছনে।

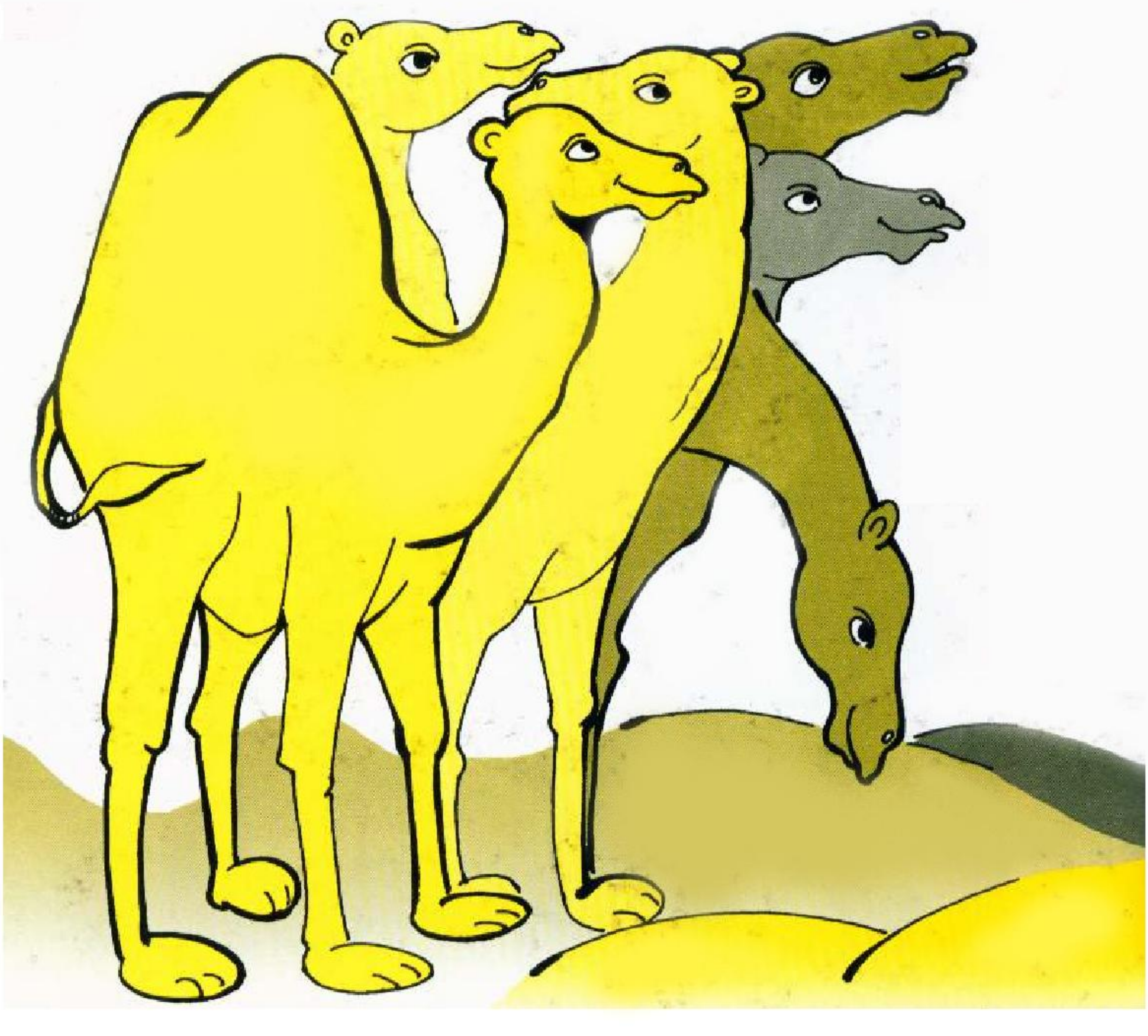
যেতে যেতে তার মনে হয় "একবার গুণে দেখি তো, যে সব উটগুলো পেছনে পেছনে আসছে কিনা!" তখন সে পেছন ফিরে গুনতে থাকে-... এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, আর নয়....... আরে, একটা উট কম দেখেছি! কোথায় গেল?"
সে তখন চট করে উটের পিঠ থেকে নেমে পরে।



আর নিজের হারিয়ে যাওয়া উটটিকে এদিকে ওদিকে খুঁজতে শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সে তাকে খুঁজে পায়না। সে তখন ভাবে, হয়তো তার গুনতে কোনো ভুল হয়েছে। আবার সে গুনে দেখে। এক, দুই, তিন, চার......



.... আরে বাঃ! সব গুলোই তো আছে। সে তখন খুশি মনে আবার উটের পিঠে চড়ে এগোতে থাকে। কিছু দুর যাবার পর আবার তার মনে সন্দেহ জাগে। সে পিছনে গুনে দেখে যে আবার সেই নয়টা উট!



ব্যাপারী হকচকিয়ে যায়। বার বার একটা উট যাচ্ছে কোথায়? হড়বড় করে আবার সে নীচে নেমে পরে আর উটটাকে এদিকে সেদিকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না। তারপর সে ক্লান্ত হয়ে তার উটেদের মাঝে ফিরে আসে।

সে ভাবে, "আমার কি তবে গোণার কিছু ভুল হচ্ছে? আবার গুণি তো!...এক, দুই, তিন, চার.........।"

কি আশ্চর্য্য! দশটাইতো আছে! "ওহ!" সে মনে মনে বলে, "তাহলে মনে হয় এই রোদ্দুরে আর গরমে আমার মাথার ব্বারোটা বেজে গেছে।" মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে সে আবার সবার সামনের উটটার পিঠে চেপে বসে।

চলতে চলতে তারা মরুভুমির আরো ভিতরে প্রবেশ করে। তার মনে আবার সন্দেহ দেখা দেয়। পিছনে গুণে দেখে যে আবার সেই নয়টা উট।

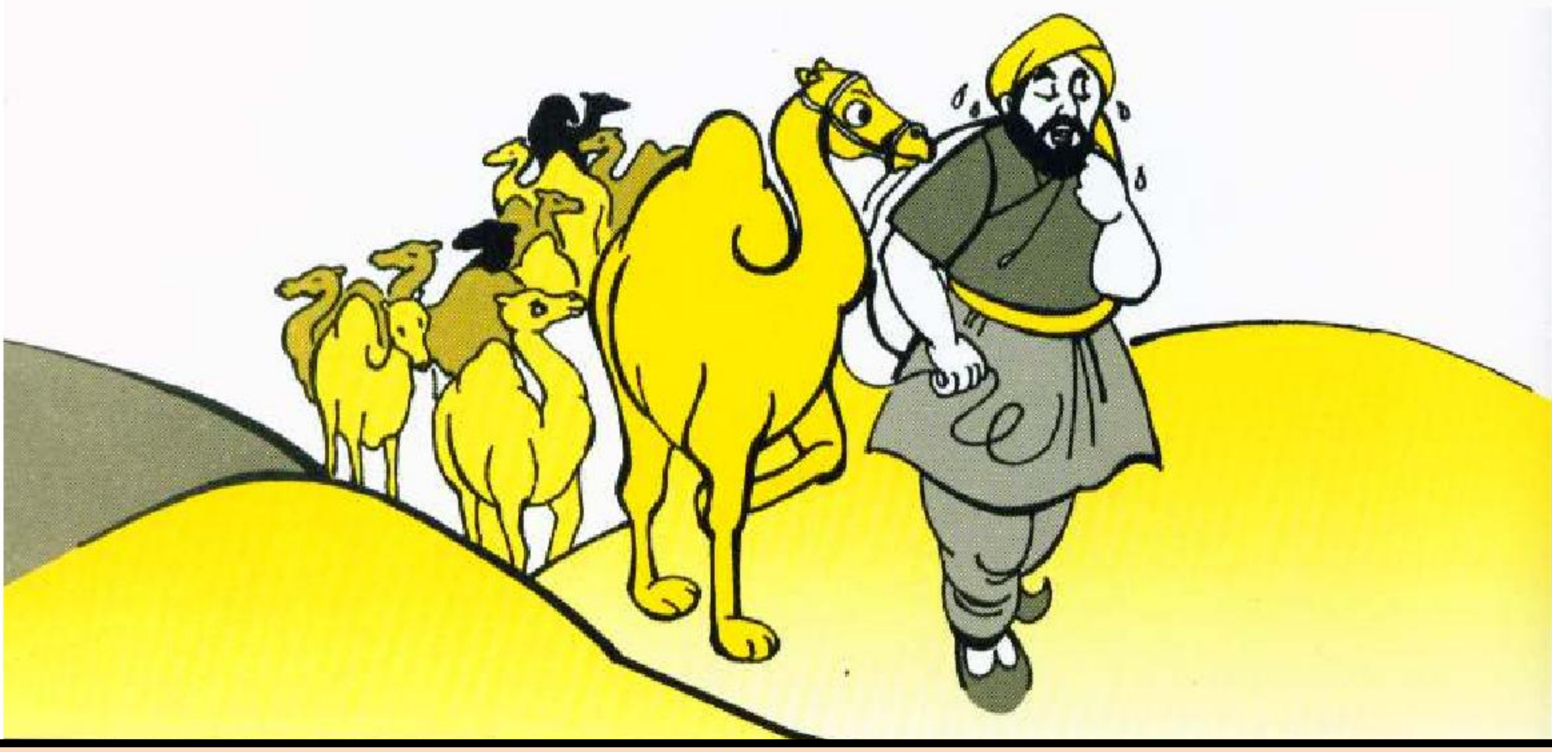




"বার বার এই একটা উট যাচ্ছে কোথায়?" মরুভুমির গরমে তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না। ব্যাপারী এবার উটের পিঠ থেকে নেমে পরে উটগুলোকে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুণতে থাকে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।" আবার একবার পিছন থেকে সামনে গোণে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।"

অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বলে, " আমি যখন একটা উটের পিঠে চড়ি, একটা উট কমে যায়। যখন আমি উটেদের সামনে হাঁটি, দশটাই থাকে। তাই এবার বাকীটা পথ আমি আর উটের পিঠে চড়ে যাব না।" এই বলে সে উটেদের দিকে চেয়ে বলে, "এবার থেকে আমি তোমাদের সঙ্গেই হেঁটে যাব।"

এই বলে ব্যাপারী সেই উটের সারির সামনে মরুভূমির ঐ গরমে সূর্যের তাপে তেতে পুড়ে হেঁটে হেঁটেই বাকীটা পথ অতিক্রম করে।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist S. P. Raju

ম্যাজিক পেন্সিল

04

কাশিম নামের একটা বাচ্চা ড্রইং করতে খুব ভালো বাসতো। ও তাই ধারালো পাথরের টুকরো বা ছোট গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে আঁকতো।

গ্রামের সব আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে কাশিমের আঁকা ছবি দেখা যেত। এক দিন ওর মনে হলো ”যদি আমার কাছে একটা পেন্সিল থাকতো! তালে কতো সুন্দর সুন্দর আঁকতে পারতাম।“

একটা বুড়ো লোকের সাথে তার দেখা হল। ওর বুড়ো লোকটা কাশিমকে একটা পেন্সিল দিলো।

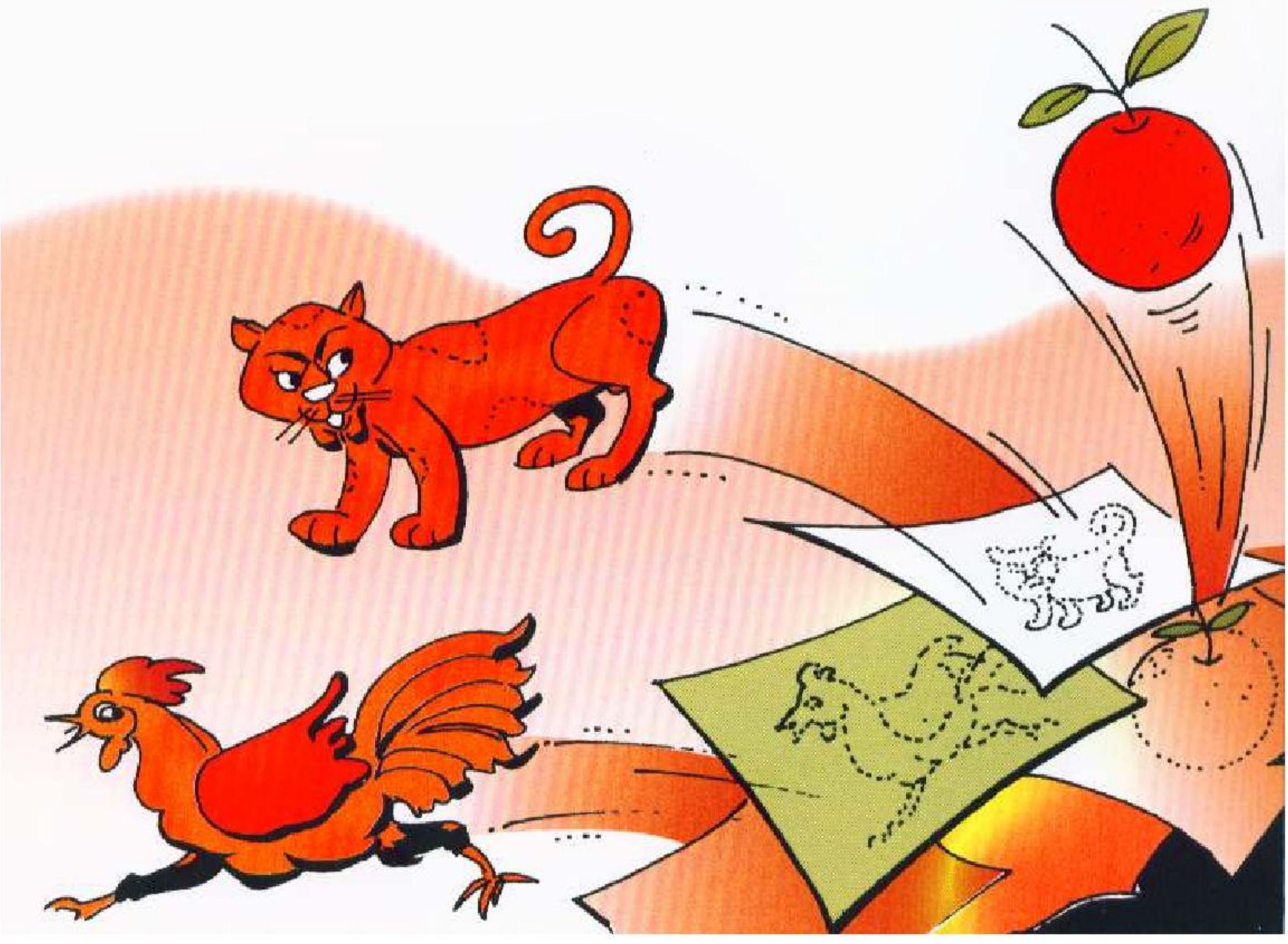
“এই পেন্সিল দিয়ে শুধু গরীব লোকেদের জন্যই ছবি বানিও।“ বলেই সেই বুড়ো লোকটা গায়েব হয়ে গেলো।



কাশিম খুব খুশি হলো এতে। ও তখনই একটা মুরগি আঁকলো। আরে বাহ! এটা কি হলো। মুরগীটা আসল জ্যান্ত হয়ে গেলো। ফের ও একটা বিড়াল আঁকলো। ওটাও জ্যান্ত হয়ে উঠলো। আশ্চর্যের ম্যাজিক পেন্সিল।

এবার কাশিম একটা বল বানালো। ওটাও আসল বল হয়ে গেলো। এর পর কাশিম খাতা, লাট্টু, জামা, ফুল আঁকলো। সব আসল হয়ে উঠলো। সে ঐসবই গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। এরপর গরীব মানুষেরা যা যা চাইল, কাশিম তাই এঁকে দিয়ে আসল করে ওদের দিয়ে দিলো।

কাশিম রাত দিন আঁকতেই থাকল।



এই খবরটা গিয়ে পৌঁছলো রাজার কানে। রাজা ওকে ডেকে বললেন "আমাকে একটা সোনার মোহর ভরা গাছ বানিয়ে দেও।"

" মহারাজ, আপনার কাছে অনেক ধন আছে। আমি শুধু গরীবদের জন্যে আঁকতে পারি।" এই বলে কাশিম মানা করে দিলো।

রাজা রেগে গিয়ে কশিমকে কারাগারে বন্দী করে দিতে আদেশ দিলেন।



কিন্তু কাশিম কি কারাগারে খালি বসে থাকার ছেলে? ও খুব চালাক ছেলে। ও চট করে একটা তালার চাবি আঁকলো। ব্যাস, চাবিটা আসল হয়ে গেল। ও চট করে চাবিটা দিয়ে তালাটা খুলে কারাগার থেকে পালিয়ে গেল।

একটি মালেশিয়ান গল্পের অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist S. P. Raju



বাঁদর হলো বাগানের মালি

অনেক দিন আগের কথা। এক রাজা তার এক আনন্দের দিনে খুশি হয়ে সব কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে দিল। এমনকি রাজদরবারের কেউও বাদ গেল না। সবাই তাদের কাজ বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি সাড়তে, সবার জন্য পছন্দমত উপহার কিনতে আর তাদের ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শুধু বাগানের যে মালী ছিল, সে চিন্তায় পড়ে গেল। মালী ভাবলো ও যদি চলে যায় তাহলে এই সব গাছেরা তো শুকিয়ে যাবে! কিন্তু তারও বাড়ি যাবার ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল।...উপায় নিশ্চই কিছু থাকবে!

রাজার ওই বাগানে একদল বাঁদর থাকত। মালী সেই বাঁদরদের দলপতির কাছে গিয়ে তাকে বলল,



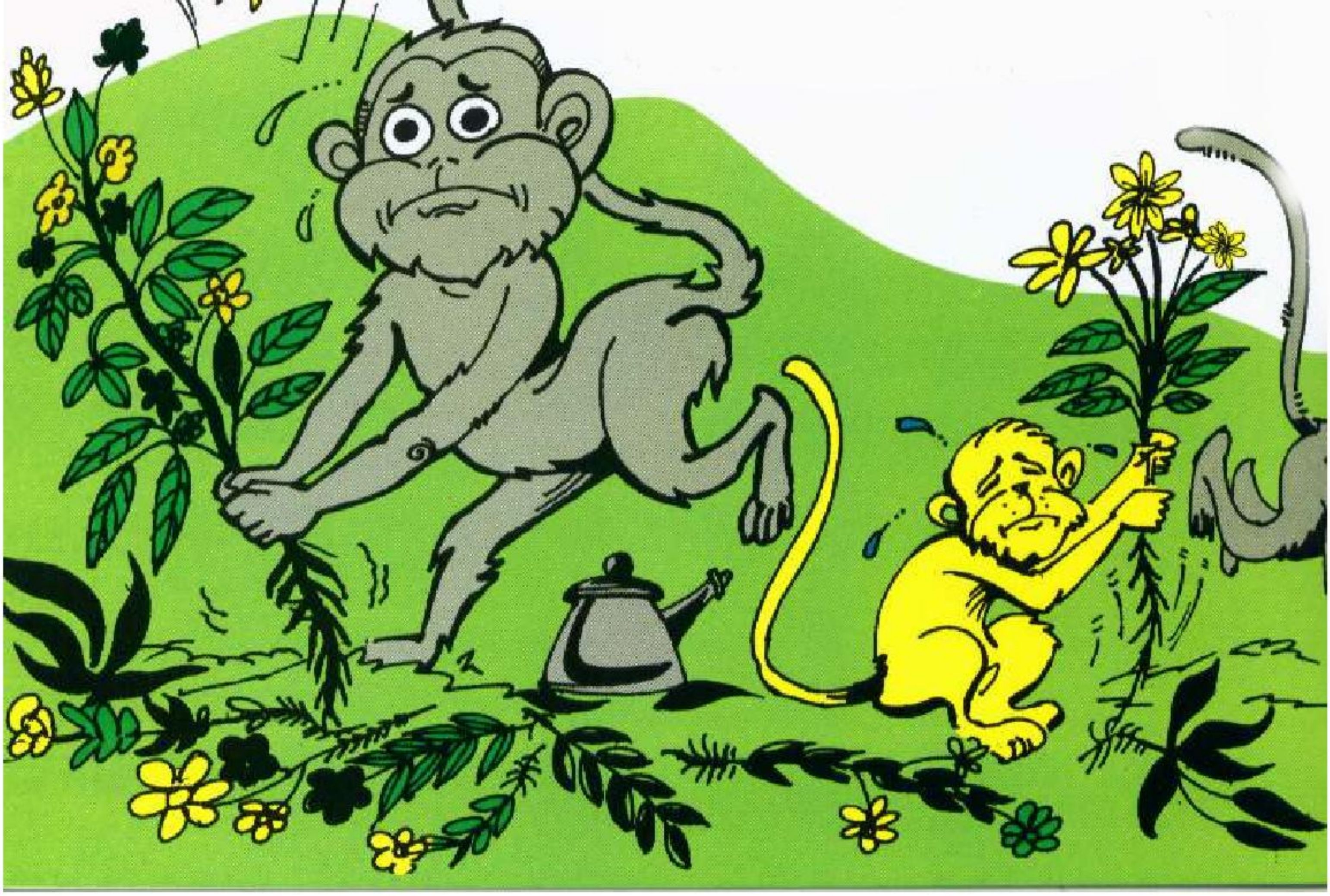


"দেখ, তোমরা সবাই কেমন নিশ্চিন্তে স্বাধীন ভাবে বাগানে থাকতে পার। ফল মূল ইত্যাদি সব যত ইচ্ছে খেতে পার। গাছে ঝুলত পার। দাপাদাপি করে খেলতে পার। এখন আমি এক অসুবিধায় পড়েছি, তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে পার?"

বাঁদরদের নেতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো " নিশ্চয়ই।"

মালী বলল "আমি একবার আমার বাড়ি যেতে চাই। আমার অবর্তমানে গাছগুলোতে একটু সময় করে রোজ জল দিতে হবে।"

সব বাঁদরেরা একত্রিত হয়েছিল সেখানে। তারা সবাই বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিতে পারব।"



মালী ওদের ধন্যবাদ দিয়ে বলল “ কিন্তু মনে রাখো জল ঠিক ঠিক মাত্রায় দিতে হবে। দরকারের থেকে বেশীও নয়, আবার কমও নয়।“ বাঁদরেরা তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা এমনটাই করবে। তাই শুনে মালীও নিশ্চিন্তে খুশীমনে নিজের গ্রামে চলে গেল।

বিকেল হতেই বাঁদরেরা সব জড়ো হয়ে গেল গাছে জল দেবার জন্য। নেতা ওদের মনে করিয়ে দিলো “ দেখো যেন সব গাছে ঠিক পরিমাণ জল দেওয়া হয়।“

একটা ছোট্ট বাঁদর তখন জিজ্ঞেস করে বসল “ আমরা কি করে ভুঝবো কোন গাছের জন্য কতটা পরিমাণ জল সঠিক?”

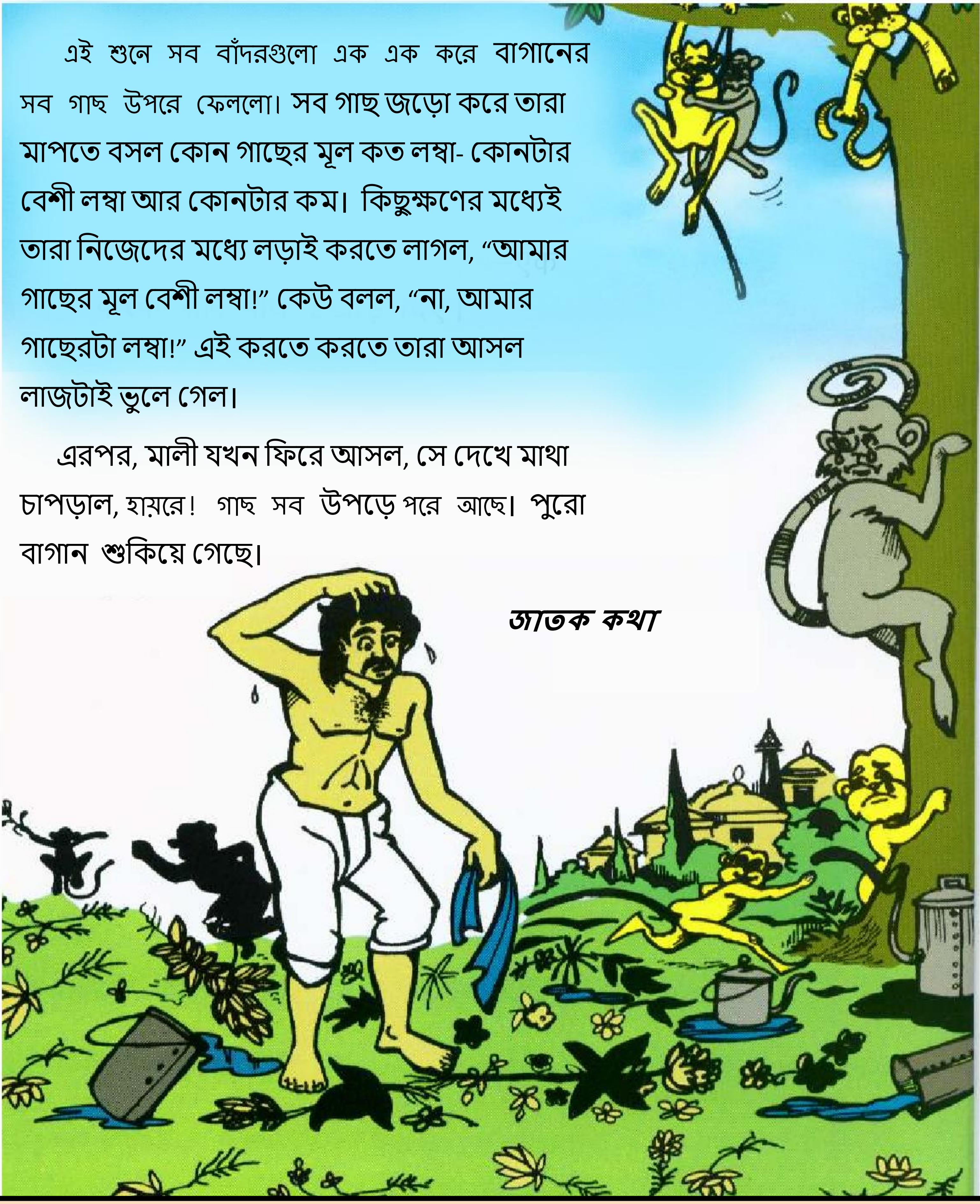
নেতা তখন চিন্তায় পরে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, “ তোমরা এক কাজ কর। সব গাছকে উপরে ফেলে দেখো। যে গাছের মূল যত লম্বা তাতে তত বেশি জল লাগবে। লম্বা মূল হলে বেশী আর ছোট মূল হলে কম জল দেবে।“



এই শুনে সব বাঁদরগুলো এক এক করে বাগানের সব গাছ উপরে ফেললো। সব গাছ জড়ো করে তারা মাপতে বসল কোন গাছের মূল কত লম্বা- কোনটার বেশী লম্বা আর কোনটার কম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে লাগল, “আমার গাছের মূল বেশী লম্বা!” কেউ বলল, “না, আমার গাছেরটা লম্বা!” এই করতে করতে তারা আসল লাজটাই ভুলে গেল।

এরপর, মালী যখন ফিরে আসল, সে দেখে মাথা চাপড়াল, হায়রে! গাছ সব উপড়ে পরে আছে। পুরো বাগান শুকিয়ে গেছে।

জাতক কথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist S. P. Raju

অর্ধেক তোমার আর অর্ধেক আমার

06

অনেকদিন আগের কথা। এক বনের পাশে এক চাষীর একটা খালি জমি ছিল। চাষী ঠিক করল ঐ জমিতে বাদামের চাষ করবে। সে জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে বীজ বপন করে, পরম যত্ন সহকারে নিয়মিত সেচ করে, আগাছা পরিষ্কার করে ফসল ফলাল। এরপর সে ফসল পাকার অপেক্ষা করতে লাগল।

তার এই কাজ রোজ কে লক্ষ্য করত জানো? একটা ভালুক।

একদিন সে চাষীর কাছে এসে বলল, “ওহে চাষী!





আমি তোমায় এবার খাব কিন্তু!" আর এই বলে সে তার থাবা তুলল চাষীকে মারবে বলে।

চাষী তো তখন ভয়ে কাঁপতে লাগল। চট করে সে উত্তর দিল, "আরে, ভালুক মশাই, তুমি **এখন** আমাকে খেও না! আমার ক্ষেতের এই বাদামের ফসল যখন পাকবে, আমরা দুজনে তখন তা আধাআধি করে ভাগ করে নেব, আর দুজনে মিলে খাব।"

ভালুক তখন থাবা নামিয়ে গররর করে বলল, "সেটা কিরকম!"

"মাটির তলায় ফসলের যে অংশটা থাকবে সেটা আমি নেব আর মাটির উপরে যা হবে তা তুমি নিয়ে নেবে।" চাষী বলল।

ভগবানের অসীম কৃপায় ভালুকটা ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হল। সে **বনে** চলে গেল।

গোটা **মরসুমে** চাষী অনেক পরিশ্রম করল ফসলের পিছনে। তার জমি সবুজ শস্যে ভরে উঠল। দারুন ভাভে ফসল কাটা হল।

এবার ভালুকও পুরোনো কথামত এসে তার ভাগ চাইল।

বোঝাপড়া যেমন ছিল, সেই হিসাবে, চাষী গাছের ওপরের অংশগুলো ভালুককে দিয়ে দিলো। আর মাটির নীচে বাদাম গাছগুলোর যে অংশ ছিল তা

গাড়িতে ভরে নিল। যেই সে গাড়ি নিয়ে চলা শুরু করতে যাবে, এমন সময় ভালুকটা গর্জন করে উঠল, "দাড়াও! আমায়ও কিছু মূলের অংশ দাও তো! আমি একটু চেখে দেখি!"

চাষীর আর কিছু করার ছিল না। সে ভালুককে কয়েকটা বাদাম দিল।

ভালুক ঐ বাদাম কটা খেয়েই রেগে গিয়ে গর্জাতে গর্জাতে বলল " তুমি আমায় ঠকিয়েছ! শেকড়ের ভাগটা তো অনেক বেশি সুস্বাদু। ওপরে ডাল পাতায় কোন স্বাদ নেই।" এই বলে সে তার থাবা তুলে আক্রমণ করতে গেল......

চাষী তখুনি তাকে বলল " ভাল্লুক মশাই, রাগ করবেন না। এর পরের বার আমি আবার আরেকটা ফসল ফলাব। আর তখন আপনি নীচের ভাগ নিয়ে নেবেন আর আমি ওপরের ভাগ", সে কথা দিল।

ভগবানের অসীম কৃপা! ভালুক আবারও রাজী হল আর বনে চলে গেল।

ফসল রোপণের সময় এলে, এবার চাষী ঐ জমিতে এবার ভুট্টার বীজ বপন করল। অনেক পরিশ্রমের পর, খুব ভালো ভুট্টার ফলন হল। ফসল কাটার দিন এলো। ভালুক তার নিজের ভাগ চাইলো। ওকে কৃষক মাটির নিচের অংশগুলো দিয়ে ওপরের ভুট্টা গুলি গাড়িতে তুলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করল।



ভালুক মুলগুলো খেতে গেল, “আরে ছিঃ ছিঃ। এতে তো ভয়ঙ্কর বাজে খেতে!” বলে সে খেঁকিয়ে উঠল। “এবারেও চাষী আমায় ঠকিয়েছে! সে যদি আবার এখানে ফিরে আসে, আমি বেটাকে উচিত শিক্ষা দেবো!”

কিন্তু চাষী তো খুব চালাক- সেকি আর ফিরে আসে ওখানে?



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

ঘর বদলানো

অনেকদিন আগের কথা। এক ধনী ব্যক্তি বড় শহরের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটি ছোট গ্রামে একটি খুব সুন্দর বাংলো কিনলেন। ঘর বদলানোর পর তিনি তার নতুন বাংলোর বারান্দায় বসে দিব্যি শান্তি ও নীরবতা উপভোগ করছিলেন।

কিন্তু ঠিক পরের দিন সকালেই, তার শান্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!



ধনী লোকটির বাংলোর বাম দিকে ছিল একটি কামারের কর্মশালা, আর ডান দিকে, একটি ছুতারের কারখানা।

সারাদিন ধরে, কামারের হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটানোর "ঠং ঠং, ঝনঝন, ঝনঝন," শব্দ আসত । আর, "ঝ......ঝ ......," **করে ভোমরার ভনভনের** মত আওয়াজ আসত ছুতারের করাতের।

এই অবিরাম শব্দে ধনী লোকটির কান ঝালাপালা হয়ে গেছিল। তিনি বিশ্রামও নিতে পারতেন না, ঘুমাতেও পারতেন না। তাঁর অবস্থা সত্যি বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

একদিন এল যখন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ছুতার এবং কামারকে ডেকে পাঠালেন। সাথে সাথে তারা সম্মানের সাথে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।



ধনী ব্যাক্তি তাদের বললেন, "তোমাদের বাড়িগুলো থেকে এত শোরগোল আসে যে আমি বিশ্রাম নিতে বা ঘুমাতে পারি না।"

তারা উত্তর দিল, "আমরা সত্যিই দুঃখিত, মহাশয়। কিন্তু কী আর করা যাবে? আমরা গরীব মানুষ, আমাদের তো কাজ করতেই হবে!"

ধনী লোকটি বললেন, "দয়া করে তোমাদের বাড়িগুলো সরিয়ে নাও," এবং তাদের মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। দুই কারিগর রাজি হয়ে গেল এবং আনন্দের সাথে চলে গেল।

ধনী লোকটি যখন দেখলেন তারা তাদের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র গাড়িতে তুলছে, তখন তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি ভাবলেন, "কী স্বস্তি! অবশেষে আমি ঘুমাতে পারব।" আর তিনি সোজা বিছানায় চলে গেলেন।



কিন্তু পরের দিন তিনি সেই একই কান ফাটানো শব্দে ঘুম থেকে উঠলেন! এটা কি হল? তিনি তার চাকরকে খোঁজ নিতে পাঠালেন।

চাকর দৌড়ে ফিরে এল। সে বলল, "ওহ, প্রভু! কামার এবং ছুতার দুজনেই তো তাদের বাড়ি সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কামার ছুতারের বাড়িতে গেছে আর ছুতার গেছে কামারের বাড়িতে!"

একটি কোরিয়ান গল্প



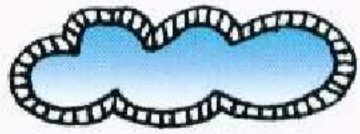
© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist S. P. Raju

08

কার পাখি?





সে ছিল এক মনোরম সকাল। বাগানটি ফুলে ফুলে ভরে ছিল। গাছে গাছে পাখিরা কিচিরমিচির করছিল আর গান গাইছিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ফুলের সুবাস উপভোগ করছিলেন।

হঠাৎ পাখীরা কিচিরমিচির করতে করতে এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। "কী হয়েছে?" রাজকুমার ভাবলেন।



ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে একটি রাজহাঁস এসে পড়ল! সেটি সিদ্ধার্থের ঠিক পায়ের কাছে পড়ল। সিদ্ধার্থ দেখলেন একটি তীর রাজহাঁসটির শরীর ভেদ করে বেরিয়েছে। সেটি ব্যথা আর ভয়ে কাঁপছিল!

সিদ্ধার্থ পাখীটিকে তুলে নিলেন। তিনি সাবধানে তীরটি বের করে আনলেন। তিনি ক্ষতস্থানে কিছুটা ওষুধ লাগালেন। রাজহাঁসটিকে কোলে নিয়ে তিনি আলতো করে আঙুল দিয়ে আদর করতে লাগলেন। রাজহাঁসটি শান্ত হয়ে এল। অবশেষে, তার কাঁপুনি থেমে গেল।

হঠাৎ সিদ্ধার্থের ভাই দেবদত্ত দৌড়ে এলেন। তিনি সিদ্ধার্থের কোলে রাজহাঁসটিকে দেখে থেমে গেলেন।

"পাখীটা আমাকে দাও," তিনি বললেন। "ওটা আমার!"



কিন্তু সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "না! এই পাখীটা আমার। আমিই একে বাঁচিয়েছি।" সে রাজহাঁসটিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে লাগল। দেবদত্ত তার পিছু পিছু গেল।

দুই ভাই রাজার কাছে গেল। "সিদ্ধার্থ আমাকে আমার পাখীটা দিচ্ছে না," দেবদত্ত অভিযোগ করল।

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "বাবা, দেবদত্ত তীর ছুঁড়ে পাখিটাকে আহত করেছিল। কিন্তু আমি ওষুধ লাগিয়ে ওর জীবন বাঁচিয়েছি। তাই, পাখীটা আমার।"



“আমিই প্রথম ওকে দেখেছিলাম!” দেবদত্ত বলল। “তাই, এটা আমার।”

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “দেবদত্ত, তুমি পাখীটাকে মারতে চেয়েছিলে। কিন্তু সিদ্ধার্থ একে বাঁচাতে চেয়েছিল। জীবন বাঁচানোর কাজ জীবন কেড়ে নেওয়ার কাজের চেয়ে বড়। তাই পাখীটা সিদ্ধার্থের।”



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

উট ও শিয়াল

"ওহে উট ভাই!" শিয়ালটি ডেকে উঠল। "নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখো! ওই যে সব রসালো শসা দেখতে পাচ্ছ? চলো যাই, গিয়ে কয়েকটা খেয়ে দেখি!"

"হ্যাঁ, চলো যাই!" উট বলল। সে শিয়ালকে নিজের পিঠে চড়তে সাহায্য করল এবং তারপর নদী পার হওয়ার জন্য পা বাড়াল।

যখন তারা নদীর অন্য পাড়ে পৌঁছাল, শিয়ালটি লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারা দুজনে মিলে শসা-ক্ষেতে ঢুকল এবং শসা চেখে দেখল। উমমম... কী দারুণ সুস্বাদু!





শিয়ালটি মাত্র কয়েকটি শসা খেল। তারপর সে সেখান থেকে সরে পড়তে চাইল। কিন্তু উট তখনো খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

শিয়ালটি এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করল। "ভাই!" সে মিনমিন করে বলল। "তোমার খাওয়া কি এখনো শেষ হয়নি?"

উট বলল, "আমার পেট তো এখনো অর্ধেকও ভরেনি! তুমি চুপ করে থাকো আর আমাকে খেতে দাও।"

"আমি চুপ করে থাকতে পারব না! বিশেষ করে যখন আমার পেট ভরা!" শিয়াল বলল। "খাওয়ার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে হুক্কা-হুয়া করাটা আমার স্বভাব। কিছু মনে কোরো না!" এই বলে সে হুক্কা-হুয়া করতে শুরু করল। "আউউউউ!"



এলাকার লোকজন সেই শব্দ শুনতে পেল। তারা লাঠি হাতে দৌড়ে এল। শিয়ালটি দ্রুত দৌড়ে পালাল এবং নদীর পাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল।

বেচারা উট! সে তো ফেঁসে গেল! লোকজন তাকে ধরে ফেলল এবং বেদম প্রহার করল। কোনোমতে সে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেল এবং দৌড়ে শিয়ালের কাছে ফিরে এল।

"ওহ, কী আফসোস হচ্ছে! ওরা তোমাকে কী ভীষণ মেরেছে!" শিয়াল বলল।

"ও কিছু না," উট উত্তর দিল। "এসো, আমার পিঠে চড়ে বসো। চলো আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাই!"

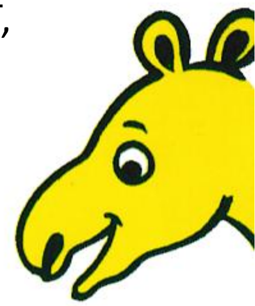
যখন তারা নদীর মাঝখানে পৌঁছাল, উট হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সে এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করল।



শিয়াল তো অবাক হয়ে গেল। "এই!" সে চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি এভাবে দুলছ কেন? আমি তো জলে পড়ে যাব!"

"আরে শান্ত হও ভাই!" উট বলল। "খাওয়ার পর এভাবে দুলতে থাকাটা আমার স্বভাব। কিছু মনে কোরো না!" এই বলে সে আরও জোরে জোরে দুলতে শুরু করল। শিয়ালটি আর্তনাদ করে উঠল, "দয়া করে থামো!"

কিন্তু উট দুলতেই থাকল! আর ঠিক যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, শিয়ালটি উটের পিঠ থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেল। বেচারা শিয়াল!



একটি পঞ্চতন্ত্রের গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

একটি ডালপালার যাত্রা



"মট!"

একটি শুকনো ডাল একটি শাখা থেকে ভেঙে পড়ল। সেটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সেটি কি সেখানেই স্থির হয়ে পড়ে রইল? একদমই না! সেটি উঠে দাঁড়াল এবং এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করল।



শীঘ্রই ডালটি একটি নদীর কাছে এসে পৌঁছাল। সেটি নদীতে ঝাঁপ দিল এবং ভেসে চলতে লাগল। নদীর স্রোতের সাথে সে খেলায় মেতে উঠল। তার সময়টা কাটছিল দারুণ আনন্দে!

হঠাৎ করেই... সুরের মূর্ছনা! ডালটি ওপরের দিকে তাকাল এবং দেখল একটি কোকিল গাছের ডালে বসে আছে। সে মিষ্টি সুরে গান গাইছিল।

ডালটি জলের কিনারে এসে থামল এবং গানটি শোনার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

সে কোকিলটির প্রশংসা করতে চাইল। কিন্তু... "...", "..."—ডালটি তো কথা বলতে পারে না!

হতাশ মনে সে আবার নিজের পথে পা বাড়াল।





কিছুক্ষণের মধ্যেই ডালটি একটি গোলাপ ঝোপের কাছে এসে পৌঁছাল। সে ফুলগুলোকে বলতে চাইল, "তোমরা কী ভীষণ সুন্দর!" কিন্তু সে তা বলতে পারল না।

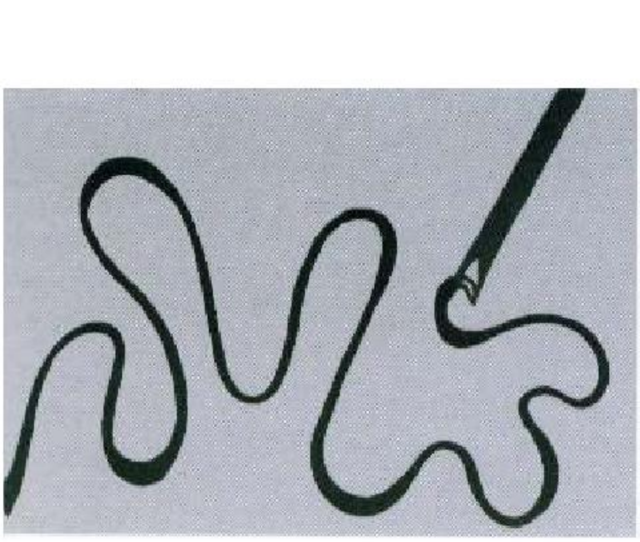
আরও কিছুটা পথ এগিয়ে সে দেখল একটি ব্যাঙ কবিতা লিখছে! ডালটি তাকে দু-একটি পঙক্তি বা লাইন পরামর্শ হিসেবে দিতে চাইল। কিন্তু—

স্বভাবতই—সে তা করতে পারল না।

আহা, বেচারা ডালটি! সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথের দিকে একবার ফিরে তাকাল।

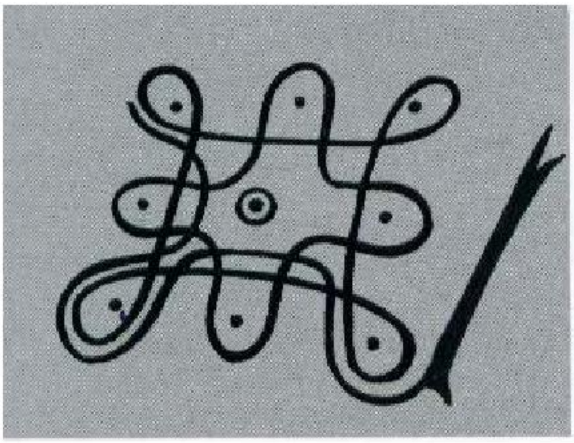
আরে! ওটা কী দেখা যাচ্ছে? মাটির ওপর দিয়ে একটি রেখা বা দাগ চলে গেছে, যা সরাসরি ডালটির কাছে এসে মিশেছে!



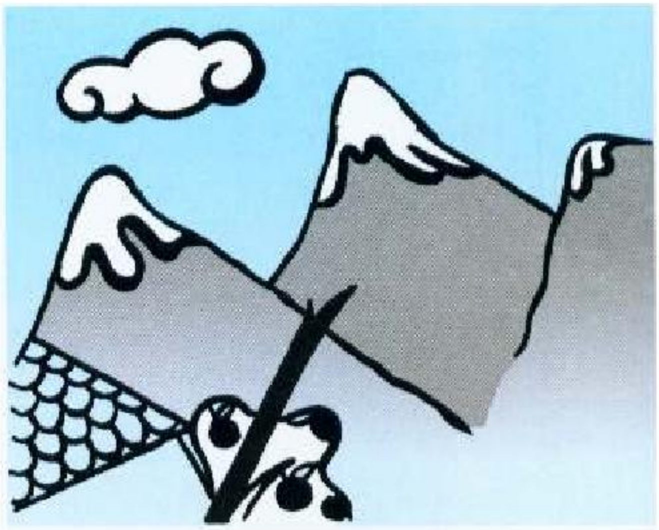


ওই রেখাটি ছিল তার নিজেরই চলার পথের চিহ্ন!

আনন্দে ডালটি নেচে উঠল। সে আঁকতে শুরু করল। প্রথমে সে আরও কিছু রেখা টানল। তারপর সে ছবি আঁকল—স্পষ্ট ও সুন্দর সব ছবি!



বনের পশুপাখীরা ভিড় করে ডালটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ডালটি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করল না। সে তার ছবি আঁকায় পুরোপুরি মগ্ন হয়ে ছিল।

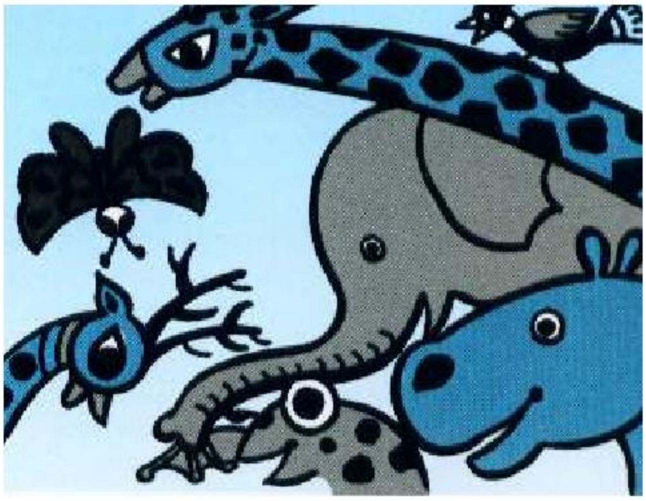


শীঘ্রই সেখানে এক চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটে উঠল। সেই দৃশ্য বনের সব পথঘাট ভরিয়ে দিল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বনের কোনো প্রাণীই এর আগে এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি!

বনের সবাই ডালটির প্রশংসা করতে চাইল।



পাখীরা তাদের ডানা ঝাপটাল এবং গান গেয়ে উঠল। ফুলগুলো ফুটে উঠল এবং মৃদু বাতাসে দুলে উঠল। প্রজাপতিরা গুনগুন শব্দ করতে লাগল। গাছগুলো তাদের ডালপালাগুলো আলতোভাবে দুলিয়ে অভিবাদন জানাল।



কিন্তু ডালটি তাদের দেখলও না, তাদের কথাও শুনতে পেল না। তার মন তখন কেবলই ছবি আঁকার চিন্তায় পূর্ণ হয়ে ছিল। সে অবিরাম ছবি এঁকেই চলল।



হঠাৎ করেই আকাশ কালো হয়ে এল। ওহ, সর্বনাশ! টুপ, টুপ, টুপ... এক পশলা বৃষ্টি এসে সেই সব সুন্দর ছবি ধুয়ে-মুছে দিল! বনের সবাই নীরবে শোক প্রকাশ করল।

কিন্তু ডালটি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা চিন্তিত হলো না। কারণ, সে যখনই চাইবে, তখনই তো আবার নতুন করে ছবি আঁকতে পারবে! এবার সে একটা পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ল আর বৃষ্টির থামার অপেক্ষা করতে লাগল। ওই তো! মেঘগুলো ইতিমধ্যেই সরে যেতে শুরু করেছে...

জন লেকনার-এর 'দ্য ক্লেভার স্টিক' অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আর কোনো ফল নয়!

একবার একটি ছোট বাঁদর ঘুরতে ঘুরতে একটি তরমুজ ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। বড় আর গোলগাল ফলগুলোর দিকে সে পরম আনন্দের সাথে তাকিয়ে রইল। চপাং! সে সবচেয়ে বড় তরমুজটিতে তার দাঁত বসিয়ে দিল।

"ওহ!" ছোট বাঁদরটি চেঁচিয়ে উঠল, "এটার তো ভীষণ তেতো!"

একটি ছাগল দূর থেকে সব দেখছিল। "তোমার তরমুজের নরম ভেতরের অংশটা খাওয়া উচিত, খোসাটা নয়," সে বলল।

ছোট বাঁদরটি তরমুজের শক্ত খোসাটা থুথু করে ফেলে দিল। "আমি তো এটা জানতামই!" সে ধমক দিয়ে বলল। "তোমাকে আমাকে বলে দিতে হতো না!"



ছোট বাঁদরটি কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ বাতাসের সাথে ভেসে এল এক মিষ্টি সুবাস। আহ! এ তো দেখি এক ফুটির বাগান! বাঁদরটি একটি ফুটি ভেঙে ফেলল এবং সেটির একেবারে ভেতরের অংশটা চেখে দেখল।

"ছিঃ!" সে বলে উঠল। "এই ফলটা তো বড্ড পিচ্ছিল!"

একটি গাধা দূর থেকে সব দেখছিল। "থামো!" সে বলল। "ফুটির ভেতরের ভাগটা পিচ্ছিল আর বীজে ভর্তি হয়! বরং খোসার কাছাকাছি থাকা নরম শাঁসটুকু খেয়ে দেখো।"

ছোট বাঁদরটি ফুটির পিচ্ছিল বীজগুলো থুথু করে ফেলে দিল। "আমি তো ওটা জানতামই!" সে বলল। "তোমাকে আমাকে বলে দিতে হতো না!"





বাঁদরটি আবারও পথ চলতে শুরু করল। তার পেটে তখন ভীষণ খিদে! হুমম... পথের ওপর এখানে-সেখানে ঝরে পড়া ফল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাঁদরটি ওপরের দিকে তাকাল। ওহ! সে তো দাঁড়িয়ে আছে একটি কাঠবাদাম গাছের নিচে! "এই ফলগুলো ছোট আর নরম," সে মনে মনে ভাবল। "এগুলো নিশ্চয়ই খেতে খুব সুস্বাদু হবে!" সে লাফ দিয়ে গাছে উঠল এবং একটা কাঠবাদাম পেড়ে নিল।

একটা নীলপাখী সব লক্ষ্য করছিল। "ফলের নরম খোসা দেখে ধোঁকা খেও না!" সে শিস দিয়ে বলল। "শক্ত খোলসটা ভেঙে ভেতরের বাদামটা খাও।"

কিন্তু এই ছোট্ট বাঁদরটা কি কথা শোনার পাত্র? পাখিটার কথা অগ্রাহ্য করে সে সজোরে কাঠবাদামটায় কামড় বসাল। "আমার দাঁত ভেঙে গেল!" সে চিৎকার করে উঠল।

সে একটা ডিগবাজি খেল এবং ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল।





ছোট্ট বাঁদরটা ব্যাথায় চোয়াল চেপে ধরে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। হঠাৎই সে গাছের নিচু হয়ে ঝুলে থাকা একটা ডালের সাথে ধাক্কা খেল। ডালটি ছিল পাকা নাশপাতিতে ঠাসা!

বাঁদরটা একটা নাশপাতি পেড়ে গাছের গুঁড়ির সাথে সজোরে আছড়ে দিল। সে নাশপাতির ভেতরের শক্ত কালো বীজগুলো বেছে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিল।

"উফফ, কী বিশ্রী!" বীজগুলো থুথু করে ফেলে দিতে দিতে সে চেঁচিয়ে উঠল।

নীলপাখীটা উড়ে তার কাছে এল এবং জিজ্ঞেস করল, "নাশপাতিটা কি খেতে সুস্বাদু ছিল?"

ছোট্ট বাঁদরটা তার হাতের তালুতে লেফটে থাকা নাশপাতিটা পাখীটার দিকে ছুঁড়ে মারল। "আমার আর কোনো ফল খাওয়ার দরকার নেই!" সে বলল।

চীনের একটি গল্প





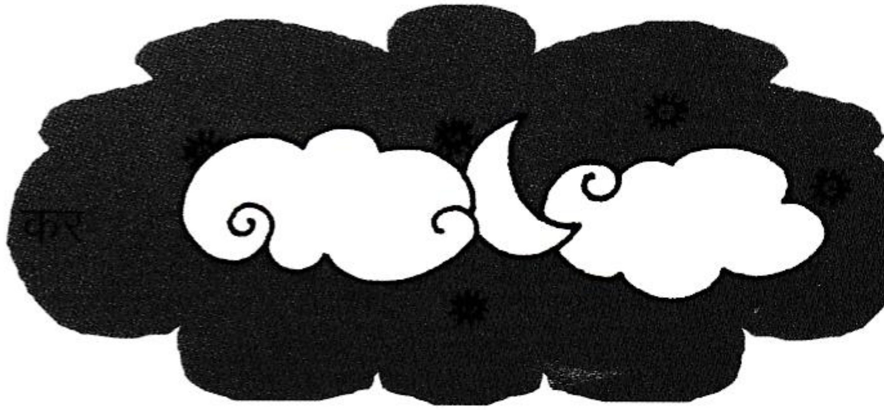
© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

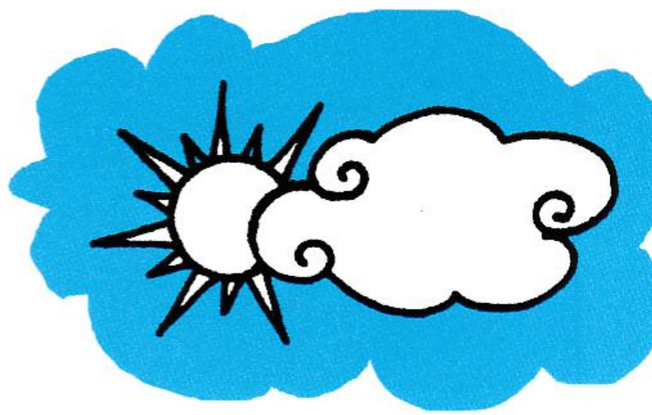
12

আমরা কারা?



আমি আকাশকে করি আলোকিত
আর ধাঁধিয়ে দিই তোমার দু'চোখ!

আমি কাঁদতে কাঁদতে পড়ি ঝরে যখন
হাসিতে ভাসে পৃথিবী তখন।



কৃত্রিম জালিতে
ফুটে ওঠে জুঁই

আমি কখনও কখনও গোল
রঙ আমার মোটামুটি সাদা
দিনের আলোয় আমি যাই মিলিয়ে
রাতের অন্ধকারে আমি হই শক্তিশালী আর উজ্জ্বল!

নিঃশব্দে উঠি আমি বাতাসে ভেসে–
ভাসতে থাকি, সাদা আর স্থির, অনেক উঁচুতে,
ভারী আমি যখন, আমি খুব কালো,
করি গর্জন, দিই হুঙ্কার – আবার ডুবে যাবার আগে নীচে নামিআমি।



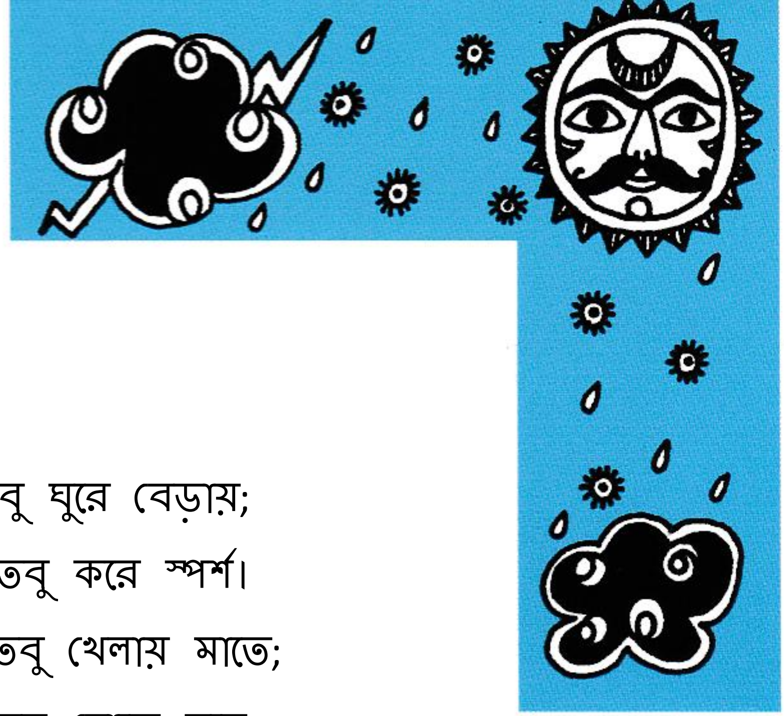
এই রঙিন ধনুকটা
এত উঁচুতে যে নাগালের বাইরে!

জীবন্ত জিনিসের বাতাস দরকার – আর আমারও!
জীবন্ত জিনিসের খাবার দরকার – আর আমারও!
জীবন্ত জিনিসের জল দরকার – কিন্তু আমার নয়!
যদি তুমি দাও আমাকে জল, আমি যাব মরে!

আমার মাথার উপরে আছে
সুন্দর, চওড়া একটা ছাদ
কিন্তু যখন আমি যাই কাছে
সেটা যায় সরে!

একে ছাড়া পড়বে নাকো বৃষ্টি
একে ছাড়া হবে নাকো ফসল বেশ।
একে ছাড়া কখনো বদলাবে না এ পৃথিবী
একে ছাড়া কখনো ঘুম হবে না শেষ!





গড়িয়ে চলে, ছুটে বেড়ায়;
লাফিয়ে ওঠে, খেলায় মাতে।
কোনো গর্ত পড়লে নজর—
ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ভেতর!

পা নেই, তবু ঘুরে বেড়ায়;
হাত নেই, তবু করে স্পর্শ।
দেহ নেই, তবু খেলায় মাতে;
প্রাণ নেই, তবু ঢোকে ঘরে—
আবার যায় চলে ।

আহা! এ যে এক গরীবের বিছানা—
সকালে কেউ একে গুটিয়ে রাখবে না!

সর্বদাই গতিশীল, নেই কোনো বিশ্রাম;
আমার বিশাল উদরে ধারণ করি লক্ষ ব্যস্ত প্রাণ।
ভারী যা-কিছু, গিলে ফেলি নিমেষে—
শুধু কাঠের জিনিস ছাড়া; বাকি সব দিই সাবরে।

আগুন, মাটি, বাতাস, জল, আকাশ, সূর্য, সাগর,
চাঁদ, তারা, বৃষ্টি, মেঘ, রংধনু, বিজলি

ঠিক যেমন এক আঁটসাঁট আবরণে—
ঢেকে রাখি আমি সর্বাঙ্গ তোমার
গ্রীষ্মে আমি ভিজি ঘামে —
আর শীত হলে সময় হওয় কাঁপার।

এক দীর্ঘ শৈলশিরা—
যার দুই পাশই ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

তারা একে অপরের বোন;
তারা একে প্রতিবেশী অপরের।
তারা কাজ করে কাঁধে মিলিয়ে কাঁধ —
তবু দেখা হয় না কখনো একে অন্যের।

আমি শুনি প্রতিটি কথা—
কিন্তু যা শুনেছি, তা কাউকে বলি না কভু।

যে-ই আসুক তাকে বরণ করে নিই—
উষ্ণতা আর বন্ধুত্বের দিয়ে পরশ।
তবু পড়ে রই আমার এই খোলামেলা ঘরে—
কোথাও যাই না আমি আমার ঘর ছেড়ে।

জিহ্বা, নাক, চোখ, কান, ত্বক।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

ইঁদুরদের কুচকাওয়াজ

একবার এক ধূর্ত বিড়াল ইঁদুর ধরার জন্য একটি ফন্দি আঁটল।

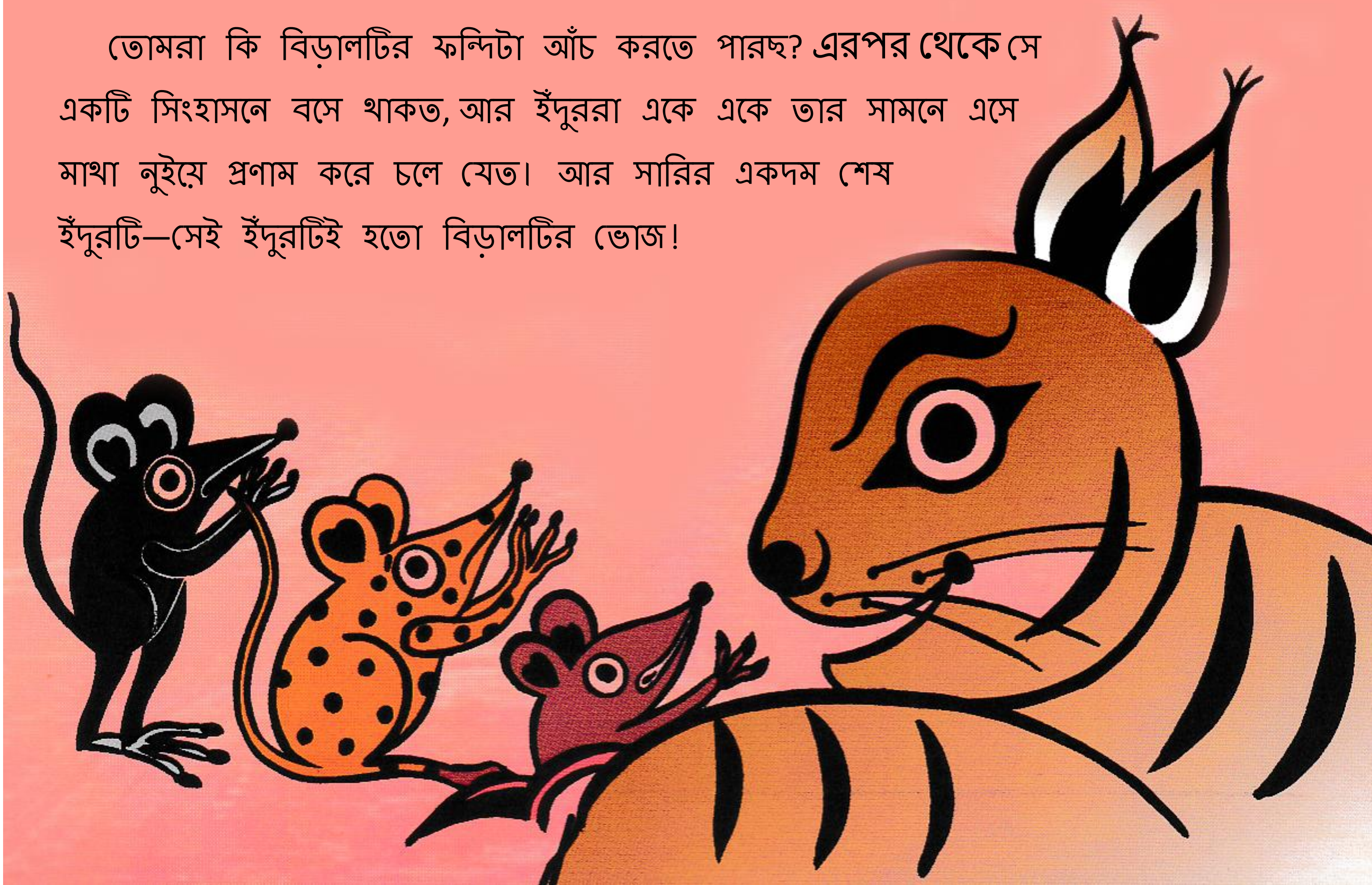
সে একটি সভার আয়োজন করল এবং ইঁদুরদের বলল, "বন্ধুরা! বছরের পর বছর ধরে আমি তোমাদের শিকার করেছি, তোমাদের পিছু ধাওয়া করেছি এবং তোমাদের বিন্দুমাত্র শান্তি দিইনি। তবে এখন এসো, আমরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করি। আমরা কি এখন থেকে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করার চেষ্টা করতে পারি না?"

ইঁদুররা তো অবাক!

বিড়ালটি বলতে থাকল, "আমার শুধু একটাই অনুরোধ—প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তোমরা আমার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাবে। দিনে দুবার, তোমরা সবাই আমার সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাবে, আমাকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করবে এবং তারপর চলে যাবে। ব্যস, এটুকুই!"

এ কথা শুনে সব ইঁদুর আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল। তারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করল না!

তোমরা কি বিড়ালটির ফন্দিটা আঁচ করতে পারছ? এরপর থেকে সে একটি সিংহাসনে বসে থাকত, আর ইঁদুররা একে একে তার সামনে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে চলে যেত। আর সারির একদম শেষ ইঁদুরটি—সেই ইঁদুরটিই হতো বিড়ালটির ভোজ!



বেশ কয়েক দিন ধরে এই পরিকল্পনাটি নির্বিঘ্নেই চলল। অধিকাংশ ইঁদুরই বুঝতে পারল না যে, কোথাও কোনো গোলমাল হচ্ছে।

তবে ইঁদুরদের দলে দুটি ধূর্ত বন্ধু ছিল—আম্বে এবং রাম্বে। এই দুজন লক্ষ্য করল যে, প্রতিদিন সারিতে দাঁড়ানো ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। তাদের ইঁদুর-গোষ্ঠীর আকার ছোট হয়ে আসছিল!

আম্বে এবং রাম্বের মনে সঙ্গে সঙ্গেই বিড়ালটিকে নিয়ে সন্দেহ জাগল। তারা দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ করে নিজেদের মতো করে একটি পরিকল্পনা সাজিয়ে নিল।

পরের দিন সকালে, আম্বে সারির একদম প্রথমে দাঁড়াল এবং হাঁক দিয়ে বলল, "রাম্বে, তুমি কোথায়?" রাম্বে দাঁড়িয়েছিল সারির একদম শেষে। সে উত্তর দিল, "আমি তো ঠিক এখানেই আছি!"

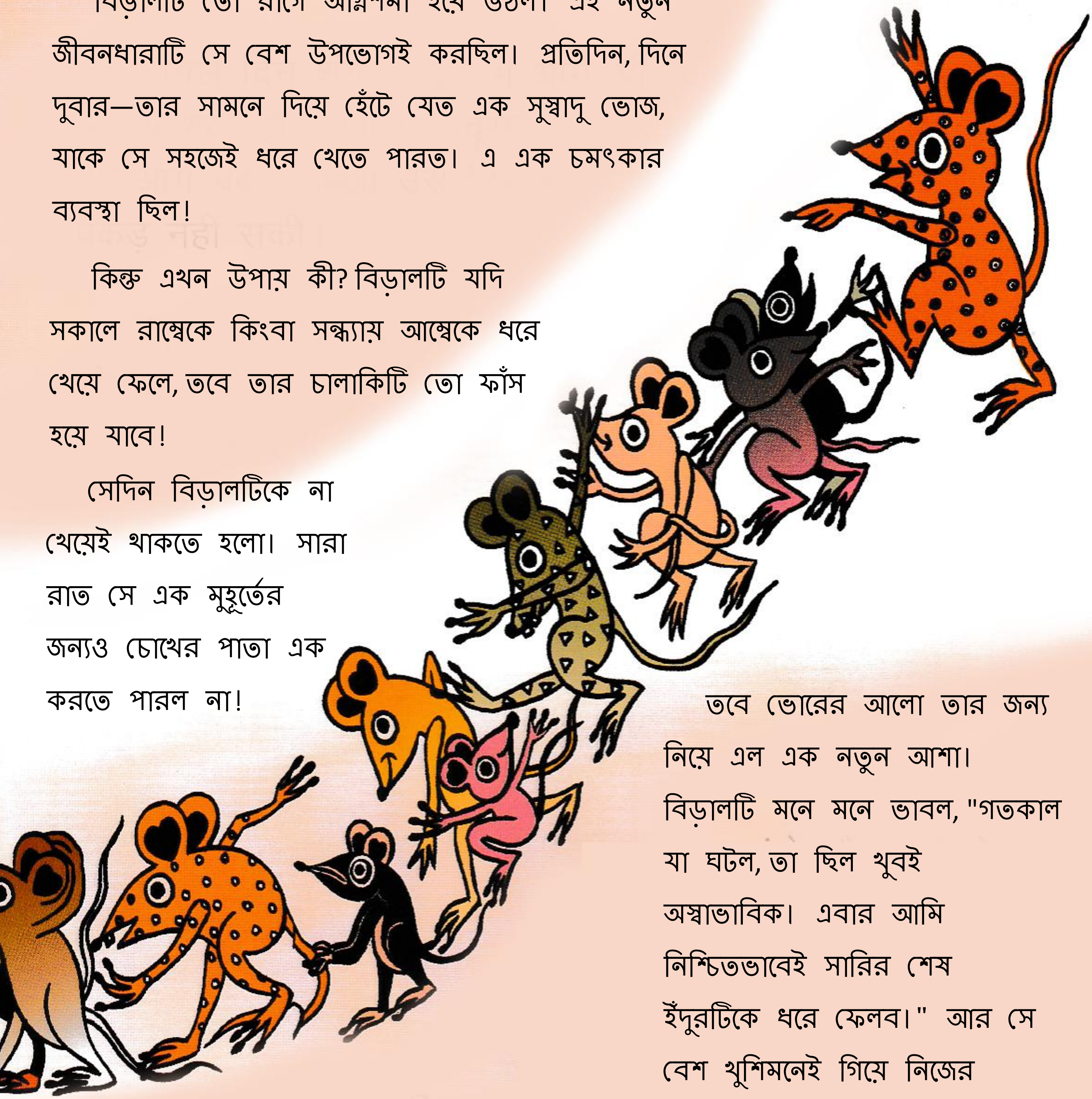


সারিটি যখন সামনের দিকে এগোচ্ছিল, তখন তারা একে অপরের নাম ধরে ডাকতে থাকল। আর সন্ধ্যায়ও তারা ঠিক একই কাজ করল—তবে এবার রাম্বে দাঁড়াল সারির সামনে আর আম্বে দাঁড়াল একদম শেষে।

বিড়ালটি তো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। এই নতুন জীবনধারাটি সে বেশ উপভোগই করছিল। প্রতিদিন, দিনে দুবার—তার সামনে দিয়ে হেঁটে যেত এক সুস্বাদু ভোজ, যাকে সে সহজেই ধরে খেতে পারত। এ এক চমৎকার ব্যবস্থা ছিল!

কিন্তু এখন উপায় কী? বিড়ালটি যদি সকালে রাম্বেকে কিংবা সন্ধ্যায় আম্বেকে ধরে খেয়ে ফেলে, তবে তার চালাকিটি তো ফাঁস হয়ে যাবে!

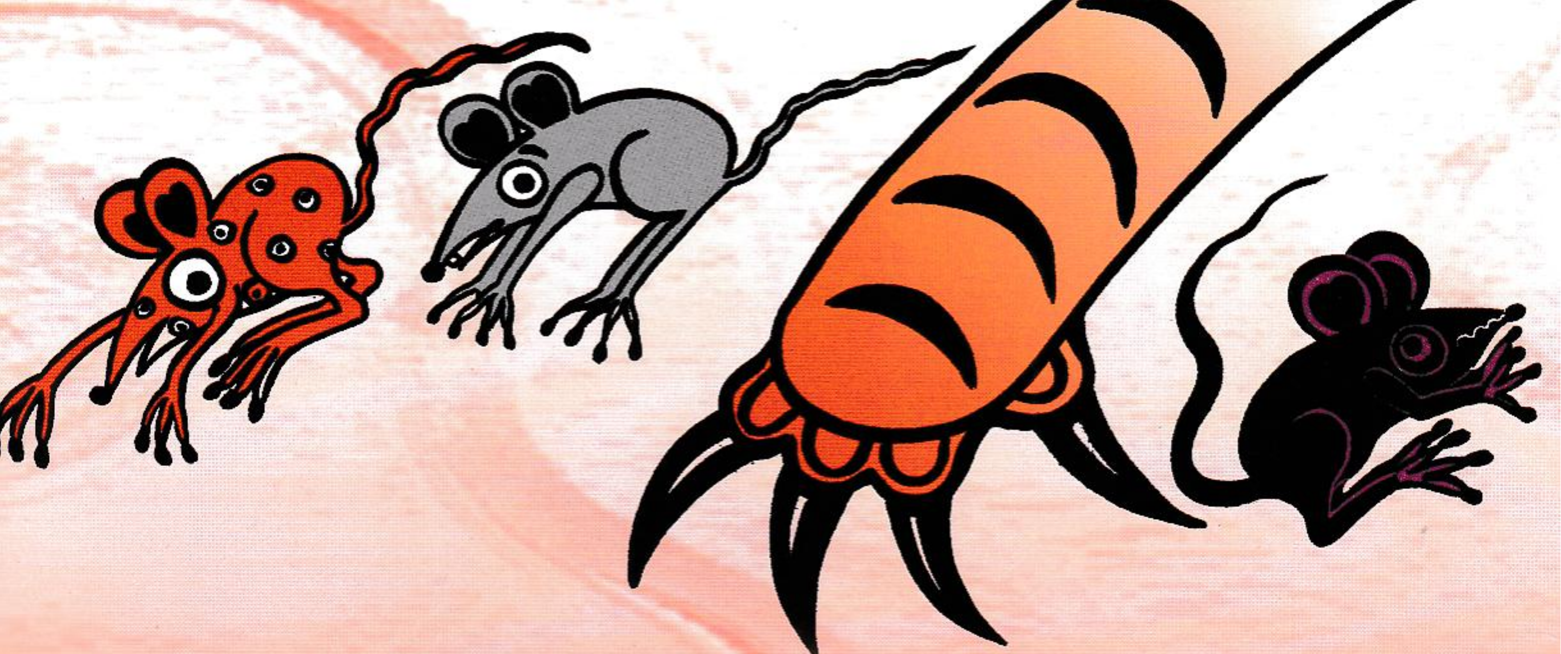
সেদিন বিড়ালটিকে না খেয়েই থাকতে হলো। সারা রাত সে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করতে পারল না!



তবে ভোরের আলো তার জন্য নিয়ে এল এক নতুন আশা। বিড়ালটি মনে মনে ভাবল, "গতকাল যা ঘটল, তা ছিল খুবই অস্বাভাবিক। এবার আমি নিশ্চিতভাবেই সারির শেষ ইঁদুরটিকে ধরে ফেলব।" আর সে বেশ খুশিমনেই গিয়ে নিজের সিংহাসনে বসল।

কিন্তু সেদিন সকালেও, শোভাযাত্রার সময় আম্বে আর রাম্বে একে অপরকে ডেকে উঠল। আর সন্ধ্যায়ও তারা ঠিক একই কাজ করল।

বিড়ালটির জন্য আরও একটি নির্ঘুম রাত! সে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। "আমাকে টেক্কা দেবে ওরা? আমি ওদের উচিত শিক্ষা দেব!"







সে রাতে আম্বে আর রাম্বে তাদের সব বন্ধুদের সতর্ক করে দিল—"তোমরা সবাই সজাগ থেকো। যদি বিড়ালটার চোখের দৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করো, তবে যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে পালিয়ে যেও।"

পরের দিন সকালে, আম্বে যখন চিৎকার করে বলল—"রাম্বে, তুমি কোথায়?"—ঠিক তখনই বিড়ালটি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কিন্তু ইঁদুরগুলো কি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না? বিদ্যুতের গতিতে তারা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তিব্বতের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

খালি পাত্র

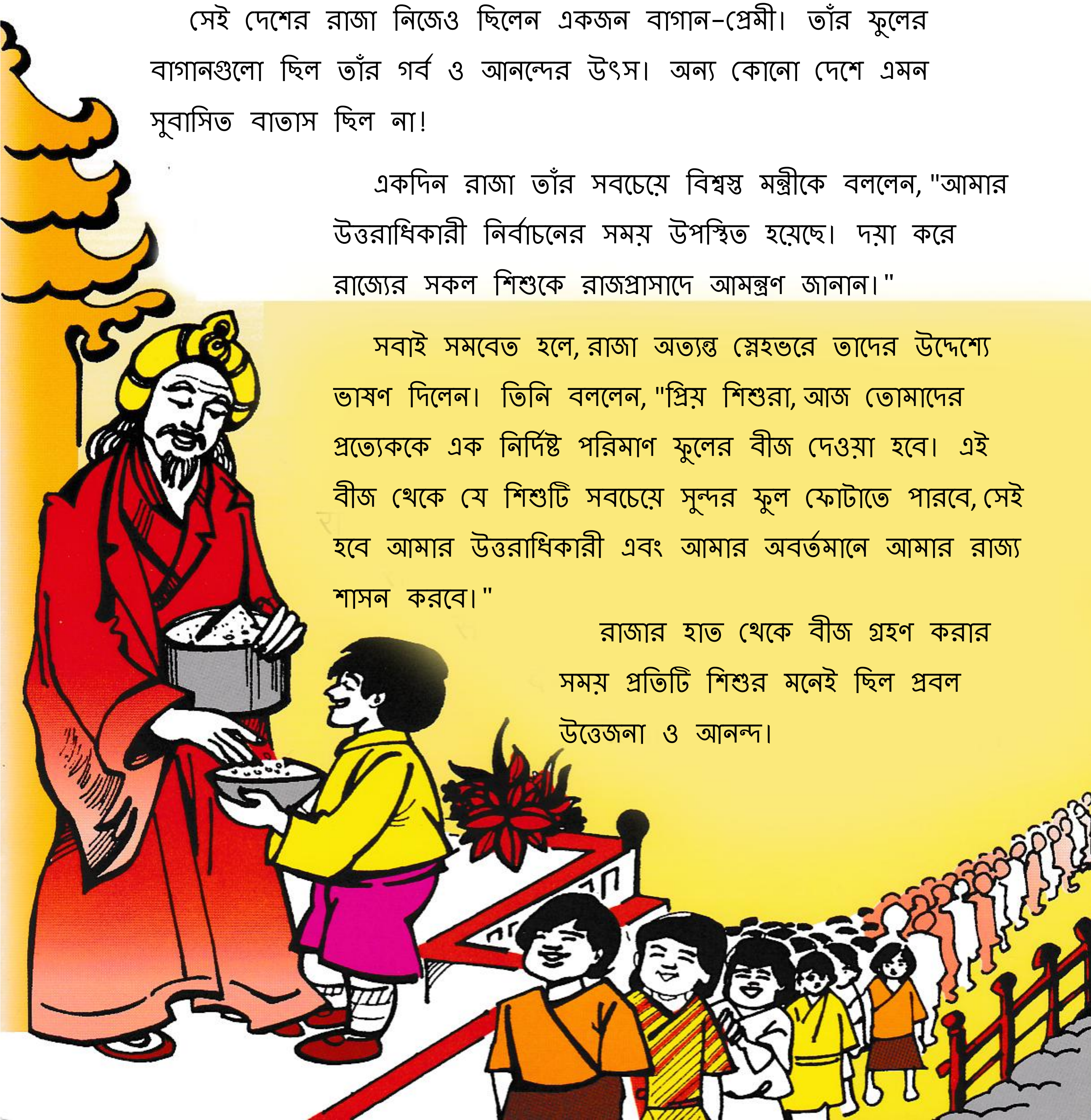
ছোট্ট পিং ছিল একজন অত্যন্ত উৎসাহী মালী। সে যা-ই রোপণ করত, তা-ই সতেজ ও সবুজ হয়ে বেড়ে উঠত। তার বাগানের ফুলগুলো সর্বদা চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হতো।

সেই দেশের রাজা নিজেও ছিলেন একজন বাগান-প্রেমী। তাঁর ফুলের বাগানগুলো ছিল তাঁর গর্ব ও আনন্দের উৎস। অন্য কোনো দেশে এমন সুবাসিত বাতাস ছিল না!

একদিন রাজা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে বললেন, "আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সময় উপস্থিত হয়েছে। দয়া করে রাজ্যের সকল শিশুকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান।"

সবাই সমবেত হলে, রাজা অত্যন্ত স্নেহভরে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "প্রিয় শিশুরা, আজ তোমাদের প্রত্যেককে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফুলের বীজ দেওয়া হবে। এই বীজ থেকে যে শিশুটি সবচেয়ে সুন্দর ফুল ফোটাতে পারবে, সেই হবে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমার অবর্তমানে আমার রাজ্য শাসন করবে।"

রাজার হাত থেকে বীজ গ্রহণ করার সময় প্রতিটি শিশুর মনেই ছিল প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দ।



ছোট্ট পিং দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এল এবং রাজার দেওয়া বীজগুলো একটি পাত্রে রোপণ করল। সে প্রতিদিন বীজগুলোতে জল দিত এবং চারা গজানোর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনত।

এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু কোনো চারাগাছই গজালো না! পিং পাত্রের মাটি বদলে দিল এবং অপেক্ষা করতে লাগল। সে বীজগুলো আরও বড় একটি পাত্রে সরিয়ে রাখল এবং আবারও অপেক্ষা করল। কিন্তু বীজগুলো থেকে কিছুতেই গাছ গজালো না!



নির্ধারিত দিনে, রাজ্যের প্রতিটি রাজপথ ফুলে ফুলে ভরে উঠল। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল নানা ফুলের সুবাসের এক মনমোহিনী মিশ্রণ।

পিং জানালার পাশে বসে শিশুদের সেই আনন্দমুখর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তার হৃদয়টা যেন ভেঙে যাচ্ছিল।

"অন্য সব শিশু রাজার দেওয়া বীজ থেকে চারাগাছ ফলাতে পেরেছে। একমাত্র আমিই ব্যর্থ হয়েছি," সে মনে মনে ভাবল। "সবাই আমার এই খালি পাত্রের দিকে তাকাবে এবং আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।" তাই সে রাজপ্রাসাদে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল।



কিন্তু পিংয়ের বাবা তাকে সাহস জোগালেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছ। আর সেটাই হলো আসল কথা—তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই!"

এদিকে রাজপ্রাসাদে, রাজা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তাদের চারাগাছগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি প্রতিটি শিশুর দিকে তাকিয়েই স্নেহমাখা হাসি হাসছিলেন, কিন্তু কোনো শিশুর সামনেই তিনি থেমে গেলেন না।

পিং যখন দৌড়ে সেখানে এসে পৌঁছাল, রাজা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন আমার জন্য একটি খালি পাত্র নিয়ে এসেছ?"

পিং কেঁদে ফেলল। সে বলল, "আপনি আমাকে যে বীজগুলো দিয়েছিলেন, আমি সেগুলো খুব ভালো মাটিতে রোপণ করেছিলাম। আমি প্রতিদিন সেগুলোতে জল দিয়েছি। কিন্তু সেগুলো থেকে কোনো চারা গজালো না! আমি মাটি বদলে দিলাম। এমনকি পাত্রটিও পরিবর্তন করলাম। কিন্তু বীজগুলো কিছুতেই গজালো না।"





রাজা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন! তিনি পিংয়ের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসলেন এবং তারপর সমস্ত আশা করে চেয়ে থাকা শিশুদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "তোমাদের ফুলগুলো তো চমৎকার!" তিনি বললেন। "কিন্তু এগুলো আমি তোমাদের যে বীজ দিয়েছিলাম, তা থেকে ফোটেনি। ওই বীজগুলো ছিল সেদ্ধ করা। সেগুলোর কোনোটি থেকেই তো চারা গজানোর কথা নয়!"

রাজা আবার পিংয়ের দিকে ফিরলেন। "একটি খালি পাত্র নিয়ে আমার কাছে আসার জন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ জানাই!" তিনি বললেন।

এরপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "এই সৎ পিং-ই হবে তোমাদের পরবর্তী রাজা।"

চীনের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist S. P. Raju

15

দর্জি ও চাঁদ



অনেক আগে, এক গ্রামে এক দর্জির একটি ছোট দোকান ছিল। সে ছিল একজন অতি সাধারণ মানুষ, যে সারাদিন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করত। তার তৈরি গরম পোশাকগুলো এত সুন্দর ছিল যে সেগুলো সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

একদিন সেই দর্জি সময়ের আগেই তার দোকান বন্ধ করে দিল। কোটটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শীতের সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎই সে একটি মৃদু কন্ঠস্বর শুনতে পেল।



"আমার ভীষণ শীত লাগছে," কন্ঠস্বরটি বলল, "আর আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। তুমি কি আমার জন্য একটি কোট সেলাই করে দেবে?"

দর্জি চারদিকে তাকাল। দৃষ্টি যতদূর যায়, রাস্তাটি ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য।

"উপরে তাকাও," কন্ঠস্বরটি বলল। "আমি তো এখানেই আছি।" দর্জি দেখল সেটি আর কেউ নয়— স্বয়ং একফালি চাঁদ!

দর্জি চাঁদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চাঁদ তখন আকাশের অনেক উঁচুতে এবং দেখতে বেশ ছোট দেখাচ্ছিল।

"ওহ! বেচারা শীতে কুঁকড়ে একেবারে ছোট হয়ে গেছে," সে মনে মনে ভাবল। তাই, সে চাঁদের জন্য একটি সুন্দর ও গরম কোট সেলাই করে দিতে রাজি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে, দর্জি খাঁটি রেশমের কিছু টুকরো জড়ো করল এবং চাঁদের আকৃতি অনুযায়ী সেগুলো কেটে নিল। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সে কোটটি সেলাই শেষ করে ফেলল। কোটটি ছিল সাদা এবং নকশার দিক থেকে বেশ সাদামাটা, তবে এর ভেতরের আস্তরণটি ছিল বেশ পুরু।

চাঁদ তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সে পরম আগ্রহে কোটটি হাতে নিল এবং গায়ে পরার চেষ্টা করল। কিন্তু একি! কোটটি যে তার শরীরের তুলনায় বড্ড ছোট হয়ে গেছে!

"তুমি তো আমার মাপই নাওনি," চাঁদ ধমকের সুরে বলল। "ঠিক এই কারণেই কোটটি আমার গায়ে ছোট হয়ে গেছে।"

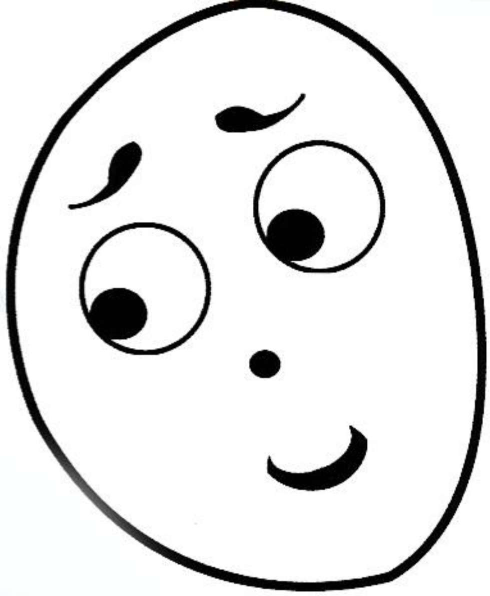
একটি ঈগল এগিয়ে এসে সাহায্যের প্রস্তাব দিল। "তোমার মাপার ফিতাটি আমাকে দাও, দর্জিভাই," সে বলল। "আমিই চাঁদের মাপ নিয়ে আসছি!"

ঈগলটি চাঁদের চারপাশে চক্কর দিয়ে উড়ে বেড়াল। এরপর ফিরে এসে সে দর্জির কাছে চাঁদের মাপগুলো বলে শোনাল। দর্জি তখন চাঁদের মাপমতো একটি নতুন ও নিখুঁত কোট তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

উৎসবের এই সময়টি দর্জির জন্য ছিল অত্যন্ত ব্যস্ততার সময়। কোটটি সেলাই শেষ করতে তার পুরো এক সপ্তাহ সময় লেগে গেল! সে অত্যন্ত মিহি সুতোয় বোনা, হালকা ক্রিম রঙের পশম দিয়ে কোটটি তৈরি করল। এরপর কোটের কলার এবং হাতার অংশে সে রুপালি সুতোর কারুকাজ ফুটিয়ে তুলল। কোটটি দেখতে সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল!



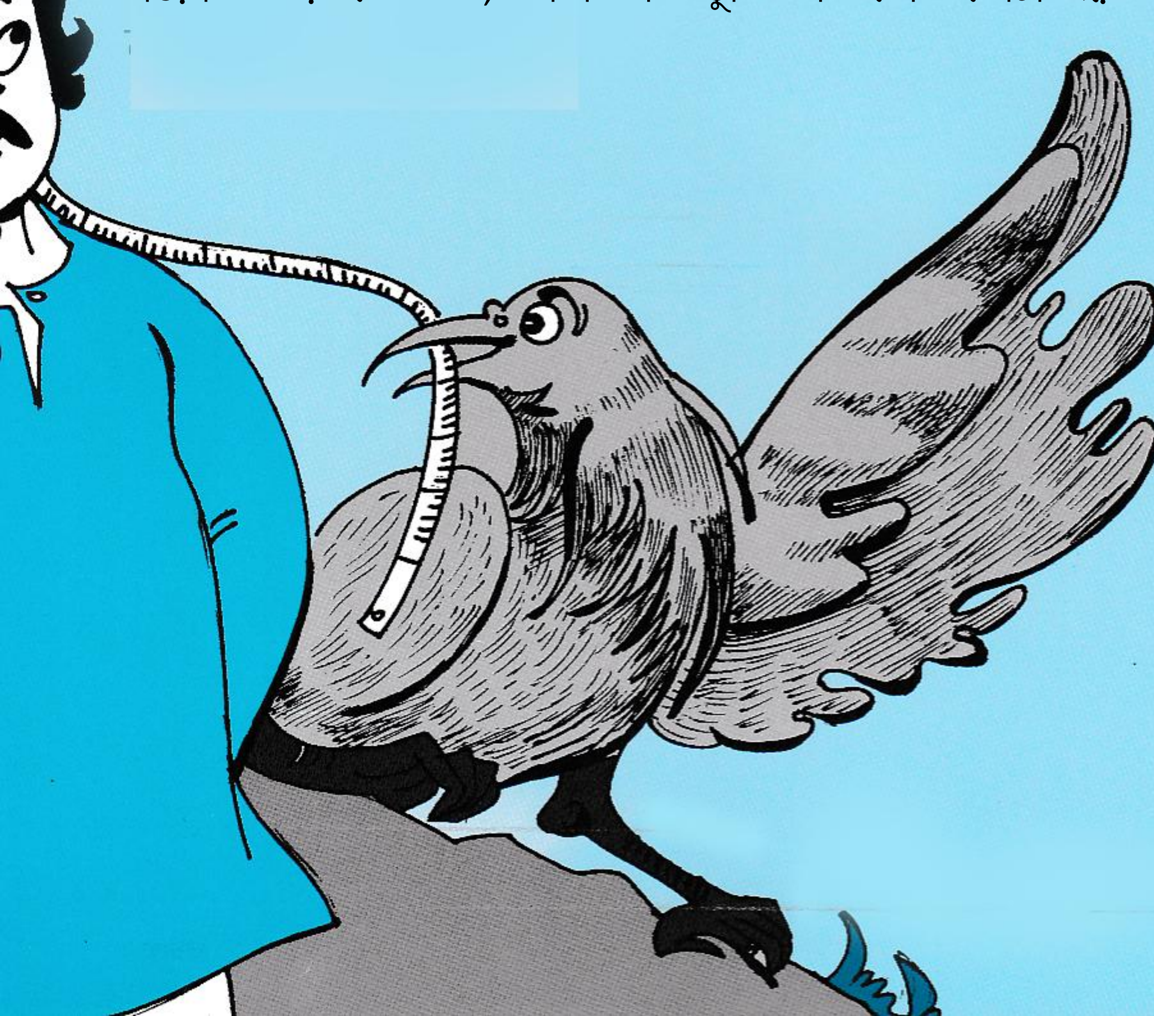
চাঁদ সেই সূক্ষ্ম ও নিপুণ কারুকাজের দিকে একবার তাকিয়েই আনন্দে বলে উঠল, "সাবাশ দর্জিভাই! তুমি দারুণ কাজ করেছ!" কিন্তু হায়! এবারও কোটটি তার গায়ে লাগল না—সে কোনোভাবেই কোটটির ভেতর ঢুকতে পারল না!



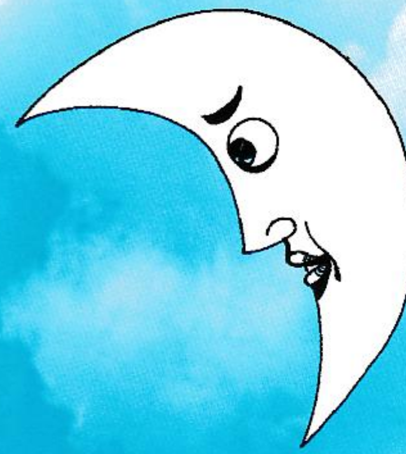
এবার রেগে যাওয়ার পালা ছিল দর্জির। "দেখো তো, তুমি দিন দিন কতটা মোটা হয়ে গেছ!" সে চাঁদের উদ্দেশ্যে বলল। "এই কোট তোমার গায়ে কখনোই ঠিকমতো লাগবে না!"

"দয়া করে," চাঁদ বলল। "আর মাত্র একটা বানিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি, এটাই হবে শেষটি।"

দর্জি রাজি হলো। "হ্যাঁ, এটাই হবে শেষটি!" এই বলে সে চলে গেল; যাওয়ার সময় সে বলল, "আশা করি তুমি আর বেশি মোটা হয়ে যাবে না।"



এবার সে কাপড়ের টুকরো-টাকরা জড়ো করে বিশাল এক ওভারকোট সেলাই করল। কোটটি ছিল প্রায় নিখুঁত গোলাকার, আর তার সারা গায়ে আনন্দের সাথে দুলছিল সাদা সুতোর পেঁচানো নকশা। রুপোর বকলেস দিয়ে কোটটি আটকানো ছিল। কোটটি ছিল সত্যিই চমৎকার!



দর্জি সেটি চাঁদকে দিল। কিন্তু চাঁদ কি তখন গোলাকার ছিল?

"এত বড় একটা জিনিস আমাকে শীত থেকে কীভাবে বাঁচাবে?" কোটটির সুন্দর নকশার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে চাঁদ বিরক্তিভরে বলল। কোটটি তার গায়ে ঢিলেঢালাভাবে ঝুলে রইল।

"আমি সত্যিই জানি না!" দর্জি কড়া গলায় জবাব দিল।

সেই থেকে, সেই সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ—যা আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে—তা দেখে দর্জির মনে আর বিন্দুমাত্র আনন্দ জাগে না।

"আশা করি, ওই খামখেয়ালি চাঁদের মতো খদ্দের যেন আর কখনোই আমার সামনে না আসে!" সে মনে মনে বিড়বিড় করে বলে।

নিরুপমা রাঘবনের একটি গল্পের অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist S. P. Raju

জাদুর আম

অনেক, অনেক দিন আগের কথা—এক বনে একটি বিশাল আমগাছ ছিল। একদিন প্রবল ঝড়ে গাছটি দুলে উঠল। গাছ থেকে একটি পাকা আম মাটিতে খসে পড়ল। এটি কোনো সাধারণ আম ছিল না; এটি ছিল একটি জাদুর আম!

জাদুর আমটি খুব খুশি হলো। এখন সে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে এবং পৃথিবীটা দেখতে পাবে।

বন পেরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সে একটি খোলা মাঠে এসে পৌঁছাল। সে অবিরাম গড়িয়ে চলল, যতক্ষণ না তার সাথে একটি ছাগলের দেখা হলো।

ছাগলটি তখন আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল সেই জাদুর আমটির ওপর। "থাম!" ছাগলটি ব্যা-ব্যা করে ডেকে উঠল। "আমি তোকে খাব!"



কিন্তু জাদুর আমটি হেসে উঠল। সে গান গেয়ে উঠল—

আমি এক জাদুর আম,
কেউ আমায় ধরতে পারে না।
আমি গড়াই, আমি ঘুরি,
আমি বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলি!
আমার দিকে চেয়ে দেখো—আমি মুক্ত!



জাদুর আমটি আরও দ্রুতগতিতে গড়িয়ে চলল। ছাগলটি তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল।

গ্রামের একটি ছেলে তখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। সে দেখতে পেল জাদুর আমটি গড়িয়ে আসছে। "থাম!" সে হুকুম দিল। "আমি তোকে খাব!"

আমটি আবারও হেসে উঠল এবং গান গেয়ে উঠল—

আমি এক জাদুর আম,

কেউ আমায় ধরতে পারে না।

আমি গড়াই, আমি ঘুরি,

আমি বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলি!

আমার দিকে চেয়ে দেখো—আমি মুক্ত!

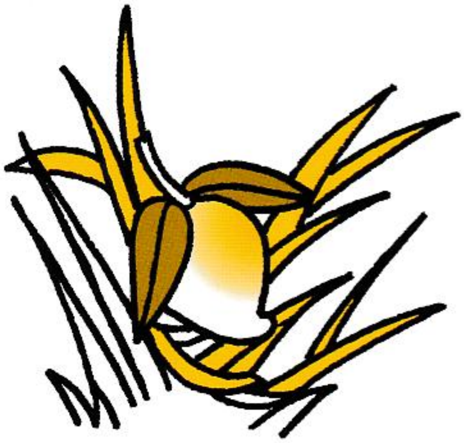
আমটি দ্রুতবেগে ছুটে পালাল।

ছাগলটি আর ছেলেটি তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল।



কয়েকটি মেয়ে তখন বাগানে খেলা করছিল। তারা আমটিকে দেখতে পেল এবং ডেকে বলল, "থাম! আমরা তোকে খাব!" তারাও জাদুর আমটির পিছু ধাওয়া করতে শুরু করল।

জাদুর আমটি তার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। এখন সে ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেল। এমনকি ছাগলটিও তার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না!



আমটি গান গেয়ে চলল—

আমি এক জাদুর আম,

কেউ আমায় ধরতে পারে না।

আমি গড়াই, আমি ঘুরি,

আমি বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলি!

আমার দিকে চেয়ে দেখো—আমি মুক্ত!

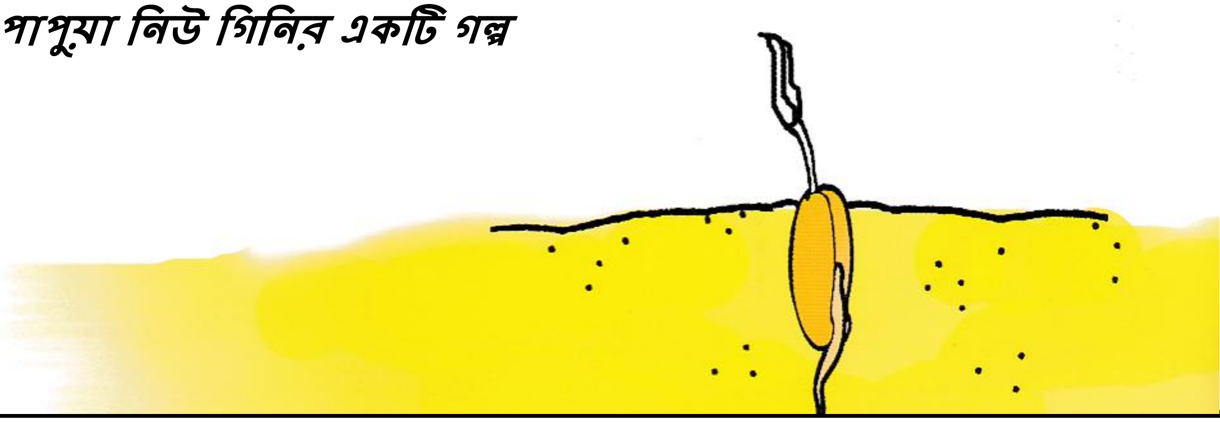
সে অবিরাম গড়িয়ে চলল। আর তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল সেই ছাগল, ছেলেটি এবং মেয়েগুলো। কিন্তু আমটি তাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী ছিল! দেখতে দেখতেই সে তাদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। জাদুর আমটি মাঠ–ঘাট, বাগান–বাগিচা আর ছায়াময় কুঞ্জবন পেরিয়ে অবিরাম গড়িয়ে চলল।

হঠাৎ সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সে দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমিয়ে ছিল—কত মাস ধরে! একদিন সূর্যের কিরণ নিজের গায়ে অনুভব করে তার ঘুম ভাঙল।

সে টের পেল যে, তার পরিবর্তন ঘটেছে... তার অংকুরোদগম হচ্ছে...

হ্যাঁ! সেই জাদুকরী আমটি একটি গাছে পরিণত হচ্ছিল!

পাপুয়া নিউ গিনির একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

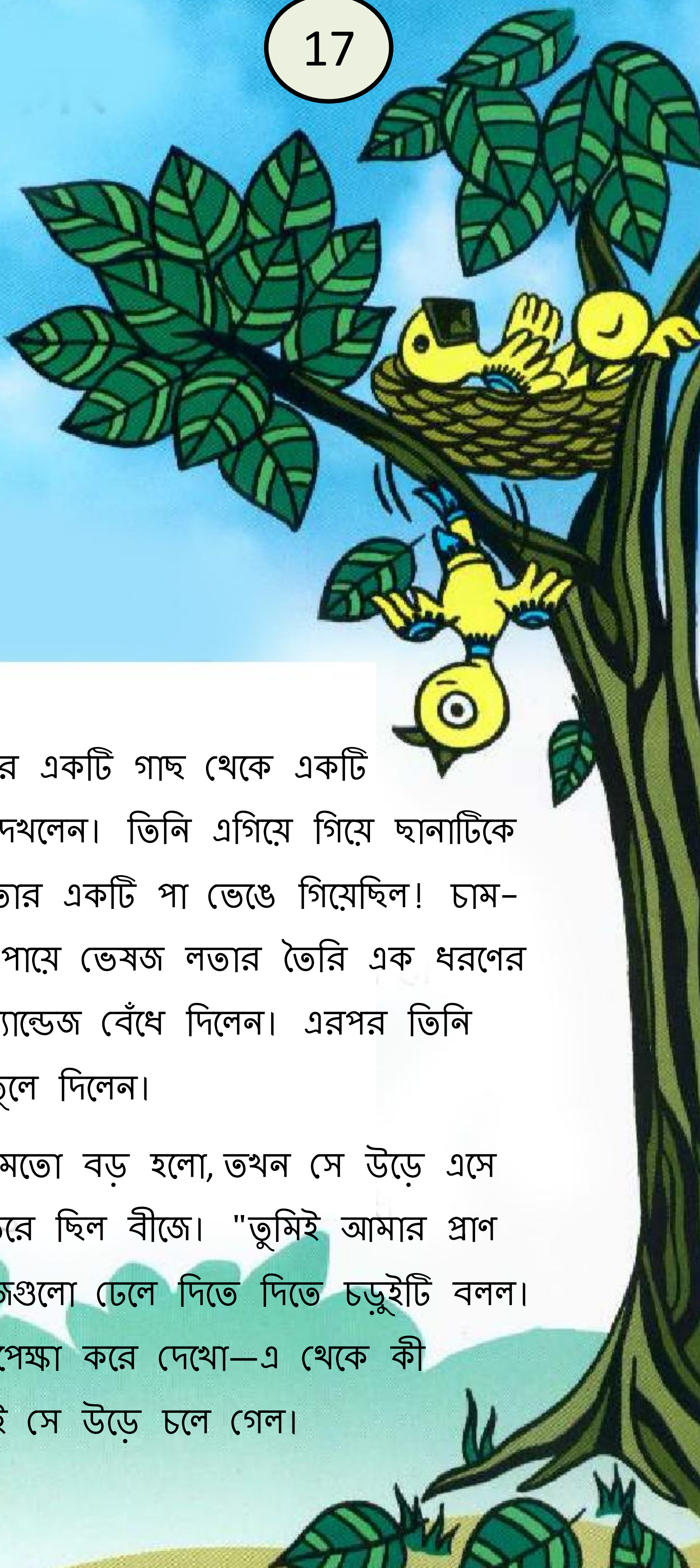
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

চড়ুইয়ের উপহার

17



সে-রিং এবং চাম-বা ছিলেন প্রতিবেশী। কিন্তু তাঁদের স্বভাবের মধ্যে কোনো মিলই ছিল না। সে-রিং ছিলেন অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের মানুষ এবং অন্যদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। অন্যদিকে, চাম-বা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু; বিপদে পড়লে তিনি নির্দ্বিধায় যে-কাউকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

একদিন চাম-বা তাঁর বাড়ির কাছের একটি গাছ থেকে একটি ছোট্ট চড়ুই ছানাকে নিচে পড়ে যেতে দেখলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে ছানাটিকে কুড়িয়ে নিলেন। আহা, বেচারা চড়ুই! তার একটি পা ভেঙে গিয়েছিল! চাম-বা অত্যন্ত যত্নসহকারে ছানাটির ভাঙা পায়ে ভেষজ লতার তৈরি এক ধরণের প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন এবং পা-টিতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। এরপর তিনি চড়ুই ছানাটিকে পুনরায় তার বাসায় তুলে দিলেন।

যখন চড়ুই ছানাটি উড়তে শেখার মতো বড় হলো, তখন সে উড়ে এসে চাম-বার কাঁধে বসল। তার ঠোঁটটি ভরে ছিল বীজে। "তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ," চাম-বার হাতের তালুতে বীজগুলো ঢেলে দিতে দিতে চড়ুইটি বলল। "এই বীজগুলো নিয়ে রোপণ করো। অপেক্ষা করে দেখো—এ থেকে কী চমৎকার ফসল ফলে!" এই কথা বলেই সে উড়ে চলে গেল।

চাম-বা সেই বীজগুলো মাটিতে রোপণ করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ক্ষেতে ভুট্টার চমৎকার ফলন হলো। গাছগুলো বেশ লম্বা হয়ে উঠল এবং সোনালি রঙ ধারণ করল। একদিন তিনি তাঁর বাগানে গিয়ে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন! ভুট্টার ছড়াগুলোতে শস্যদানা পাকার পরিবর্তে ঝলমল করছিল মহামূল্যবান সব রত্নপাথর। এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা! চাম-বা সেই রত্নগুলো সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলো নিয়ে বাজারে গেলেন। বাজার থেকে তিনি ফেরার পর তিনি অনেক ধনী হয়ে গেলেন!

এবার চাম-বা তাঁর পরিবারের জন্য একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করলেন এবং নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলেন দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের সেবায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুখী একজন মানুষ!

এদিকে, সে-রিং চাম-বার জীবনের এই আমূল পরিবর্তনগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "লোকটা কীভাবে এত ধনী হয়ে গেল?" এর রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য তিনি চাম-বার কাছে গেলেন। চাম-বা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সে-রিং-কে চড়ুই ছানাটির বাসা থেকে পড়ে যাওয়া এবং তার পা ভেঙে যাওয়ার পুরো ঘটনাটি খুলে বললেন।





এরপর তিনি সে-রিং-কে চড়ুইটির দেওয়া সেই উপহারের বীজগুলোর কথাও জানালেন। তিনি তাঁকে পুরো ঘটনাটিই বললেন—কোনো কিছুই গোপন করলেন না। বাড়ি ফেরার পথে সে-রিং মনে মনে ভাবলেন, "চাম-বার মতো আমিও কেন ধনী হতে পারব না?" তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনিও নিজের জন্য কিছু মহামূল্যবান রত্নপাথর সংগ্রহ করবেন!

সে-রিং গাছের ডালে ডালে চড়ুইয়ের বাসা খুঁজতে লাগলেন; অবশেষে তিনি একটি চড়ুইয়ের বাসার সন্ধান পেলেন। তিনি লাঠি দিয়ে বাসাটিতে ক্রমাগত খোঁচা দিতে লাগলেন, যতক্ষণ না একটি চড়ুই ছানা বাসা থেকে নিচে পড়ে গেল। তিনি ছানাটিকে কুড়িয়ে নিলেন, তার ভাঙা পায়ে ভেষজ প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন এবং ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। এরপর তিনি পাখিটিকে আবার বাসায় ফিরিয়ে দিলেন।

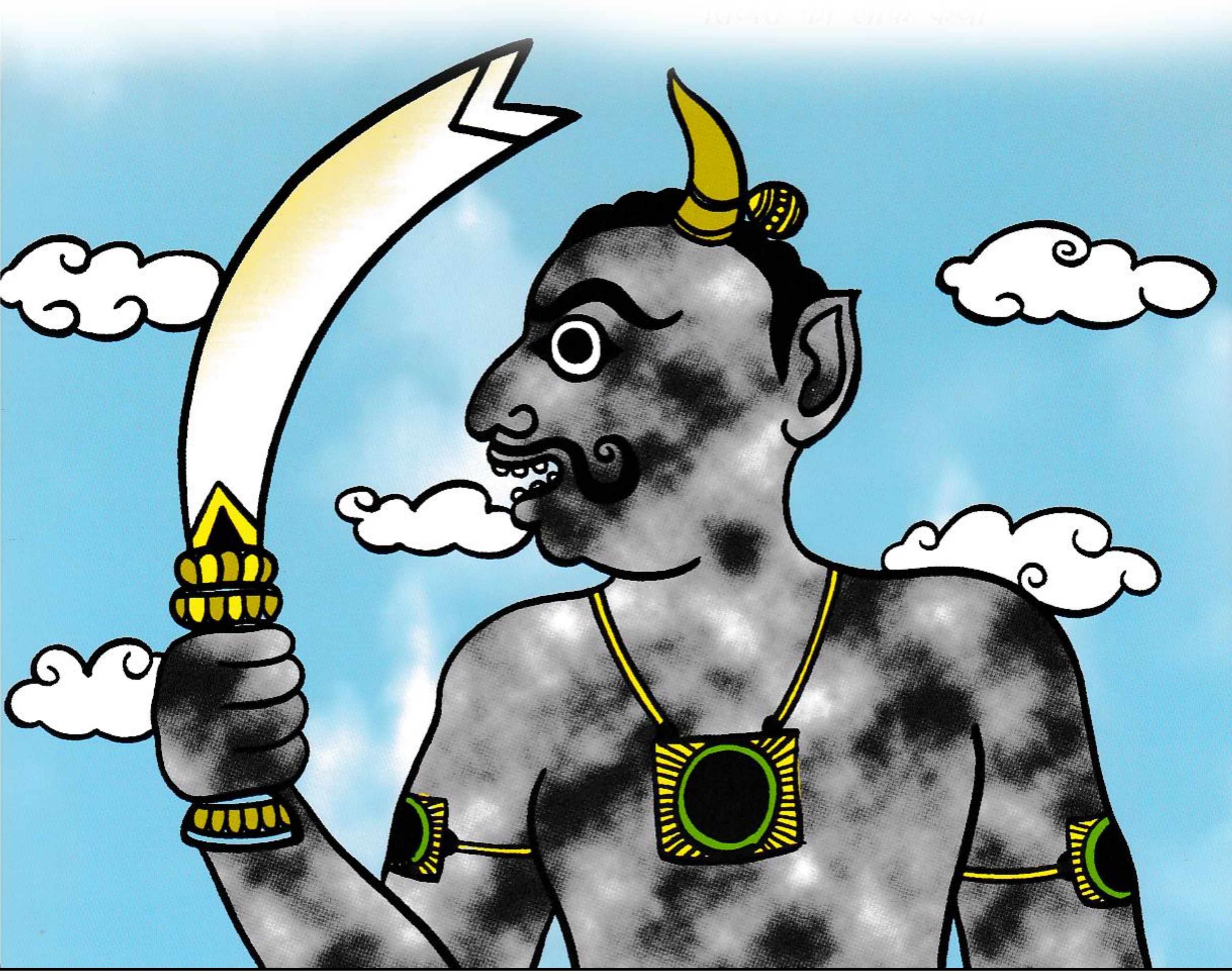
কিছুক্ষণ পর চড়ুইটি ফিরে এল এবং তার হাতের ওপর কয়েকটি বীজ ফেলে দিয়ে বলল, "এগুলো পুঁতে দেখো তো কী জন্মায়!"

সে-রিং বীজগুলো রোপণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ক্ষেতে ভুট্টার ফলন হলো। প্রতিদিন তিনি ভুট্টার ছড়াগুলোর ভেতর রত্ন বা মণি-মুক্তা খুঁজে দেখতেন।

এরপর তিনি ক্ষেতে গিয়ে এক ভয়ানক ধাক্কা খেলেন! ভুট্টার গাছগুলোর জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল এক ভয়ংকর দর্শন রাক্ষস; সে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার ওপরে তোলা হাতে ধরা ছিল এক বিশাল তলোয়ার!

সে-রিং যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। রাক্ষসটিও তার পিছু নিল। সে-রিংয়ের সমস্ত গয়নাগাটি আর নগদ টাকা-পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে রাক্ষসটি—ফুস—হঠাৎ করেই শূন্যে মিলিয়ে গেল!

তিব্বতের একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

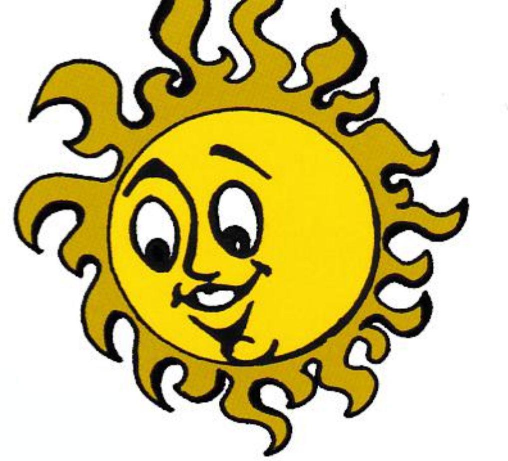
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

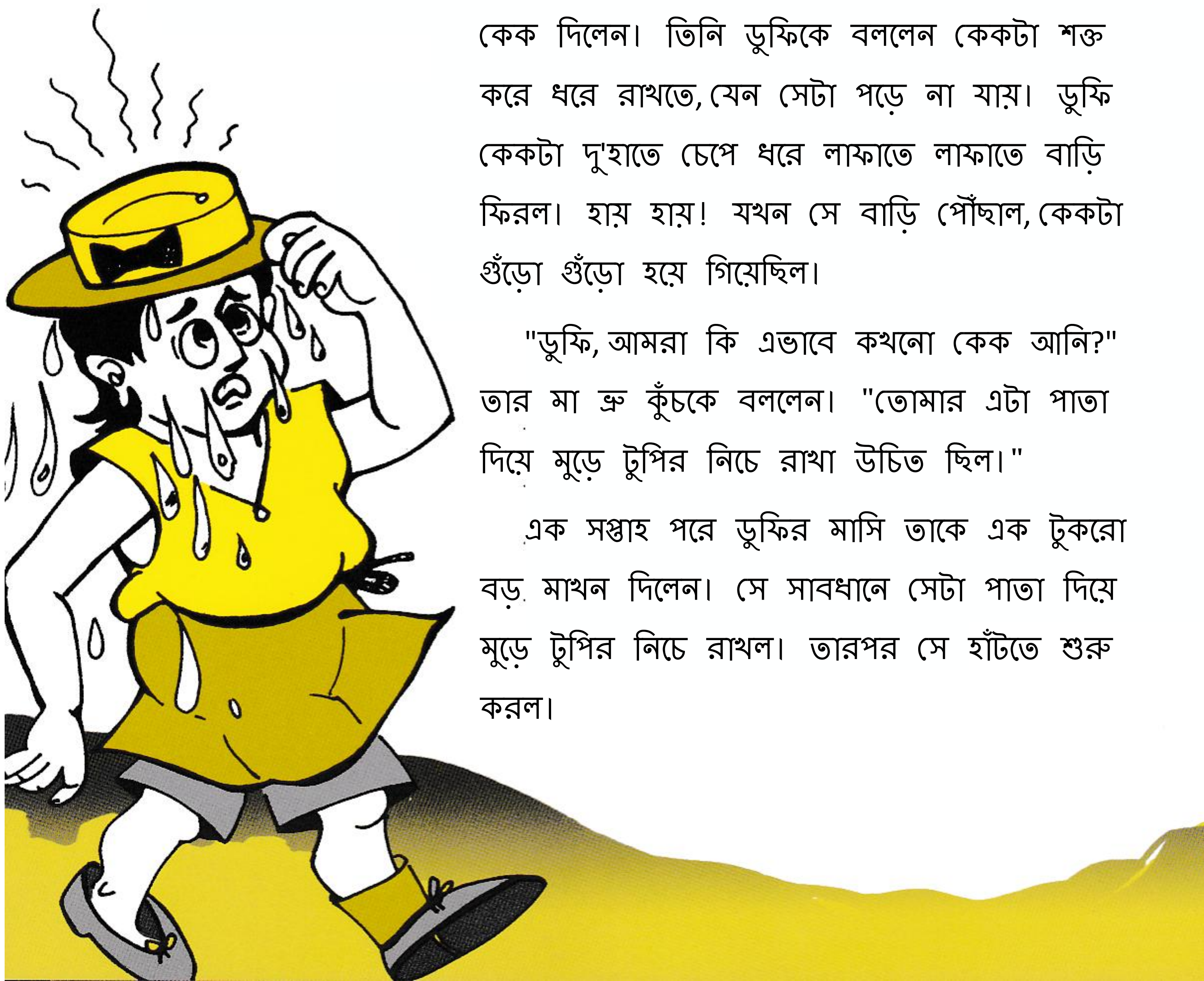
Artist Uma Krishnaswamy

18

কর্তব্যপরায়ণ ডুফি



ডুফি প্রায়ই তার মাসির কাছে বেড়াতে যেত। মাসি তাকে খুব ভালবাসতেন। মাসি যখন বাড়ির কাজ করতেন, সেসময় তাকে খেলতে দিতেন। বেড়ানো শেষ হলে, তিনি সবসময় ডুফির বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ভালো ভালো খাবার গুছিয়ে দিতেন।



একদিন, ডুফির মাসি তাকে একটা বড় চকোলেট কেক দিলেন। তিনি ডুফিকে বললেন কেকটা শক্ত করে ধরে রাখতে, যেন সেটা পড়ে না যায়। ডুফি কেকটা দু'হাতে চেপে ধরে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল। হায় হায়! যখন সে বাড়ি পৌঁছাল, কেকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

"ডুফি, আমরা কি এভাবে কখনো কেক আনি?" তার মা ভ্রু কুঁচকে বললেন। "তোমার এটা পাতা দিয়ে মুড়ে টুপির নিচে রাখা উচিত ছিল।"

এক সপ্তাহ পরে ডুফির মাসি তাকে এক টুকরো বড় মাখন দিলেন। সে সাবধানে সেটা পাতা দিয়ে মুড়ে টুপির নিচে রাখল। তারপর সে হাঁটতে শুরু করল।



ওহ! সেদিন খুব গরম ছিল! ডুফি যখন বাড়ি পৌঁছাল, ততক্ষণে তার পুরো মুখ মাখনে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তার জামাতেও মাখন গড়িয়ে পড়ছিল! টুপ টুপ টুপ। কী বিশ্রী অবস্থা!

ডুফিকে দেখে তার মা বেশ অবাক হলেন। তিনি বললেন, "আরে, ডুফি! এভাবে মাখন আনতে হয় না! তোমার উচিত ছিল প্রথমে এটাকে ঠান্ডা জলে রাখা।"

পরের সপ্তাহে, ডুফির মাসি তাকে একটি মিষ্টি ছোট্ট কুকুরছানা দিলেন। ডুফি সেটিকে এক হাঁড়ি ঠান্ডা জলে রাখল। বাড়ি ফেরার পুরোটা পথ ওটা কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করতে লাগল!

ডুফির মা জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী করলে! বেচারা কুকুরছানাটা ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে! তোমার উচিত ছিল ওর গলায় একটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া।"

পরেরবার, ডুফির মিষ্টি মাসি তাকে এক টুকরো সদ্য সেঁকা পাউরুটি গুছিয়ে দিলেন। ডুফি ভাবল, "এটা কী করে নিয়ে যাব? ওহ, হ্যাঁ! দড়ি!" আর সে সাবধানে দড়ির এক প্রান্ত পাউরুটির চারপাশে বেঁধে নিল এবং রাস্তা ধরে সেটাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে লাগল!

রুটিটা টেনে আনা হতে দেখে তার মা প্রায় মূর্ছাই গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি তার ডুফিকে বকা দিলেন না। পরিবর্তে, তিনি তাকে বললেন, "তোমার আদরের মাসি সত্যি খুব ভালো! কিন্তু আমরা আপাতত তার সাথে দেখা করতে যেতে পারছি না। আমরা ছুটির সময় তার সাথে দেখা করতে যাব। আর আমরা তার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে যাব!"



এরপর সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু ডুফির মতো ছেলে থাকলে, শান্ত সময় বেশিদিন টেকে না!

একদিন, ডুফির মাকে এক অসুস্থ চাচাতো ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যেতে হলো। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তিনি বললেন, "ডুফি, আমি কিছু ক্রিস্পব্রেড শুকোতে দিয়েছি। তাই দয়া করে সাবধানে পা ফেলো।"

কিছুক্ষণ পর ডুফি ফ্যাকাশে গোল রুটিগুলো দেখতে গেল। মা কী বললেন? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন: "সাবধানে পা ফেলো!" তাই সে প্রত্যেকটি রুটির উপর সাবধানে পা ফেলল!

একটি ইউরোপীয় লোককথার উপর ভিত্তি করে



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist S. P. Raju

টুনটুনি



রাজকীয় বাগানে বসে টুনটুনি পাখিটা বেরি খাচ্ছিল। উফ! হঠাৎ একটা কাঁটা ওর গলায় বিঁধে গেল!

কান্নাকাটি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে টুনটুনি উড়ে গেল রাজবাড়ির নাপিতের কাছে এবং তাকে অনুরোধ করল কাঁটাটা বের করে দিতে।

কিন্তু নাপিত বলল, "আমি হলাম রাজার নাপিত! আমি তোমাকে সাহায্য করব না, ওরে ছোট্ট পাখি! দূর হ এখান থেকে!"

টুনটুনি তখন উড়ে গেল রাজার কাছে। সে বলল, "টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে! কিন্তু নাপিত আমাকে সাহায্য করছে না! দয়া করে তাকে শাস্তি দিন!"

রাজা তখন হো হো করে হেসে উঠলেন।

টুনটুনি তখন উড়ে গেল ইঁদুরের কাছে এবং ছড়ার সুরে বলতে লাগল—

"ও ইঁদুর! টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে। কিন্তু নাপিত আমাকে সাহায্য করছে না! রাজা নাপিতকে শাস্তি দিচ্ছেন না! তুমি যাও আর রাজা যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন তাকে কামড়ে দিও!"

কিন্তু ইঁদুরটা দৌড়ে পালাল এবং নিজের গর্তের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। টুনটুনি তখন গেল বিড়ালের কাছে এবং তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে বলল—

"ও বিড়াল! টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে।
কিন্তু নাপিত আমাকে সাহায্য করছে না!
রাজা নাপিতকে শাস্তি দিচ্ছেন না!
ইঁদুর রাজাকে কামড়াচ্ছে না!
তুমি যাও, ওই দুষ্টু ইঁদুরটাকে ধরে খেয়ে ফেলো!"



কিন্তু বিড়াল বলল, "এখন নয়! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে!"

টুনটুনি তখন উড়ে গেল লাঠিটার কাছে এবং বলল—

"ও লাঠি! টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে।

বিড়াল ইঁদুরটাকে ধরছে না! তুমি যাও আর ওই অলস বিড়ালটাকে পিটিয়ে এসো!"

কিন্তু লাঠি বলল, "আমি কেন বিড়ালকে মারতে যাব? বিড়াল তো কখনো আমার কোনো ক্ষতি করেনি!"

বেচারা টুনটুনি তখন কেঁদে ফেলল! তারপর সে দেখতে পেল আগুনকে; সে উড়ে গিয়ে আগুনের চারপাশে চক্কর দিতে লাগল।

"ও আগুন! টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে।

লাঠি বিড়ালকে পেটাচ্ছে না!

তুমি যাও আর ওই অকেজো লাঠিটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও!"

"আমি সারাদিন ধরে জ্বলছি," আগুন বলল। "এখন আমি খুব ক্লান্ত। দুঃখিত!"

টুনটুনি তখন উড়ে গেল নদীর কাছে এবং ডেকে বলল—

"ও নদী! টুনটুনি ভীষণ কষ্টে আছে।

আগুন লাঠিটাকে পোড়াচ্ছে না!

তুমি তোমার কূল ছাপিয়ে উঠে এসো আর ওই স্বার্থপর আগুনটাকে নিভিয়ে দাও!"

কিন্তু নদী নীরবে বয়েই চলল। টুনটুনি তখন উড়ে গেল হাতির কাছে এবং ছড়ার সুরে বলতে লাগল—

"ও হাতি! টুনটুনির ভীষণ কষ্ট!

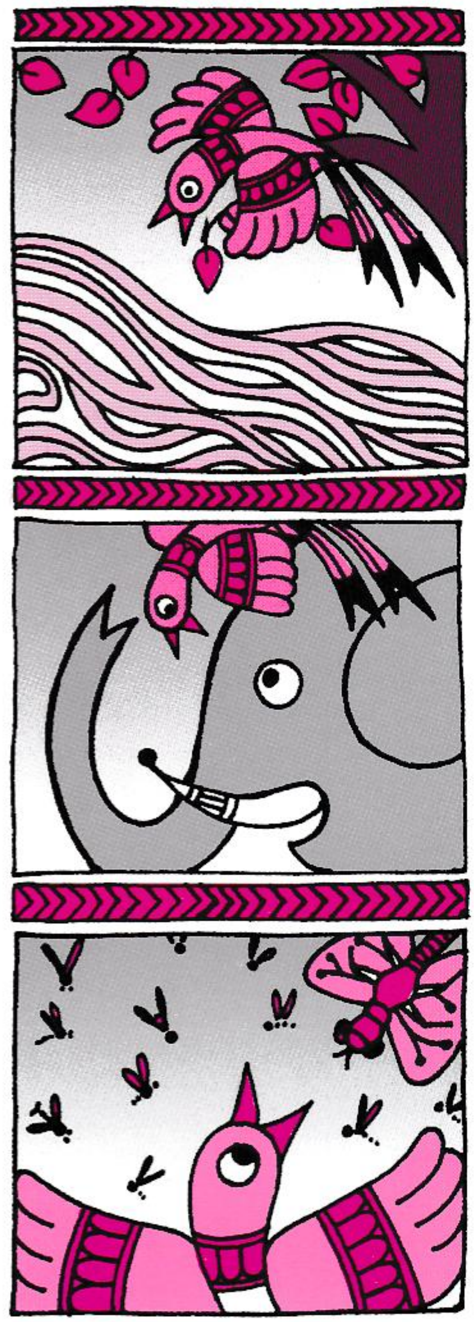
নদী আগুন নেভাবে না!

যাও, গিয়ে ওই অহংকারী নদীর সব জল শুষে খেয়ে ফেলো!"

হাতি বলল, "কে? আমি? আমি যদি নদীর সব জল খেয়ে ফেলি, তবে তো আমি ফেটে মরে যাব!"

টুনটুনি তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সে গাছের একটি ডালে বসল। তার চোখ বুজে এল। ঠিক তখনই, "ভন-ভন-ভন"—একটি মশার গুঞ্জন শোনা গেল। হঠাৎ টুনটুনির মনে সাহস ফিরে এল!

"ও মশা! টুনটুনির ভীষণ কষ্ট!
হাতি নদীর জল খাবে না!
যাও, গিয়ে ওই বোকা হাতির সারা শরীরে কামড় বসিয়ে দাও!"



"খুব আনন্দের সাথেই তা করব, টুনটুনি!"—গুঞ্জন করে বলল মশা।

এরপর সেখানকার সব মশা ঝাঁকে ঝাঁকে হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে কামড়ে জর্জরিত করে ফেলল। হাতি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। সে দৌড়ে গিয়ে নদীর জলে লুকাল। কিন্তু মশাগুলো তার পিছু ছাড়ল না!

তাই হাতি টুনটুনিকে বলল, "আমি নদীর সব জল খেয়ে ফেলব।"

নদী তখন উপচে উঠল। "আমি আগুন নেভাব!"

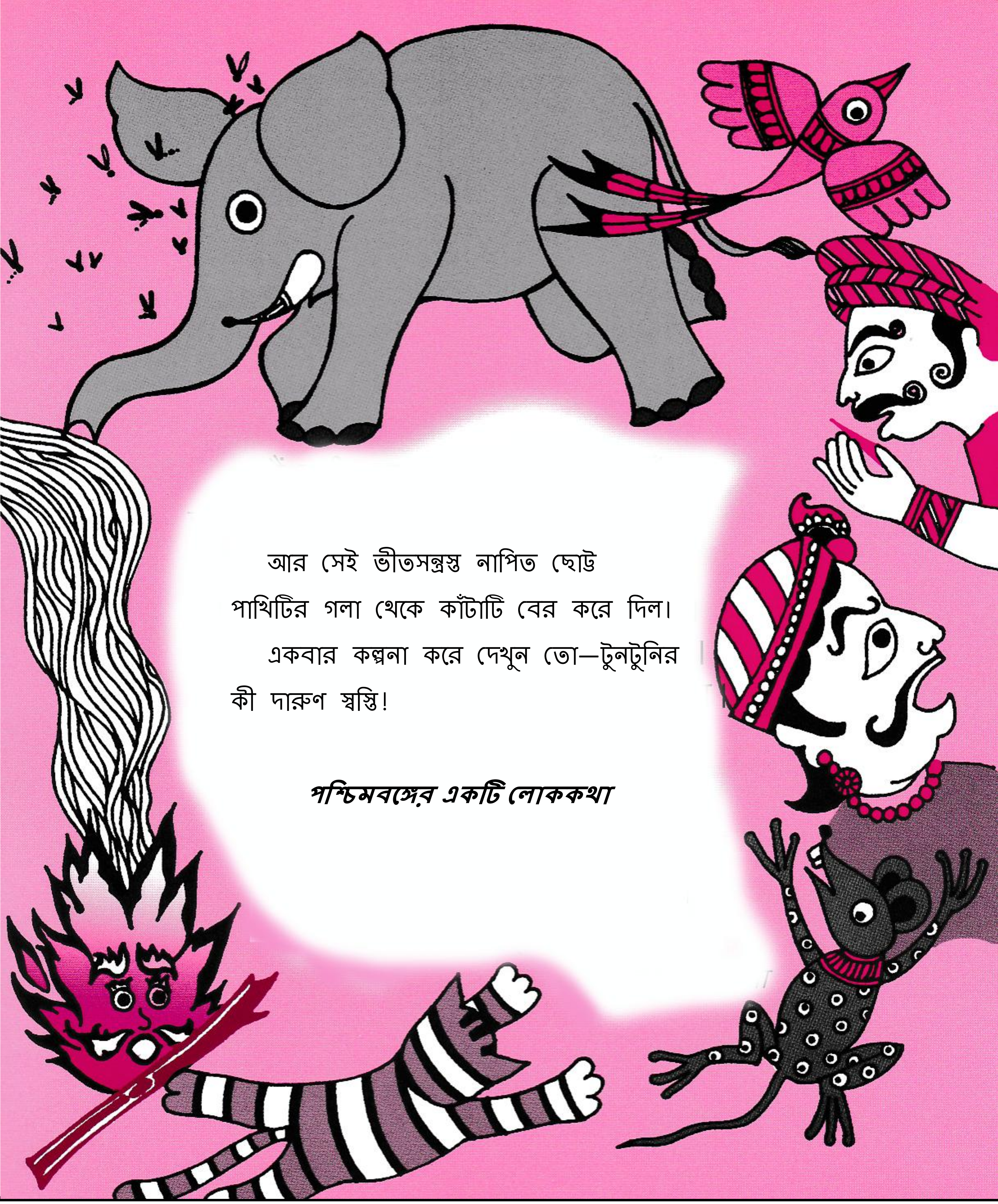
আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। "আমি লাঠিকে পুড়িয়ে দেব।"

লাঠি ভয়ে পিছিয়ে গেল। "আমি বিড়ালকে পেটাচ্ছি।"

বিড়াল জেগে উঠল। "আমি ইঁদুরকে ধরব!"

ইঁদুর কিচকিচ করে বলল, "আমি রাজাকে কামড়াব!"

রাজা বললেন, "আমি নাপিতকে শাস্তি দেব!"



আর সেই ভীতসন্ত্রস্ত নাপিত ছোট্ট পাখিটির গলা থেকে কাঁটাটি বের করে দিল।

একবার কল্পনা করে দেখুন তো—টুনটুনির কী দারুণ স্বস্তি!

পশ্চিমবঙ্গের একটি লোককথা

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

আমার নতুন বন্ধু

20



বহুকাল আগের কথা। এক গভীর জঙ্গলে একটি কাঠবিড়ালি আর একটি খরগোশ বাস করত। তারা ছিল খুব ভালো বন্ধু এবং একে অপরের সাথে প্রচুর সময় কাটাত।



কাঠবিড়ালিটি ছিল ভীষণ কৌতূহলী; সে পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই জানতে চাইত। কিন্তু তার বন্ধু খরগোশটি কোনো প্রশ্নেরই সহজ-সরল উত্তর দিত না। তবে ভাগ্যবশত, তারা দুজনেই ধাঁধা আর রহস্যময় প্রশ্ন ভীষণ পছন্দ করত!

একদিন সকালে কাঠবিড়ালিটি দেখল, খরগোশটি একা একা হেঁটে যাচ্ছে। সে দৌড়ে গিয়ে খরগোশটির নাগাল ধরল।

কাঠবিড়ালি: ও খরগোশ বন্ধু, এত সকালে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

খরগোশ: আমি আমার নতুন বন্ধুর সাথে খেলতে যাচ্ছি!





কাঠবিড়ালি: তাই নাকি! কে তোমার সেই নতুন বন্ধু?

খরগোশ: তুমি নিজেই কেন অনুমান করে নিচ্ছ না? তোমার জন্য একটা সূত্র দিচ্ছি: সে এমন কেউ, যার চারটি পা আছে।

কাঠবিড়ালি: এ কেমন সূত্র হলো? আমাদের সবারই তো চারটি করে পা আছে! ওহ, আমি বুঝতে পেরেছি: তুমি চাইছ আমি যেন নিজেই তাকে খুঁজে বের করি। হুমম, দেখি তো...

খরগোশ: কী হলো? কী ভাবছ?

কাঠবিড়ালি: উম... সে কি কোনো বড় আকারের প্রাণী?

খরগোশ: হ্যাঁ!

কাঠবিড়ালি: তাহলে তো আমি পেয়ে গেছি! তোমার বন্ধু হলো একটি হাতি! হাতিই তো জঙ্গলের সবচেয়ে বড় প্রাণী!

খরগোশ: ভুল! আমার নতুন বন্ধুর তো লম্বা কোনো শুঁড় নেই।

কাঠবিড়ালি: তাহলে নিশ্চয়ই সে একটি গণ্ডার!

গণ্ডারের তো কোনো শুঁড় থাকে না!

খরগোশ: না, না! আমার নতুন বন্ধুর তো কোনো শিং-ও নেই।

খরগোশটি দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল। কাঠবিড়ালিটি তার পিছু পিছু দৌড়াল।

কাঠবিড়ালি: দাঁড়াও! আমি জানি! তোমার নতুন বন্ধু হলো একটি উট! উটের চারটি পা আছে। তার কোনো শুঁড় নেই। আর তার কোনো শিং-ও নেই।





খরগোশ: কিন্তু আমার নতুন বন্ধুর তো পিঠে কোনো কুঁজ-ও নেই।

খরগোশটি তখন পথ ধরে দৌড়াতে শুরু করল।

কাঠবিড়ালি: তাহলে আর কে হতে পারে? আহা! নিশ্চয়ই সে একটি জেব্রা!

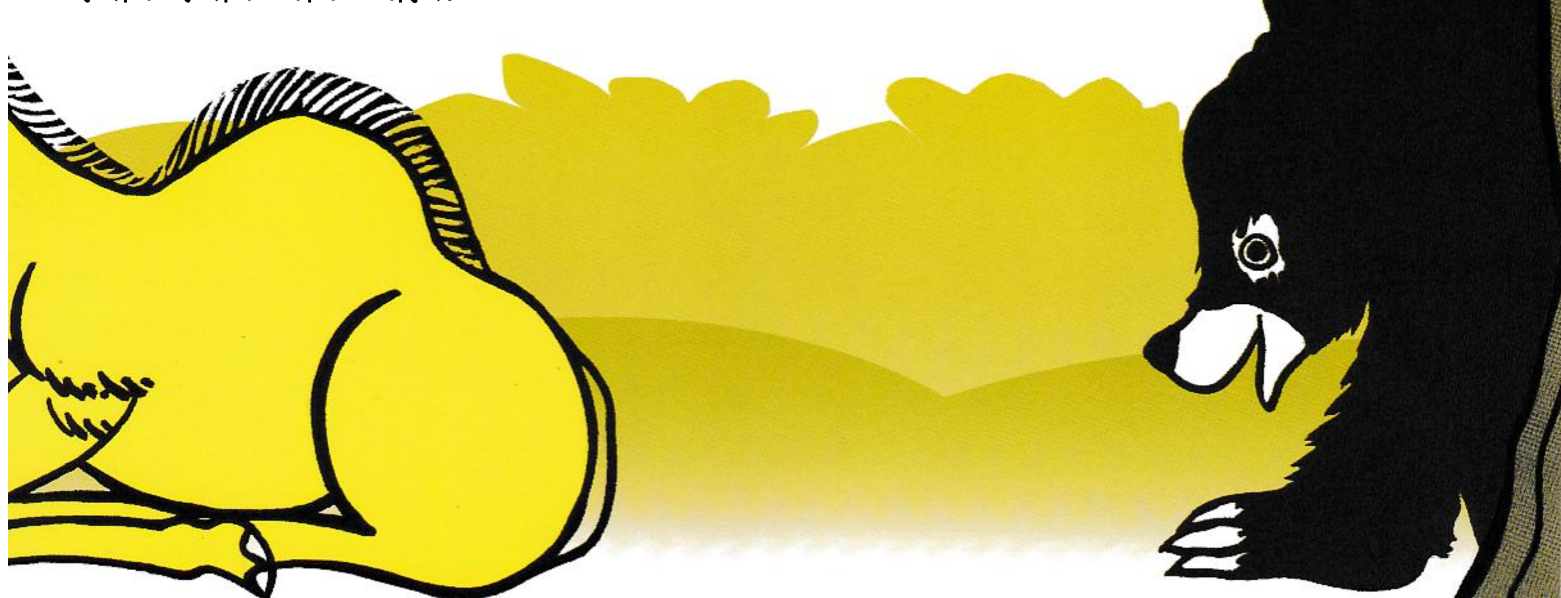
খরগোশ: হো হো হো! আমার বন্ধুর শরীরে তো কোনো ডোরাকাটা দাগ নেই!

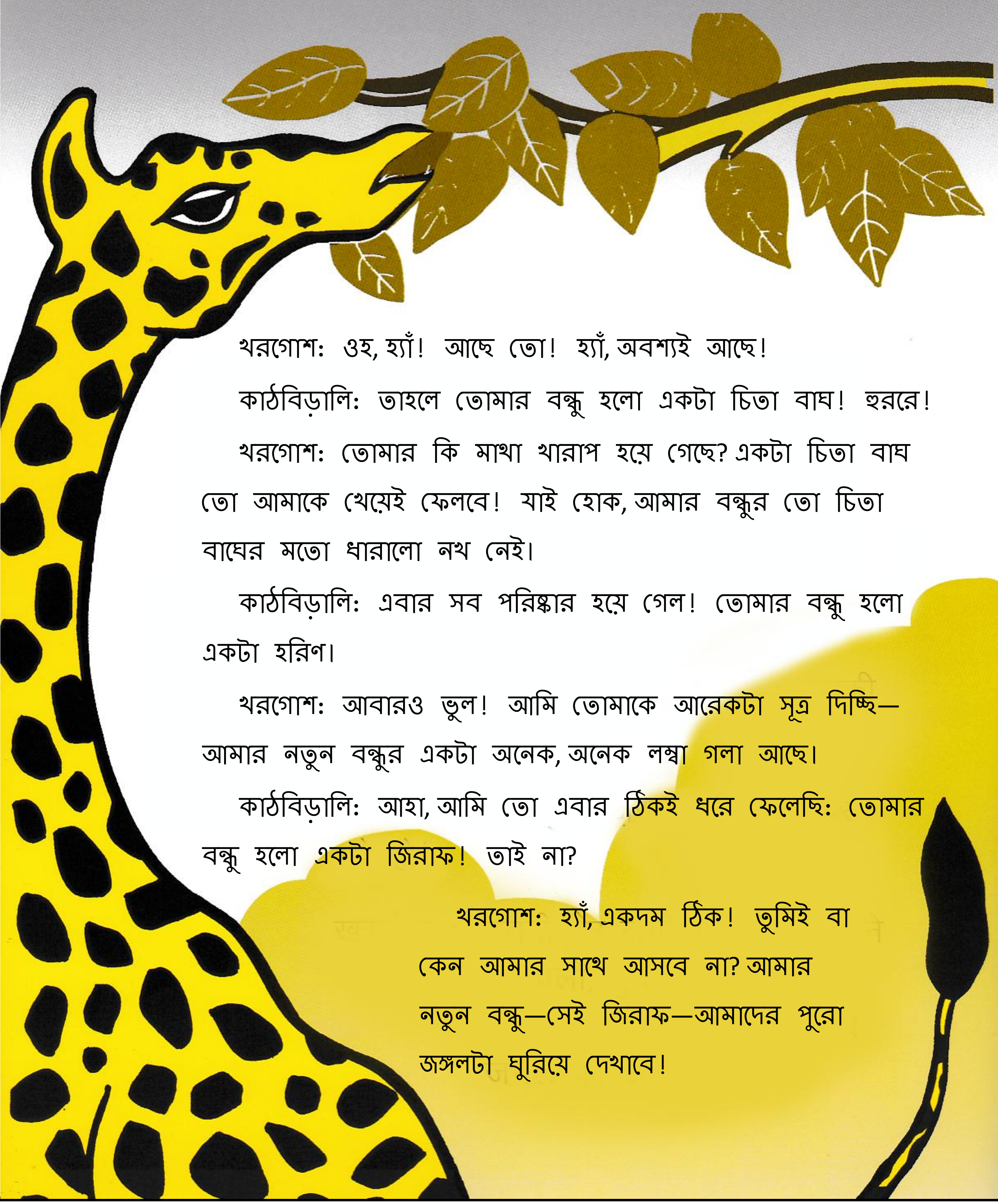
এবার আমাকে যেতে দাও, আমি দেরি করতে চাই না।

কাঠবিড়ালি: না, থামো! আমার মনে হয় তোমার বন্ধুটি হলো একটি ভালুক!

খরগোশ: ওহ, মাফ কোরো! আমার বন্ধুর তো ভাল্লুকের মতো ঘন লোম নেই!

কাঠবিড়ালি: তাই নাকি? আচ্ছা, তাহলে তোমার বন্ধুর কি গায়ে কোনো ছোপ ছোপ দাগ আছে?





খরগোশ: ওহ, হ্যাঁ! আছে তো! হ্যাঁ, অবশ্যই আছে!

কাঠবিড়ালি: তাহলে তোমার বন্ধু হলো একটা চিতা বাঘ! হুররে!

খরগোশ: তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? একটা চিতা বাঘ তো আমাকে খেয়েই ফেলবে! যাই হোক, আমার বন্ধুর তো চিতা বাঘের মতো ধারালো নখ নেই।

কাঠবিড়ালি: এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল! তোমার বন্ধু হলো একটা হরিণ।

খরগোশ: আবারও ভুল! আমি তোমাকে আরেকটা সূত্র দিচ্ছি—আমার নতুন বন্ধুর একটা অনেক, অনেক লম্বা গলা আছে।

কাঠবিড়ালি: আহা, আমি তো এবার ঠিকই ধরে ফেলেছি: তোমার বন্ধু হলো একটা জিরাফ! তাই না?

খরগোশ: হ্যাঁ, একদম ঠিক! তুমিই বা কেন আমার সাথে আসবে না? আমার নতুন বন্ধু—সেই জিরাফ—আমাদের পুরো জঙ্গলটা ঘুরিয়ে দেখাবে!

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

স্বপ্ন

আকাশটা ছিল ঘন কালো। আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পরছিল। মীরা জানলায় বসে একদৃষ্টে বাইরে দেখছিল। বৃষ্টি যে তার খুব প্রিয়!

মেঘ কাটতেই সে এক দৌড়ে বাইরে গেল, তার বোন রানিকে নিয়ে। ছাদ থেকে যে জলের ফোটাগুলো পড়ছিল, তারা দুজনে তাদের দুইহাত জড়ো করে ধরার চেষ্টা করল। এদিক ওদিক জমে থাকা জলের মধ্যেও খুব লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলল তারা। তারপর, কাগজের নৌকা বানিয়ে ওরা ঐ জমে থাকা জলে ভাসাল। কি মজাটাই যে করল ওরা!

আর ঠিক তখনি, হঠাত, যেন এক ম্যাজিকের মত আকাশে রামধনুর উদয় হল। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী! কিযে অদ্ভুত সুন্দর রঙ! মীরার যেন চোখ সরছিল না।



তারপর, এক দিব্যদৃষ্টির মতো সে দেখল আকাশে একটি সেতু ভেসে উঠেছে! ওমা, এটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? দেখা যাচ্ছে না তো! সে সেতুটির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। চলতে চলতে সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত চরাচর।

"মীরা! মা আমাদের ডাকছেন।" রানীর কন্ঠস্বর ক্ষীণভাবে ভেসে এলো, আর তার সাথে সাথে, মীরাও বাস্তবে ফিরে আসল। সেইসব দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন স্কুল ছিল। মেয়েরা যথারীতি হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা দেখল আকাশে, অনেক উঁচু দিয়ে একটি সাদা সারস উড়ে যাচ্ছে।

মীরা চোখ বন্ধ করল। মনে হল যেন, সে নিজেও উড়ছে! তার নীচে একে একে পেরিয়ে যাছহে বন, পর্বত, শহর এবং নগর। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই আবার রানীর কন্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। তার হুঁশ ফিরে এল।





সব দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার ছিল মীরার নিজের গ্রামের মূর্তি ও মন্দিরগুলো। সে মনে মনে ভাবত যে সে পাথর খোদাই কোরে অদ্‌ভুত সব সুন্দর মূর্তি বানাচ্ছে।

আহা, তার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সে একদিন একজন মূর্তিকার হবে!

"চল, আমরা একসাথে সুন্দর সুন্দর মন্দির আর ঘর বানাই!" যখনই তারা কোনো মন্দিরের পাশ দিয়ে যেত, মীরা রানীকে এই কথা বলে উৎসাহিত করত।

তাদের বাড়ির কাছেই একটি পুকুর ছিল, যেখানে অনেক মাছ সাঁতার কাটত।

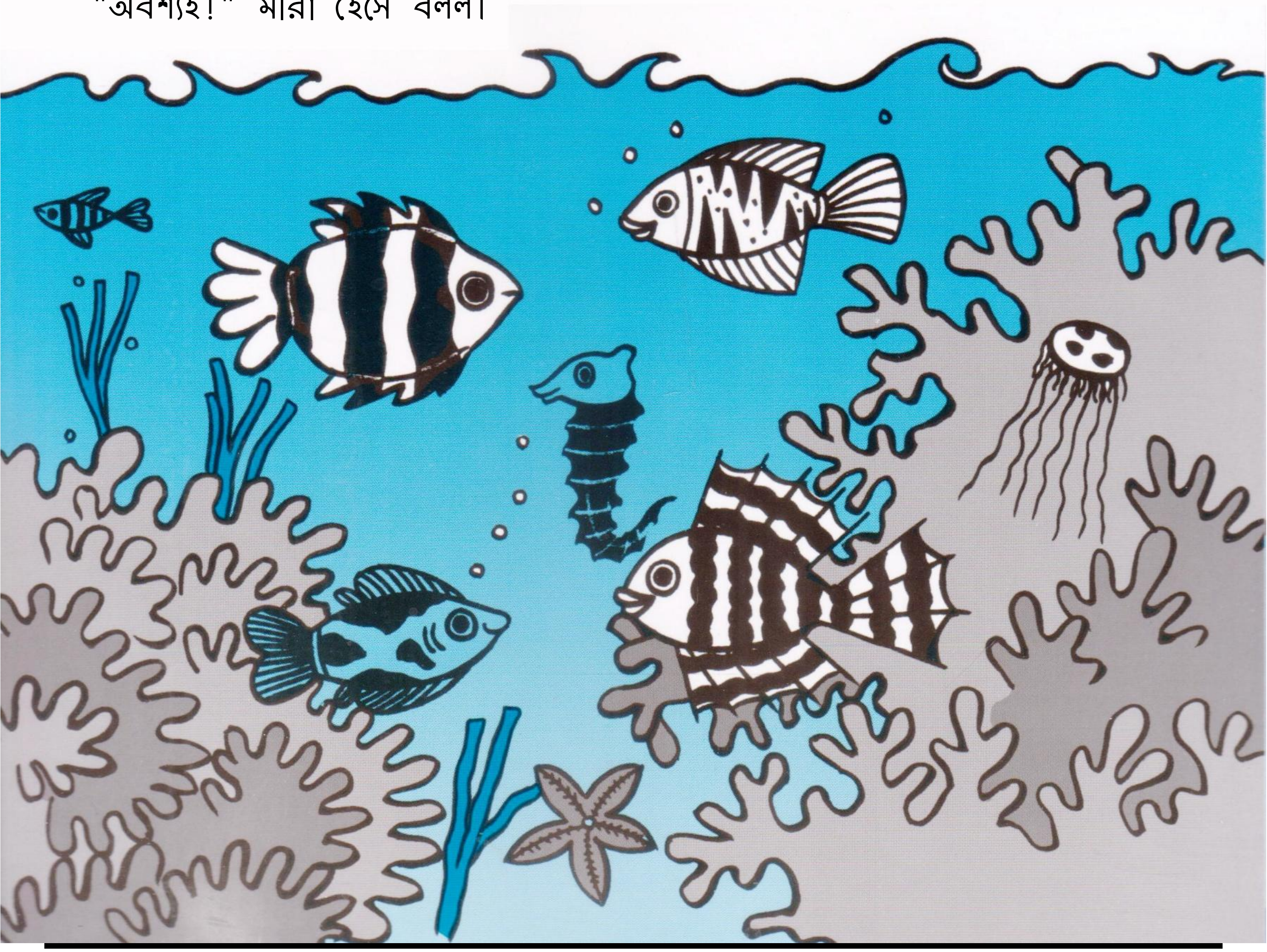


মীরা জলের তলায় তাদের জীবন আর চলাফেরা দেখতে ভালোবাসত। এর সাথে তার কল্পনাও অবাধে ছুটে চলত। যেমন, এখন সে এক বিশাল সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল। সে একবার তার গভীরতম প্রান্তে ডুব দিচ্ছিল আবার ঢেউয়ের সাথে লাফিয়ে উঠছিল।

"তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছ?" রানী জানতে চাইল। "আমাকে সব বলো!" মীরা তার স্বপ্নে দেখা সবকিছু বর্ণনা করল।

মীরার স্বপ্নের বর্ননা শুনে রানীর মন ভরে গেল। সেও ঐ স্বপ্নের জগতের মাধুর্য আস্বাদন করছিল। "পরের বার তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই!" মীরা হেসে বলল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

দেখো ওরা কেমন দৌড়ে চলেছে

সে অনেককাল আগের কথা, তখনোও পৃথিবীর এত বয়স হয় নি। তখন এক জায়গায়, একটা কুকুর, একটা বিড়াল আর একটা ইঁদুর বন্ধুর মত একসাথে থাকত। তারা সবকিছু সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। কাজেকর্মে ও খেলাধুলায় তারা একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করত। সে ছিল এক শান্তিপূর্ণ জীবন।

শুধুমাত্র একটি জিনিস তাদের বড় বিরক্ত করত, আর তা হলো তাদের প্রতিবেশীদের কোলাহল। তিন বন্ধু তাদের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে পুরো জেরবার হয়ে গেছিল।

একদিন কুকুরটি বলল, "দেখো ওরা কেমন ঝগড়া করছে!“

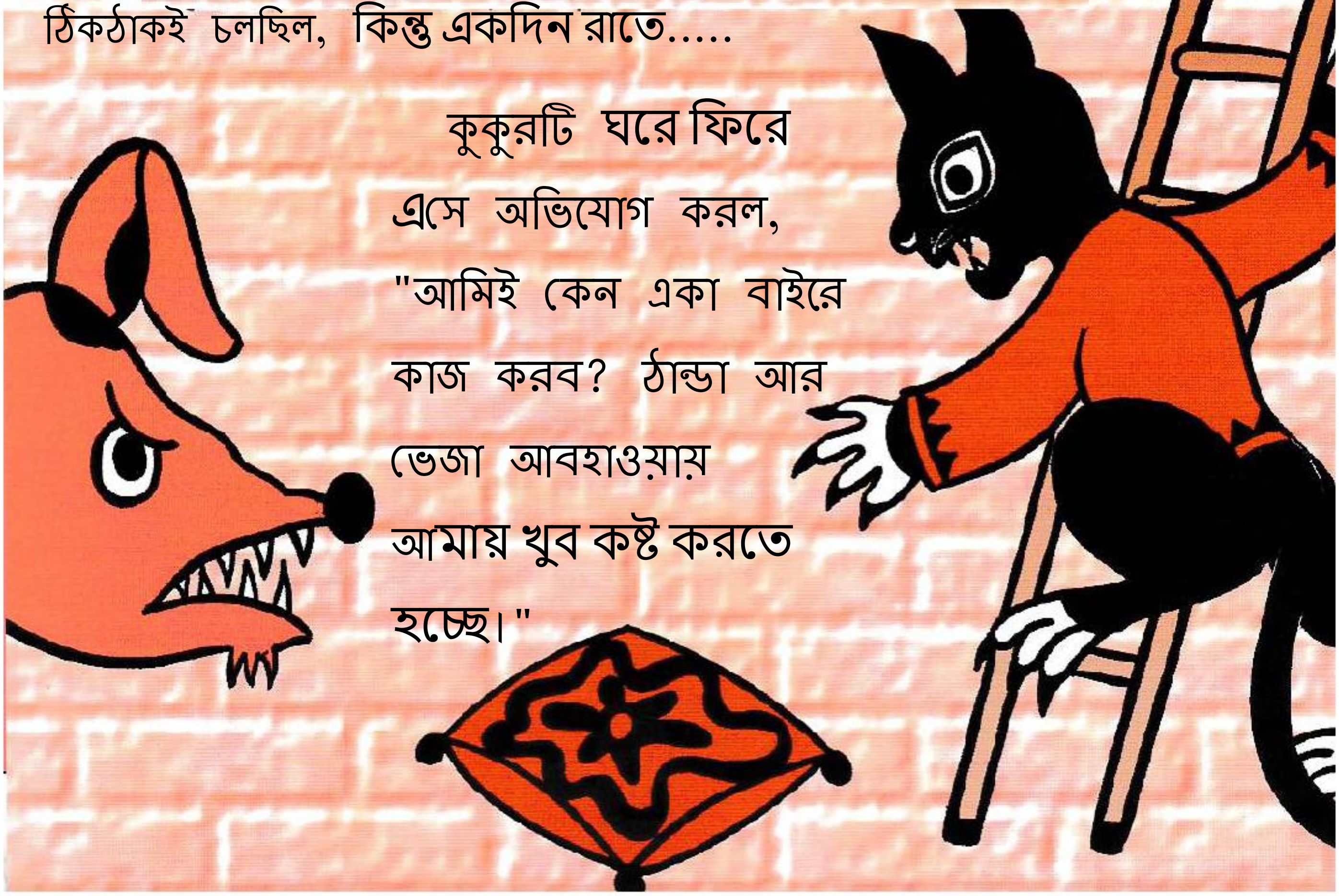


বিড়ালটি বলল, "ওরা কেন আমাদের মতো শান্তিতে থাকতে পারে না?“

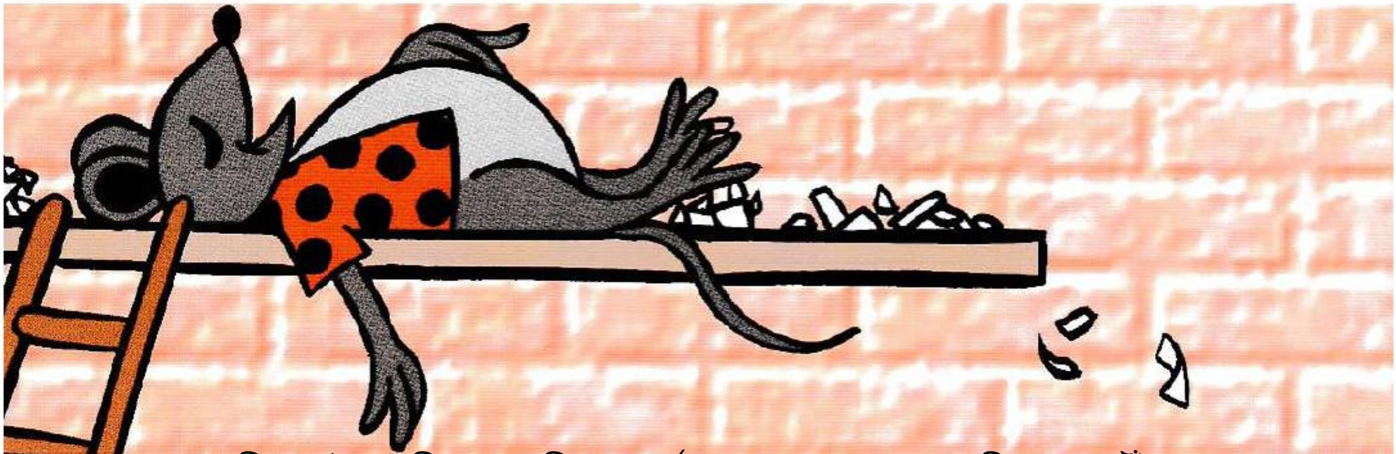
এই শুনে ইঁদুরটি বলল, "চলো আমরা মিলে আজ প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা আর কখনো ঝগড়া করব না এবং আমরা চিরকাল বন্ধু থাকব।“

কুকুর এবং বিড়ালটির এই প্রস্তাবটি খুব পছন্দ হয়। তাই, তখন, ইঁদুরটি একটি চুক্তিপত্র লিখে আনে এবং তারা সবাই তাতে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে। তারপর বিড়ালটি চুক্তিপত্রটি নিরাপদে রাখার জন্য একটি উঁচু তাকে রেখে দেয়।

এই চুক্তি অনুসারে, কুকুরটিকে বাড়ির বাইরে কাজ করতে হবে এবং বিড়াল ও ইঁদুরটি বাড়ির ভেতরে কাজ করবে। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু একদিন রাতে.....



কুকুরটি ঘরে ফিরে এসে অভিযোগ করল, "আমিই কেন একা বাইরে কাজ করব? ঠান্ডা আর ভেজা আবহাওয়ায় আমায় খুব কষ্ট করতে হচ্ছে।"



সে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে বলল, "তুমি আর ইঁদুর সবসময় ঘরের গরম আর শুকনো আবহাওয়ায় থাকো। এটা ঠিক নয়!“

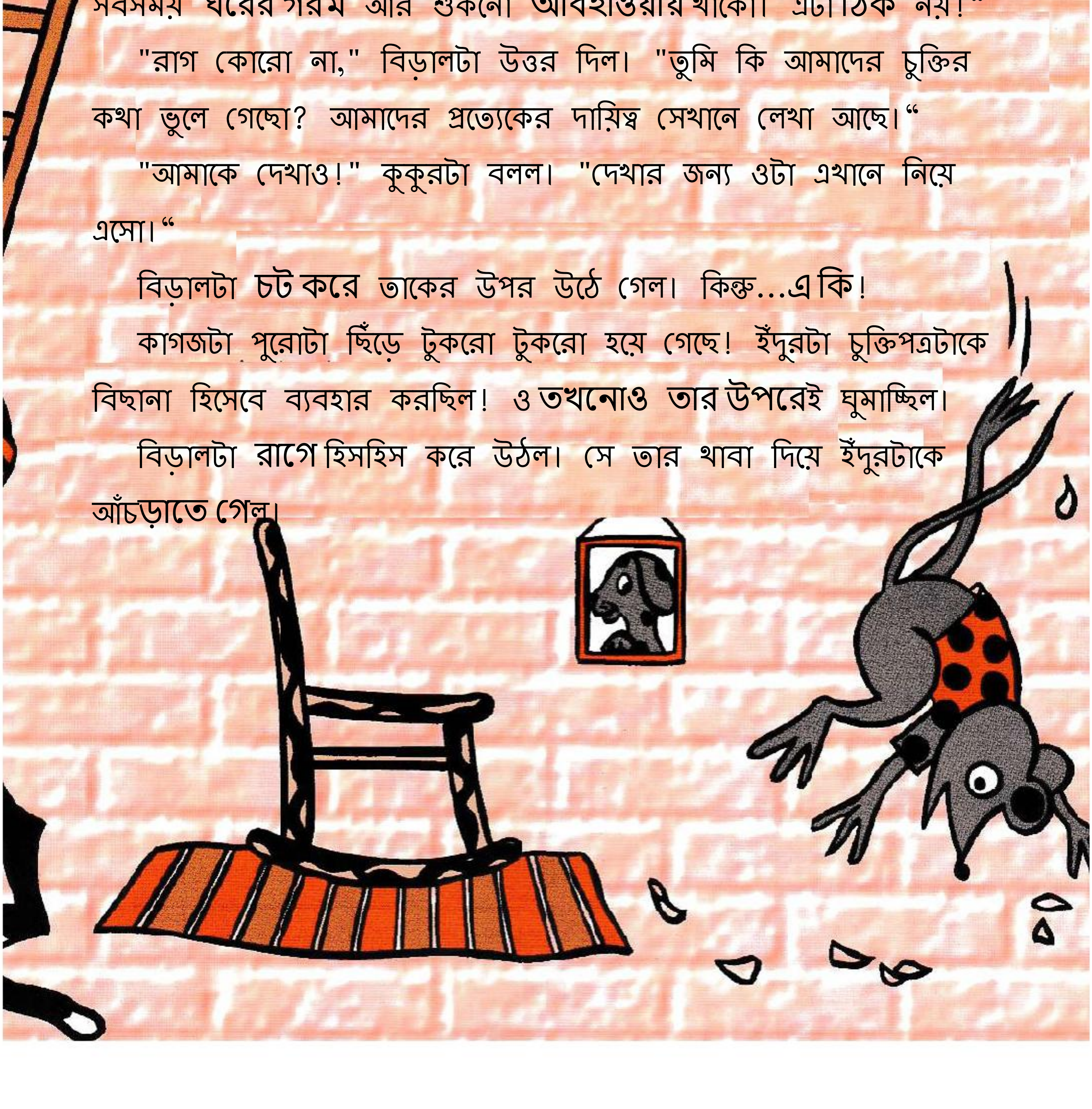
"রাগ কোরো না," বিড়ালটা উত্তর দিল। "তুমি কি আমাদের চুক্তির কথা ভুলে গেছো? আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সেখানে লেখা আছে।“

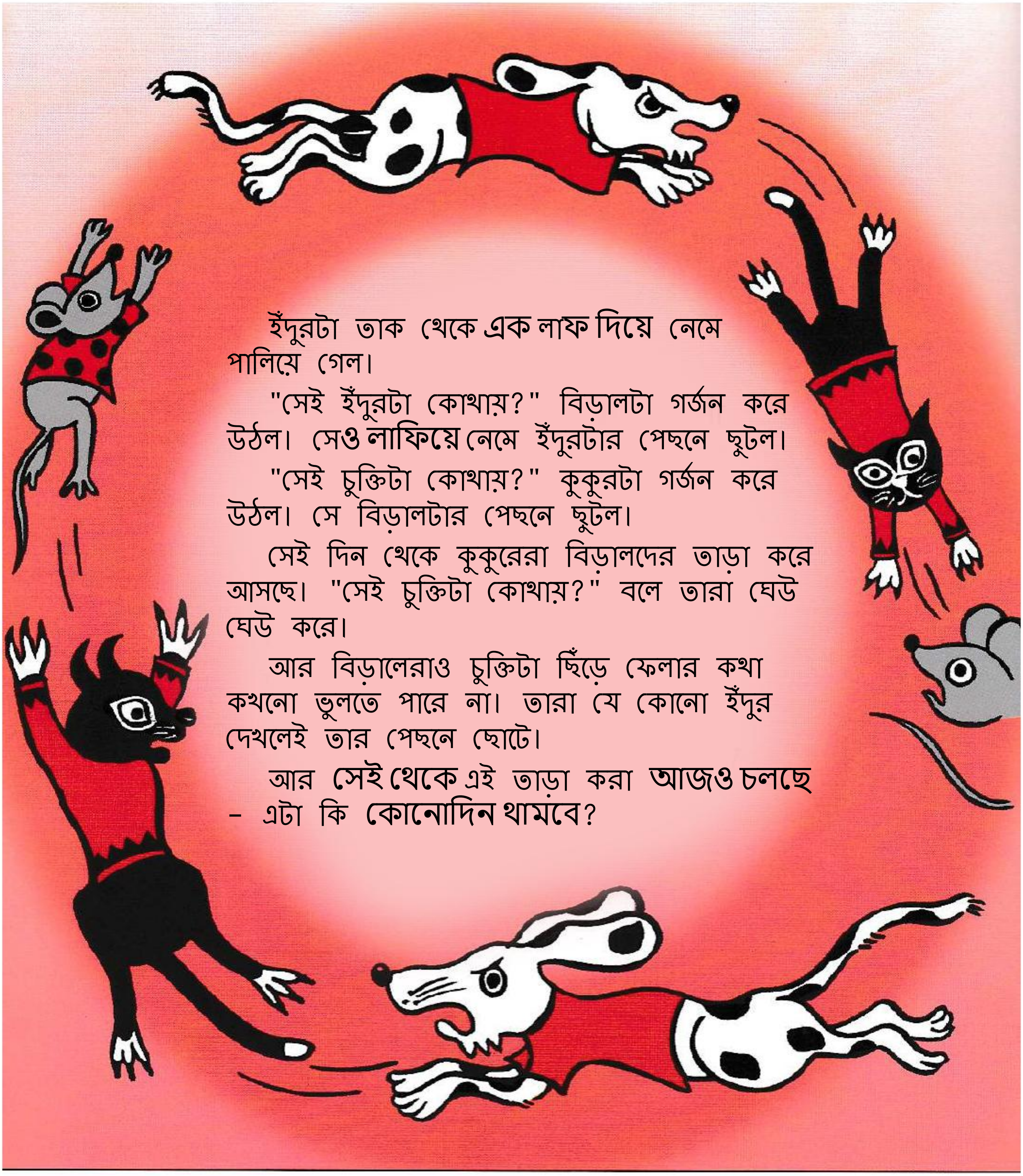
"আমাকে দেখাও!" কুকুরটা বলল। "দেখার জন্য ওটা এখানে নিয়ে এসো।“

বিড়ালটা চট করে তাকের উপর উঠে গেল। কিন্তু...এ কি!

কাগজটা পুরোটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে! ইঁদুরটা চুক্তিপত্রটাকে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করছিল! ও তখনোও তার উপরেই ঘুমাচ্ছিল।

বিড়ালটা রাগে হিসহিস করে উঠল। সে তার থাবা দিয়ে ইঁদুরটাকে আঁচড়াতে গেল।





ইঁদুরটা তাক থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে গেল।

"সেই ইঁদুরটা কোথায়?" বিড়ালটা গর্জন করে উঠল। সেও লাফিয়ে নেমে ইঁদুরটার পেছনে ছুটল।

"সেই চুক্তিটা কোথায়?" কুকুরটা গর্জন করে উঠল। সে বিড়ালটার পেছনে ছুটল।

সেই দিন থেকে কুকুরেরা বিড়ালদের তাড়া করে আসছে। "সেই চুক্তিটা কোথায়?" বলে তারা ঘেউ ঘেউ করে।

আর বিড়ালেরাও চুক্তিটা ছিঁড়ে ফেলার কথা কখনো ভুলতে পারে না। তারা যে কোনো ইঁদুর দেখলেই তার পেছনে ছোটে।

আর সেই থেকে এই তাড়া করা আজও চলছে - এটা কি কোনোদিন থামবে?

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

বানরদের উপবাসের দিন



এক শান্ত সকালে একদল বানর একটি বড় বটগাছের ছায়ায় বসেছিল। তাদের সবাইকে এভাবে চুপচাপ একসাথে বসে থাকতে দেখে সবারই খুব অবাক লাগছিল...আরে, তাই তো!

আজ তো বানরদের উপবাসের দিন!

বানরদের সর্দার উপবাস শুরুর ঘোষণা করে দিল। তারপর সে বলল, "এখনই সন্ধ্যার খাবারের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে রাখো।"

সেই শুনে সবচেয়ে শক্তিশালী বানরগুলো মিষ্টি কলার কাঁদি পাড়ার জন্য ছুটে গেল।

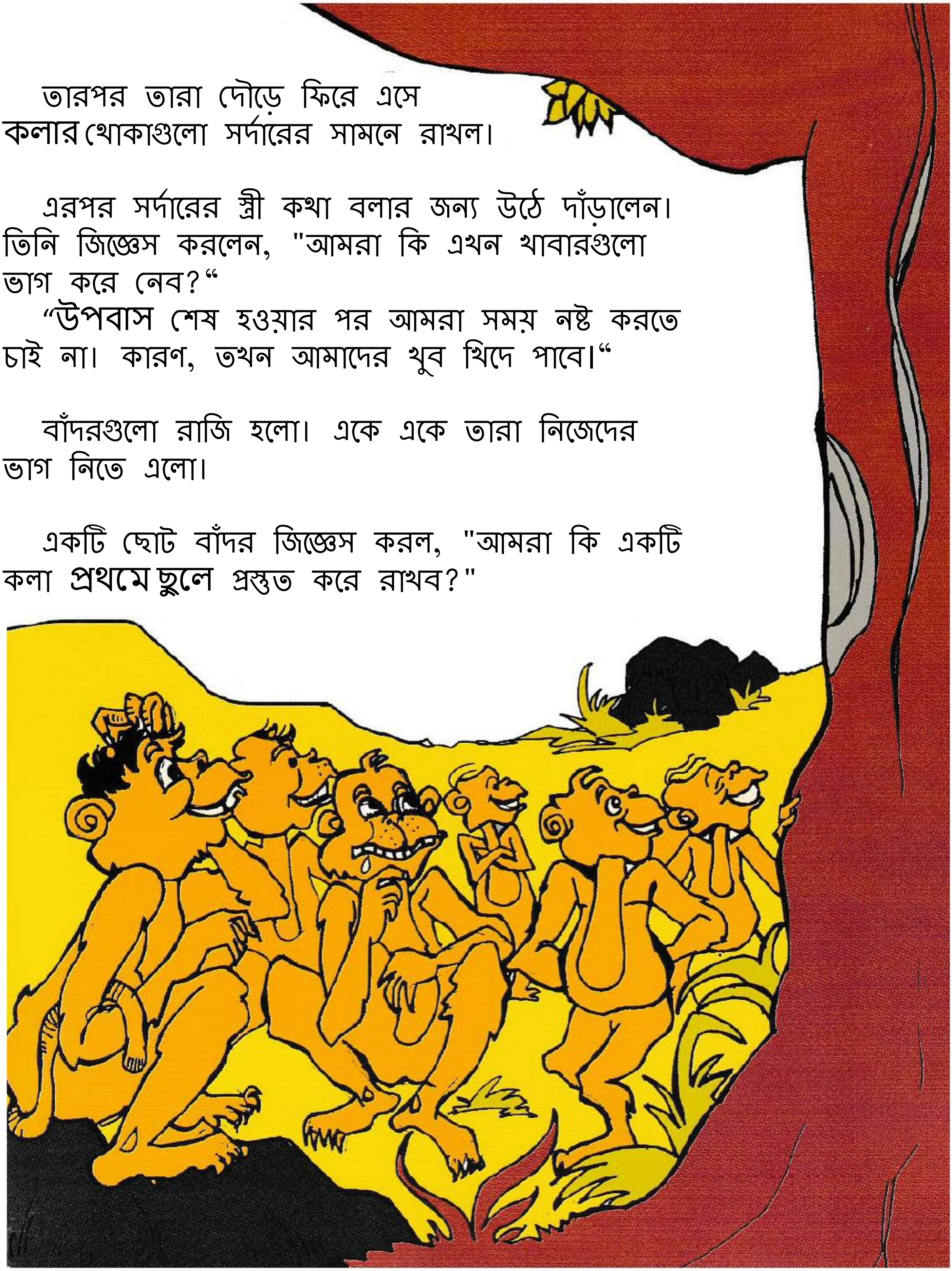
তারপর তারা দৌড়ে ফিরে এসে **কলার** থোকাগুলো সর্দারের সামনে রাখল।

এরপর সর্দারের স্ত্রী কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি এখন খাবারগুলো ভাগ করে নেব?"

"**উপবাস** শেষ হওয়ার পর আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। কারণ, তখন আমাদের খুব খিদে পাবে।"

বাঁদরগুলো রাজি হলো। একে একে তারা নিজেদের ভাগ নিতে এলো।

একটি ছোট বাঁদর জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি একটি কলা **প্রথমে ছুলে** প্রস্তুত করে রাখব?"



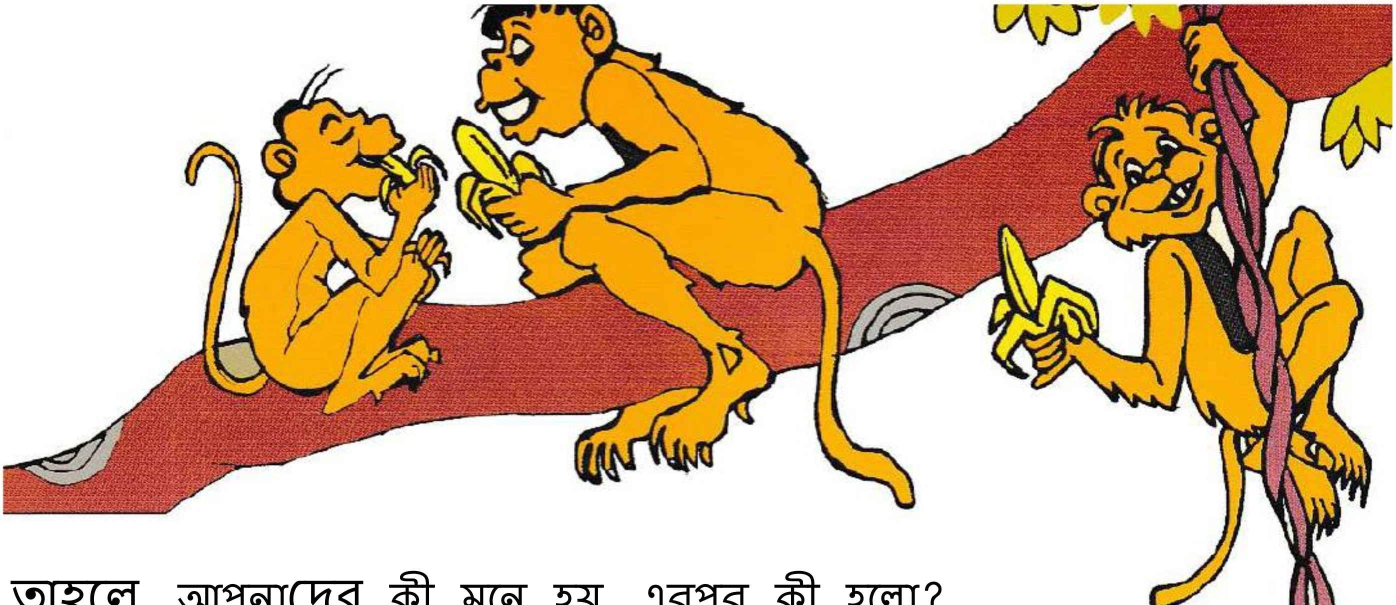


কী চমৎকার বুদ্ধি! সব বানরদের হাতে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত করার জন্য একটি করে কলা ছিল।

তখন একটি ছোট্ট বাচ্চা তার বাবাকে ফিসফিস করে বলল, "আমি কি শুধু একটা কলা মুখে রাখতে পারি? আমি কথা দিচ্ছি, তুমি না বলা পর্যন্ত আমি এটাতে কামড় দেব না।“

বাবা বানরটি এই শুনে লাফিয়ে উঠল। "আমরা সবাই কেন আমাদের ছিলে ফেলা কলাগুলো মুখে রাখছি না?" সে প্রস্তাব দিল। “উপবাস শেষ হলেই তাহলে আমরা এগুলো গিলে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকব!“

তাড়াতাড়ি সব বানর ছুলে ফেলা কলাগুলো মুখে পুরে ফেলল। কিন্তু শীঘ্রই তারা অস্বস্তিতে ছটফট করতে শুরু করল। তারা সবাই আড়চোখে একে অপরের দিকে তাকাল।

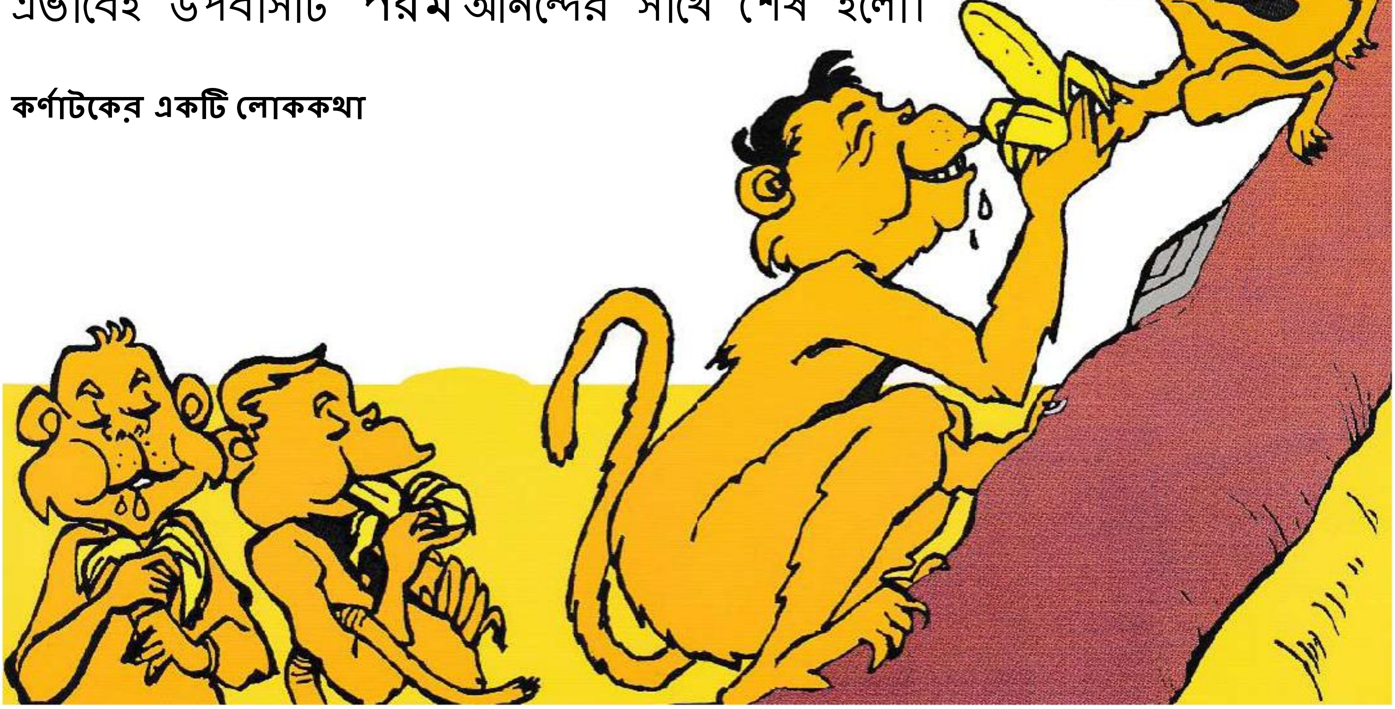


তাহলে, আপনাদের কী মনে হয়, এরপর কী হলো?

চোখের পলকে সব কলা বানরগুলোর গলা দিয়ে নিচে তাদের পেটে নেমে গেল!

এভাবেই উপবাসটি পরম আনন্দের সাথে শেষ হলো।

কর্ণাটকের একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy



বলতো, আমরা কারা?

দাঁড়িয়ে খায় সে
দাঁড়িয়ে পান করে সে
দাঁড়িয়ে ঘুমায় সে
এবং দৌড়ায় সে জেতার জন্য

বাচ্চাকে তার বুকে আঁকড়ে ধরে গাছে লাফ দেয় সে
ডালে ঝুলে তাকিয়ে মুখ ভেংচায় সে আমাদের দেখে!



জলে সুখী সে
স্থলে কষ্ট পায়।
ভরসার পাত্র সে
বন্ধুর মত বন্ধু ও যে হয়।
বাড়িও পাহারা দেয় সে
তোমার জন্য সবকিছু উজাড় করে দিত প্রস্তুত যে।

খুব নিঃশব্দে হাঁটি আমি – কিন্তু আমি চোর নই!
ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ধরেও ফেলি আমি – কিন্তু আমি পুলিশ নই!
অনেক ঘুমাই আমি – কিন্তু আমি শিশু নই
সারাদিন বাড়িতে থাকি আমি – কিন্তু আমি কোনো বৃদ্ধা নই।

মাটিতে সে তো চলে সাবধানে
আকাশে, স্বাধীন সে
তার লম্বা, লোমশ লেজ
তাই দিয়ে কেমন চলে গাছে গাছে - অনায়াসে।

জিনিস ও মানুষ করে সে পারাপার
অন্তহীন ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভেসে
এক তীর থেকে অন্য তীরে যায়
মোটর বা পাল লাগে না তায়।

চারটি মুষল পড়ছে ধপাস ধপ
দুটি কুলো যেন ঝাড়া হচ্ছে সমান তালে
লম্বা নলটি দুলছে এদিক ওদিক
ছোট দড়িটি ঝুলছে মাঝখানেতে ঠিক
স্থির এবং শান্তভাবে এটি
সবার আগে চলছে গুটি গুটি।

বিশাল দ্রুত আর তেমন শক্তিশালী
সারা শরীরে তার লম্বা, কালো লোম
বিশাল বনে সে দাপিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়
শুধু শীতকাল ছাড়া, কারণ তখন সে ঘুমায়।

তোমার জন্য আমি করব কঠোর পরিশ্রম
তোমার জন্য আমি বইব বোঝা
কিন্তু যদি তুমি তোলো লাঠি
সেদিন যেনো আমিও মারব লাথি!

আমার আছে পা দশটি
কিন্তু আমি আটটি পায়ে হাঁটি
আমি চলি পাশ কেটে কেটে
কারণ আমি সোজা পারি না হাঁটতে।

চারটি শক্তিশালী পা আর আছে তার বিভক্ত খুর
তাই দিয়ে সে খাড়া পাহাড় আর বিশাল সব গাছে চড়ে
কোমল ঘাস ও পাতার খোঁজেই তো সে ফেরে

আমি ধীর কিন্তু স্থির
আত্মরক্ষার জন্য আমার আছে একটি শক্ত খোলস
যদি আমি বিপদে পড়ি কখনো
মাথাটা তখুনি আমি লুকাই আমার খোলসে

দেওয়ালে এবং ছাদে হাঁটে সে
পোকামাকড় ধরায় ভারি তুখোড়
নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে লেজ খসিয়ে সে-
কেমন করে আবার সেটা গজিয়ে তোলে দ্রুত

জন্মের সময় আমার ছিল একটি লেজ
যখন আমার পা গজালো, আমার লেজটা গেল চলে
বাস করি আমি স্থলে, কিন্তু আমি ভালোবাসি জল
কারণ ঐটিই যে আমার ঠিকানা আসল।

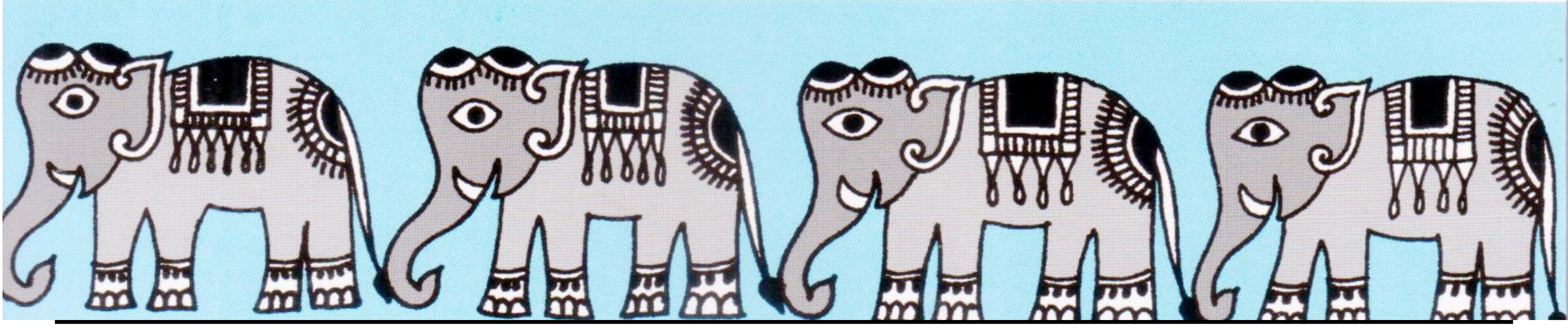
লম্বা লম্বা পা দিয়ে মাটিতে শক্তপোক্ত দাঁড়িয়ে
উঁচু গলা মাটির অনেক উপরে নিয়ে বাড়িয়ে
চাখে সে নতুন কচি পাতা
যদি দেখে খুঁজে পেলে।

এই হলুদ দাড়িওয়ালাকে
ভয় তো পায় সবাই
গর্জে সে উঠলেই
কাঁপতে কাঁপতে সবাই পালায়।



অন্ধকারে আমরা সাহস করে উড়ি
উল্টো ঝুলে ঘুমাই ভোর অবধি
আমরা আমাদের ছানাদের খাওয়াই দুধ
তবে আমরা খেতে ভালোবাসি ফল খুবই।

সিংহ, হাতি, কুকুর, কাঠবিড়ালী, গাধা, ঘোড়া, ছাগল,
বাঁদর, জিরাফ, উট, বিড়াল, কাঁকড়া, ব্যাঙ, টিকটিকি,
মাছ, বাদুর, ভাল্লুক, কচ্ছপ



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

অদ্ভুত গাধা

নাসিরুদ্দিনের একটি গাধা ছিল। গাধাটি ছিল খুব বদমেজাজি এবং কাজ করতে একদম পছন্দ করত না। আর সব সময়ই তার খুব খিদে পেত! স্বাভাবিকভাবেই নাসিরুদ্দিন গাধাটিকে একদম পছন্দ করতেন না।

“আহা, যদি গাধাটাকে বিক্রি করতে পারতাম!”—তিনি মনে মনে ভাবলেন।

একদিন তিনি গাধাটিকে বাজারে নিয়ে গেলেন। বাড়ি ফিরে তিনি খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন।



“আজ জানো আমি কী করলাম?” তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

“আজ আমি আমাদের গাধাটাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলাম আর নিলামকারীর হাতে তুলে দিলাম বিক্রি করার জন্য।”

“আমাদের সেই একেবারেই নিষ্কর্মা গাধাটা?” স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, ঠিক তাই,” বললেন নাসিরুদ্দিন।

“আর জানো সেটা বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয়েছে! পুরো গল্পটা আমি তোমাকে খুলে বলি তাহলে,” বললেন নাসিরুদ্দিন।

“বাজারটা ছিল লোকজনে ভরা। অনেক মানুষ কিনতে এসেছিল। নিলামকারী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জোরে ডাক দিল। তারপর তার সহকারী গাধাটিকে সবাইকে দেখাতে লাগল। “ভদ্রলোকেরা!” নিলামকারী বলল। “এই আশ্চর্য প্রাণীটিকে দেখুন...!’”



“'সেকি? আশ্চর্য প্রাণী মানে'! সবাই কি দেখতে পায়নি যে এটা রাগী?" নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"মোটেও না! নিলামকারী একজন চালাক লোক! সে আগেই এটাকে গাজর খাইয়েছিল। যাই হোক, সে আমাদের গাধাটির একদম আকাশ ছোঁয়া প্রশংসা করতে শুরু করল। 'লম্বা কান আর শক্ত পা দেখো!' সে বলল।'এই শক্ত দাঁতগুলো দেখো!' সে বলল। তারপর সে আরোও বলল, 'এই গাধাটা শক্তিশালী এবং সবল। এ তার নতুন মালিকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে'। আর সেই মুহূর্তে, গাধাটা আমার কাছেও বেশ ভালো লাগতে শুরু করেছিল! “

“বড় আশ্চর্যের ব্যাপার," নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী বললেন।



"যখন নিলাম শুরু হয়," নাসিরউদ্দিন আরও বলেন, "লোকেরা খুব অল্প পরিমাণে টাকা দিয়েছিল। প্রথম দর ছিল মাত্র তিনটি সোনার মুদ্রার। কিন্তু নিলামকারী আরও দর ডাকল, এবং শীঘ্রই কেউ দশটি সোনার মুদ্রা দিল! তারপর **আরেকজন** পনেরোটি সোনার মুদ্রা দিল। এবং তারপর দাম বাড়তেই থাকল....."

নাসিরউদ্দিনের গল্প থামলো একটি গাধার ডাকে।

হি-হ! হি-হ! শব্দটা খুব কাছেই ছিল!

তার স্ত্রী হতবাক হয়ে গেলেন। **"তারপর,** কী হল?" **তিনি** জিজ্ঞাসা কর**লেন**।"তাড়াতাড়ি বলো!"

গর্বের সাথে, নাসিরউদ্দিন তার গল্প শেষ করলেন: "আমি ভাবলাম, 'আমি কেন এ**মন এক** অসাধারণ **প্রাণীকে** বিক্রি করব?' এবং আমি **অবশেষে** নিজের জন্যই এটি ত্রিশ সোনার মুদ্রায় কিনে **নি**লাম!"



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

বাবলা গাছের তিন ইচ্ছা

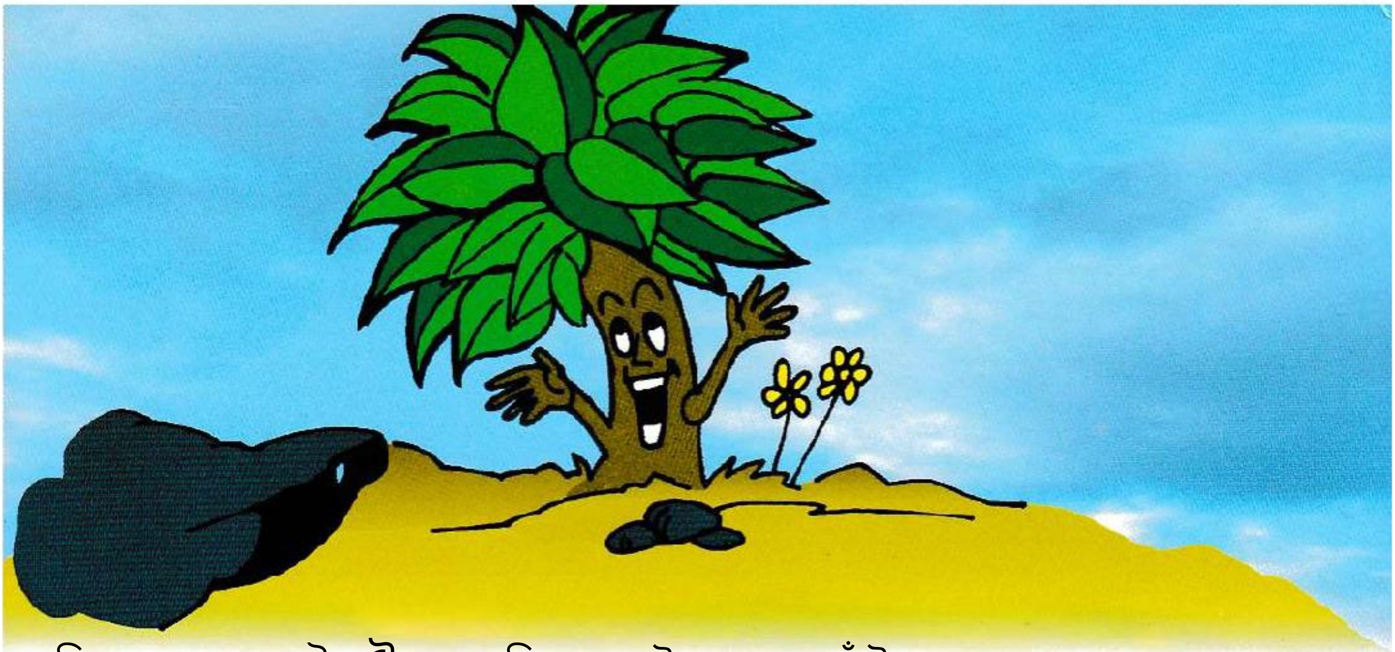
একটি গরম, শুষ্ক সমতল ভূমিতে, একটি লম্বা, সোজা রাস্তা ছিল। এর পাশে কয়েকটি শক্তপোক্ত গাছ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছ।

"কেউ আমাকে ভালোবাসে না," বাবলা গাছটি প্রায়শই নিজের মনে মনে বলত।

“যেগুলো কাঁটাবিহীন গাছ - সবাই তাদের ভালোবাসে! আর ওরা কত সুন্দর! “

বাবলা গাছটি মনে প্রাণে চাইতে লাগল যে তার সব কাঁটাগুলো ঝরে যাক: "আমাকে বদলে যেতে দাও!" সে মনে মিনে প্রার্থনা করল। হঠাৎ, তার সব কাঁটা উধাও হয়ে গেল। তার ডালগুলোতে নরম, সবুজ পাতা গজাল। কী আনন্দ!





কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ রাস্তা দিয়ে একটা ছাগল হেঁটে এলো।

সে নরম, রসালো পাতাগুলো দেখতে পেল। দেখেই সে থেমে গিয়ে পাতাগুলো খেতে লাগল।

"ওহ না!" গাছটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "এই ছাগলটি আমার সব সুন্দর নতুন পাতা গিলে ফেলবে! আহ! আমি চাই ওগুলো সোনা হয়ে যাক!"

পরমুহূর্তেই সব পাতা সোনার হয়ে গেল।

এবার, রাস্তা দিয়ে একজন লোক এলো। সে চোখ বড় বড় করে উজ্জ্বল, সোনালী পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

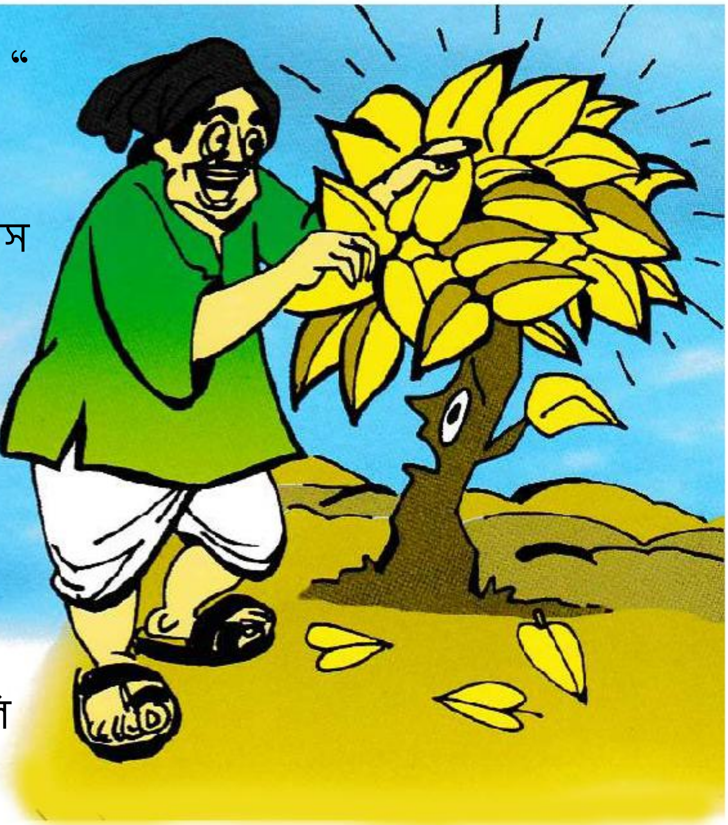


"কি অলৌকিক ঘটনা!" সে বলল।

"আর আমার ভাগ্য কতই না ভালো!“

লোকটি পাতা ছিঁড়তে শুরু করল।

গাছটি সম্পূর্ণ খালি না হওয়া পর্যন্ত সে পাতা ছিঁড়তে থাকল!



"মানুষ কি কখনো সোনা দেখে না নিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে?" গাছটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আহা! আমার যদি কাঁচের পাতা থাকত!" মুহূর্তের মধ্যে, কাঁচের পাতাগুলি তার সমস্ত শাখায় মিটিমিটি করে জ্বলতে লাগল।

অবশেষে, গাছটি নিরাপদ বোধ করল। কিন্তু হঠাৎ, একটি প্রবল বাতাস উঠল। সেই বাতাস কাঁচের পাতাগুলিকে এমনভাবে একে অপরের সাথে ধাক্কা মারতে লাগল, যে তারা সব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!



গাছটি হাহাকার করে বলল, “আমি কি কোনোদিন শান্তিতে থাকতে পারব না?”

তারপর সে ভাবল,

“আমি এমন একটি গাছ হতে চাই...

...যার পাতা ছাগল কামড়ে খেতে পারবে না,

...যার পাতা মানুষ ছিঁড়ে নিতে পারবে না,

...যার পাতা হাওয়াও ভেঙে ফেলতে পারবে না!”

সঙ্গে সঙ্গে তার সারা গায়ে কাঁটা গজিয়ে উঠল। সে আবার একটি বাবলা গাছ হয়ে গেল! আর খুশি মনে সে বাবলা গাছ হয়েই রইল। নিজের কাঁটার জন্য সে আর কখনও আফসোস করেনি।

একটি ভারতীয় লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

সিংহরাজ ও খরগোশ

সেটা ছিল এক উজ্জ্বল আর **কনকনে** ঠান্ডা শীতের সকাল। সিংহরাজের শরীর **ঠান্ডায় একেবারে জবুথবু** হয়ে গিয়েছিল।

তার মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল এই ভেবে যে, "আমি কি তবে শিকার করার জন্য খুব বুড়ো হয়ে যাচ্ছি?"

কিন্তু একটু পরেই তার **মনের জোড় ফিরে এল।** সে **মনে মনে বলল, আমি তো** জঙ্গলের রাজা? **আমার কাছে উপায় থাকবে না?** সে একটি ফন্দি আঁটল এবং নিজের গুহার বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেদিন জঙ্গলের সব প্রাণীদের তাদের রাজার সঙ্গে সভায় ডাক পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে তারা গুহার দিকে এগিয়ে গেল।



সিংহরাজ বলল—"আমার প্রিয় প্রজারা! তোমরা **সব** আমাকে দেখলেই পালিয়ে যাও। প্রতিদিন শিকার করতে গিয়ে আমি মাত্র একটি প্রাণীই ধরতে পারি। এখন ভাবো তো!

তোমাদের সবার সময়ের তো দাম আছে! আমার শিকারের জন্য তোমাদের ব্যস্ত জীবনে তো আর বাধা **পড়তে পারে না?**

আমার পরিকল্পনাটা শোনো। আজ থেকে আমি আর শিকারে বেরোব না। আমি এখানেই, আমার গুহায় বসে অপেক্ষা করব। তোমাদের মধ্যে থেকে প্রতিদিন একজন করে আমার কাছে আসবে, যাতে আমি তাকে খেতে পারি। তোমরাই একসঙ্গে মিলে ঠিক করে নেবে, কে হবে আমার শিকার।"

"তোমাদের নিজেদের ইচ্ছায় আমার কাছে আসবে। এইভাবে পুরো জঙ্গলে শান্তি ফিরে আসবে।"

বাহ! কী চমৎকার বুদ্ধি! প্রাণীরা অবাকও হলো, খুশিও হলো।
শুধু একটি ছোট খরগোশের মনে একটু সন্দেহ জাগল।

সে ভাবল, "রাজা যখন নিজে শিকারে বের হন, তখন আমাদের সবারই পালানোর একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু এই পরিকল্পনায়, যাকে বেছে নেওয়া হবে, তার তো আর পালানোর কোনো পথই থাকবে না। আহা, বেচারা প্রাণীরা!"

তবু সিংহের জন্য পরিকল্পনাটি দারুণভাবে কাজ করতে লাগল। প্রতিদিন একটি করে প্রাণী তার কাছে পাঠানো হতো, আর বাকিরা ভয় ছাড়াই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকত।

কিছুদিন পর ছোট খরগোশটির পালা এল। সে ভাবল, "আমায় কি শেষ পর্যন্ত রাজা'র পেটে গিয়ে মরতে হবে?"



“না!

আসলে আমায় এই পুরো ব্যবস্থারই একটা শেষ করতে হবে,” খরগোশটি ভাবল।

খরগোশটি ধীরে ধীরে রাজার গুহার দিকে গেল। সে গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই সিংহ বাইরে এল। খরগোশকে দেখে সে গর্জে উঠল, “তুমি এত দেরি করলে কেন?”



ছোট খরগোশটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, “হে মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সময়মতো আপনার খাবারের জন্য পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছের না থাকলেও আমি দেরি করে ফেলেছি।”

সিংহ বলল, “কি হয়েছে কি, খুলে বলো!”

খরগোশটি বলল,“আমি যখন হাঁটছিলাম, তখন একটি অচেনা সিংহ আমাকে থামাল। সে বলল, ‘আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!’ আমি তাকে বললাম, ‘তুমি আমাকে খেতে পারবে না! আমি বনের রাজার কাছে যাচ্ছি।’

তখন সেই অচেনা সিংহ গর্জে উঠল, ‘বনের রাজা! সে আবার কে? আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব! আমাকে সেই “রাজা”-কে দেখাও!’

কিন্তু কোনোরকমে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি, মহারাজ, আর সেখান থেকে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি!”

এ কথা শুনে রাজা সিংহ রাগে ফুঁসে উঠল।

সে গর্জে বলল, “কোথায়, কোথায় সেই দুষ্ট সিংহ? এই মুহূর্তে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো!”

খরগোশটি রাজাকে বনের একপ্রান্তে নিয়ে গেল।



হঠাৎ তাদের সামনে একটি ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটি বড় কুয়ো ছিল।

খরগোশটি বলল, "মহারাজ! আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি সেই অচেনা সিংহটিকে খুঁজে বের করছি।"

খরগোশটি কুয়োর কাছে গেল। সে কুয়োর ভেতরে দেখার জন্য অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। ঐতো! নীল আকাশের মাঝে সে নিজের মুখটাই দেখতে পেল।

সে চিৎকার করে বলল, "এই তো সে! ঐ সিংহটি এখানেই আছে!"

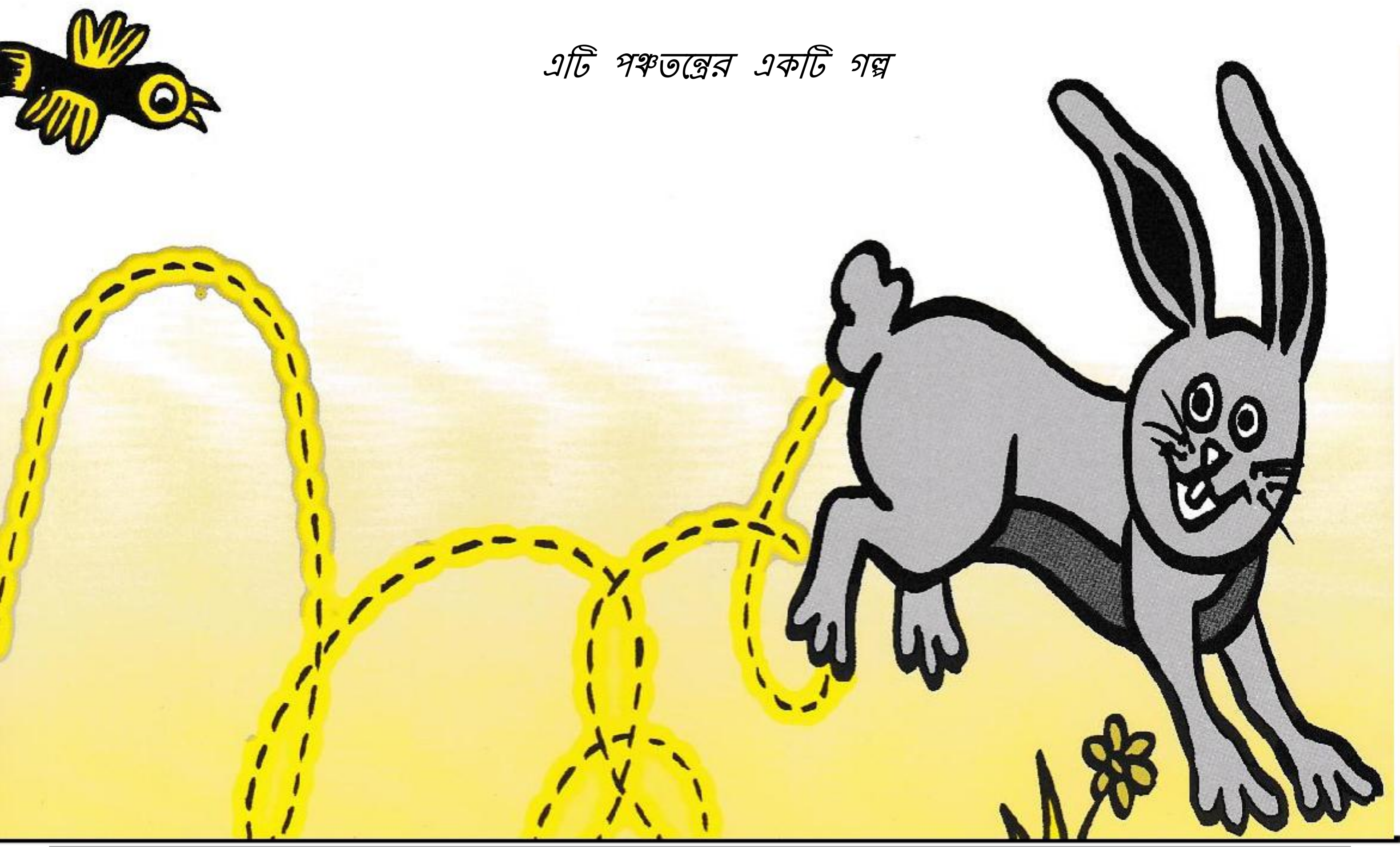
তারপর সে লাফিয়ে সরে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

সিংহ রাজ গর্জে উঠল! সে দৌড়ে কুয়োর কাছে গেল এবং ভেতরে তাকাল। সেখানে সে এক অন্য সিংহকে দেখল, যে তার দিকেই তাকিয়ে গর্জন করছে!

সিংহ রাজও তাকে আক্রমণ করার জন্য কুয়োর ভেতরে ঝাঁপ দিল।

এভাবেই সিংহরাজের কূটফন্দির অবসান হল!

এটি পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

লম্বা না খাটো?

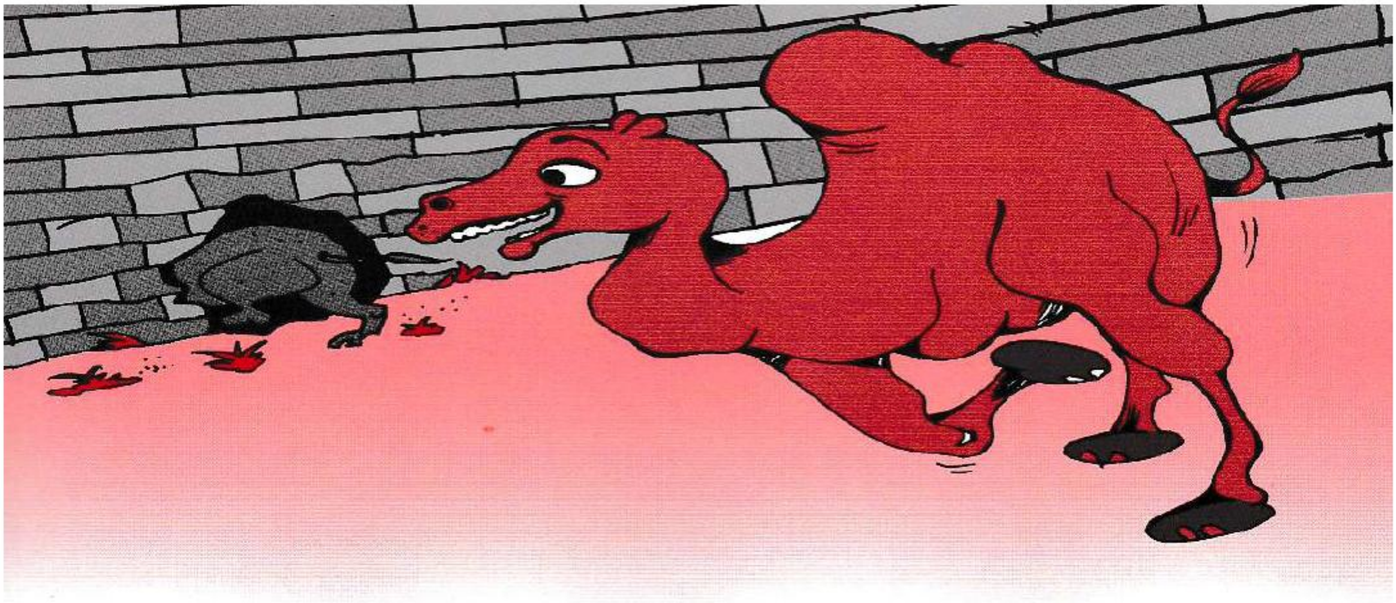
একটা উট আর শূকর ছিল খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু তারা একে অপরকে একটুও ছাড় দিত না—সব সময় মজা করে খোঁচা দিত! একদিন ......

উট: এই **বাঁটকুল**! ওপরে তাকাও তো! তুমি কি এর**কম** লম্বা হতে চাও না?

শূকর: ও লম্বা-টিংটিঙ্গে-ঠ্যাং-ওয়ালা! আমি লম্বা হতে চাইব কেন? খাটো হওয়াই অনেক ভালো।

উট: দেখো! আমি **কেমন** এই দেয়ালের ওপাশটা সহজেই দেখতে পাচ্ছি। ওখানে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে—ঝোপঝাড়, ছোট গাছ আর ফুলের গাছ। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই রসালো সবুজ ডাল আর পাতা সহজেই খেতে পারি। কিন্তু তুমি তো সেগুলো দেখতেই পারছ না। তুমি **আর** বুঝবে কী করে?





শূকর: একটু দাঁড়াও, ভাই! ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে ভুলটা শুধরে দিই। তুমি কি দেয়ালের নিচের ওই ছোট গর্তটা দেখছ? আমি ওই গর্ত দিয়ে ঢুকে যেতে পারি। আমি দেয়ালের ওপাশে যেতে পারি! আমি সেখানে সব সুন্দর জিনিস খেতে পারি। কিন্তু তুমি! তোমার শরীরের কোনো অংশ কি ওই গর্তে ঢুকবে? না! তোমার মাথাটাও ঢুকবে না!

(হাসতে হাসতে) বাই, বাই! আমাকে এখান থেকে ওইপারে খেতে দেখো। মজা করো!

শূকরটি গর্ত দিয়ে ফস করে গলে গেল। সে দেয়ালের ওপাশে চলে গেল। উটটি অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর উটটি বলল—

উট: তুমি যা বলেছ, তা সত্যি—

কেউ খাটো,
কেউ লম্বা,
কেনই বা কোন একজনের আকার
হতে যাবে সবার জন্য সেরা?

ফাটা হাঁড়ি

গোপাল ছিলেন খুবই পরিশ্রমী একজন মানুষ। তাঁর কাজ ছিল নদী থেকে জল আনা। দিনের মধ্যে তাকে কতবার যে যাতায়াত করতে হত! প্রতিদিন এদিক-ওদিক, ওদিক-এদিক হাঁটতে হাঁটতে তার নিজের পায়ের ছাপেই একটি পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

গোপাল তার কাঁধে রাখা একটি লম্বা লাঠির দুই প্রান্তে দুটি হাঁড়ি বেঁধে নদীর জল বয়ে আনত। হাঁড়িগুলোর একটি ছিল ফাটা। ফাটলটি ছোট ছিল, কিন্তু সেখান থেকে অল্প অল্প জল পরত—"টুপ, টুপ, টুপ।"

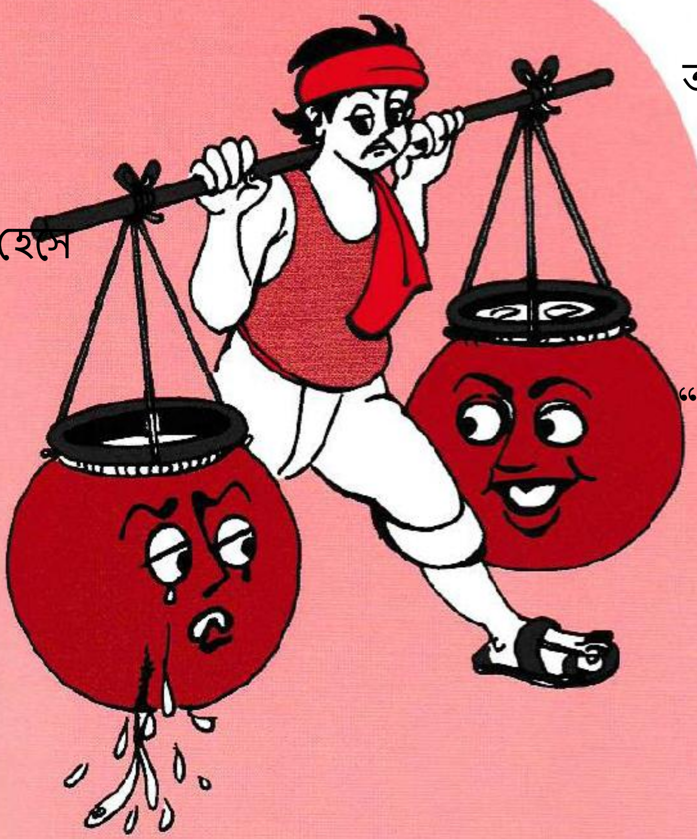
নদী থেকে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই সেই হাঁড়ির অর্ধেক জল পরে যেত।

এ দেখে যে হাঁড়িটি ফাটা ছিল না, সেটি খুব গর্ব করতে লাগল। সে বলল,

"আমার দিকে দেখ! আমি সব সময় এক ফোঁটা জল নষ্ট না করে বাড়ি পৌঁছাই!"

এ কথা শুনে ফাটা হাঁড়িটির খুব দুঃখ পেল।

সে গোপালকে বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন! আপনি এত কষ্ট করে বাড়িতে জল নিয়ে আসেন, অথচ আমি তার অর্ধেকটাই নষ্ট করে ফেলি।"



এমন কথা শোনার পর গোপাল হেসে উঠলেন। ফাটা হাঁড়িটির দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের পথের ধারে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকে। আমরা যখন যাই, তখন তুমি সেগুলো ভালো করে দেখো।"

সত্যিই তো! পথের ধারে অনেক ফুলের গাছ, ফুলে ফুলে ভরা। ফাটা হাঁড়িটি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের দুঃখ ভুলে গেল। ফুলগুলোর সৌন্দর্য তার মন ভালো করে দিল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে আবার তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

সে গোপালকে বলল, "ওই সুন্দর ফুলগুলো কিছু সময়ের জন্য আমার নিজের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনার কষ্ট তো আমার জন্যই বেড়েছে। আমি সেটা কী করে ভুলে থাকি?"

গোপাল উত্তর দিলেন, "ও হাঁড়ি! তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা খেয়াল করোনি!"

তিনি বললেন, "ফুলগুলো শুধু পথের এক পাশেই ফুটেছে, এটা খেয়াল করেছ! তোমার থেকে যে জল পড়ে, তার জন্যই তো এরা এত সুন্দর করে বেড়ে উঠেছে!"

তিনি আরও বললেন, "সত্যি বলতে কি, এক সময় আমি ভেবেছিলাম, আরেকটি নতুন হাঁড়ি কিনব—যেটিতে কোনো ফাটল নেই। কিন্তু পরে ভাবলাম, 'ফুলগুলো তো ফুটে থাকুক! আর মানুষ সেগুলো দেখে আনন্দ পাক!'"

শেষে গোপাল আরও বললেন, "এই সুন্দর কাজটা সম্ভব হয়েছে শুধু তোমার জন্যই।"

এটি একটি ভারতীয় লোককথা।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

পিঁপড়ের বানানো চটি



একটা পিঁপড়ে ছিল। সে থাকত জঙ্গলে। কিন্তু সে অন্য পিঁপড়েদের মতো ছিল না। সে সবসময় নতুন বা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিছু বানানোর খুঁজত।

একদিন সে ঠিক করল, সে চটি সেলাই করবে। সে পাতা আর ছোট ডাল কুড়িয়ে আনল এবং সারা রাত ধরে কাজ করল। ভোর হতে হতেই সে এক জোড়া চটি বানিয়ে ফেলল।

তারপর সেগুলো বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার মধ্যে পিঁপড়ের সঙ্গে একটি বানরের দেখা হলো। সে বলল, "কাকা, দয়া করে এই চটিগুলো কিনুন।"

বানরটি বলল, "বন্ধু, আমি তো চার পায়ে হাঁটি। এক জোড়া চটি দিয়ে আমি কী করব?"

পিঁপড়ে যেসব প্রাণীর সঙ্গে দেখা করল, সবাই একই কথা বলল।

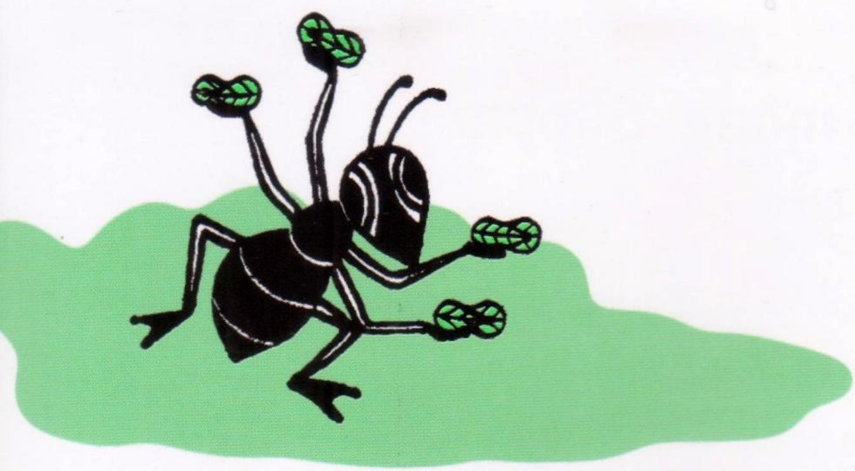
তাই সে বাড়ি ফিরে বুঝল, তাকে কী করতে হবে।

সে আরও পাতা আর ডাল জোগাড় করল।

আবার সারা রাত কাজ করল।



ভোরবেলা তার কাছে বিক্রি করার জন্য দুই জোড়া চটি তৈরি হয়ে গেল।





পিঁপড়েটি সোজা বানরের কাছে গেল।
বানরটি চারটি চটি হাতে নিয়ে বসল। সে সেগুলো ভালো করে দেখল।

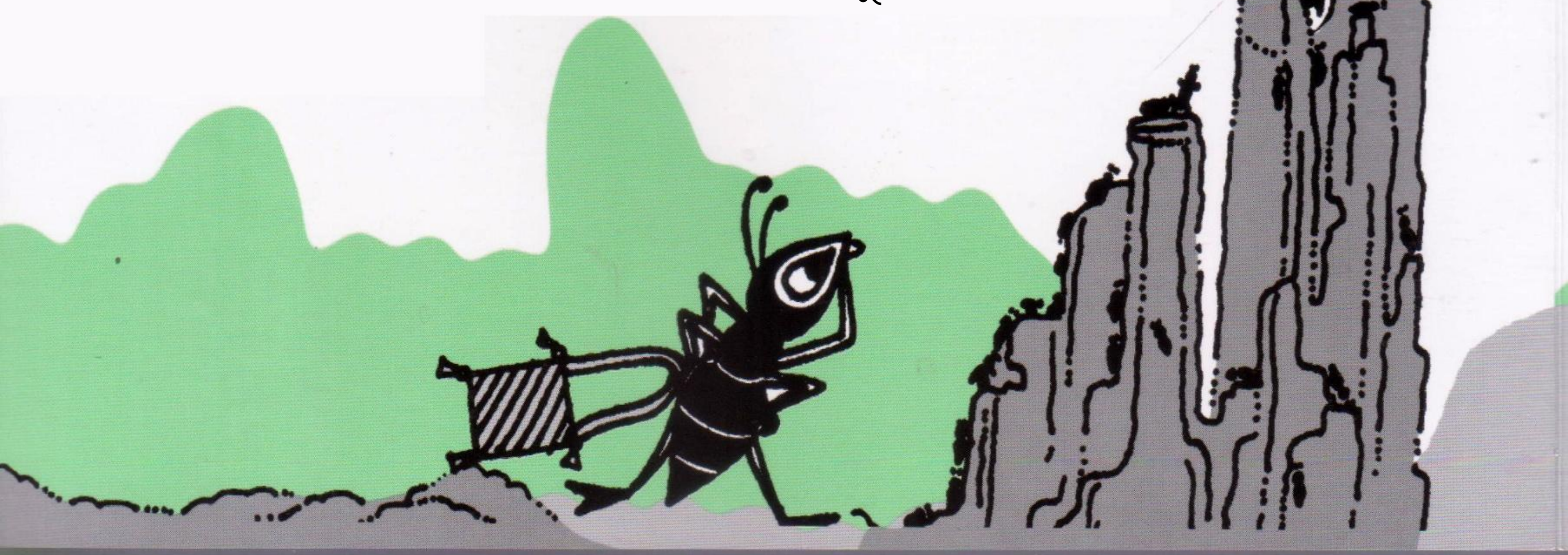
তারপর বলল, "এই চটিগুলো একটু ছোট। এগুলো আমার পায়ে ঠিকমতো হবে না। তবে তোমার মতো আরেকটি পিঁপড়ের পায়ে ঠিক মানাবে। তুমি তোমার কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো না কেন?"

এ কথা বলে সে চটিগুলো ফেরত দিল এবং নিজের পথে চলে গেল।

পিঁপড়েটি তার বন্ধুর বাড়িতে গেল। সে তার বন্ধুকে চটিগুলো দেখাল।
কিন্তু তার বন্ধু বলল, "চারটা চটি দিয়ে আমি কী করব? আমরা পিঁপড়েদের তো ছয়টা পা! তুমি কি সেটা ভুলে গেছ?"

লজ্জায় পিঁপড়েটির মুখ লাল হয়ে গেল!
সে বলল, "তুমি ঠিক বলেছ," আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল।

সেই রাতে সে আরও এক জোড়া চটি সেলাই করল।
সকালে ছয়টি চটি গুছিয়ে নিয়ে সে আবার বন্ধুর কাছে গেল।





বন্ধু যখন চটিগুলো পায়ে পরে দেখছিল, পিঁপড়েটি শ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

সে মনে মনে প্রার্থনা করল, "হে বন্ধু, দয়া করে, পছন্দ করো! দয়া করে পছন্দ করো!"

কিন্তু তার বন্ধু বলল, "চটিগুলো সুন্দর হয়েছে। কিন্তু খুব হালকা। খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবে। তাই আমি নেব না। হুম্... আমি জানি! মাকড়সার কাছে যাও। সে নিশ্চয়ই কিনবে।"

পিঁপড়েটি হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই সে সাহস পেল। তার চটিগুলো কি খারাপ বানানো? সেগুলো কি সুন্দর নয়? তাতো নয়। তাই, আজই সে ছয়টি চটিই বিক্রি করবে!



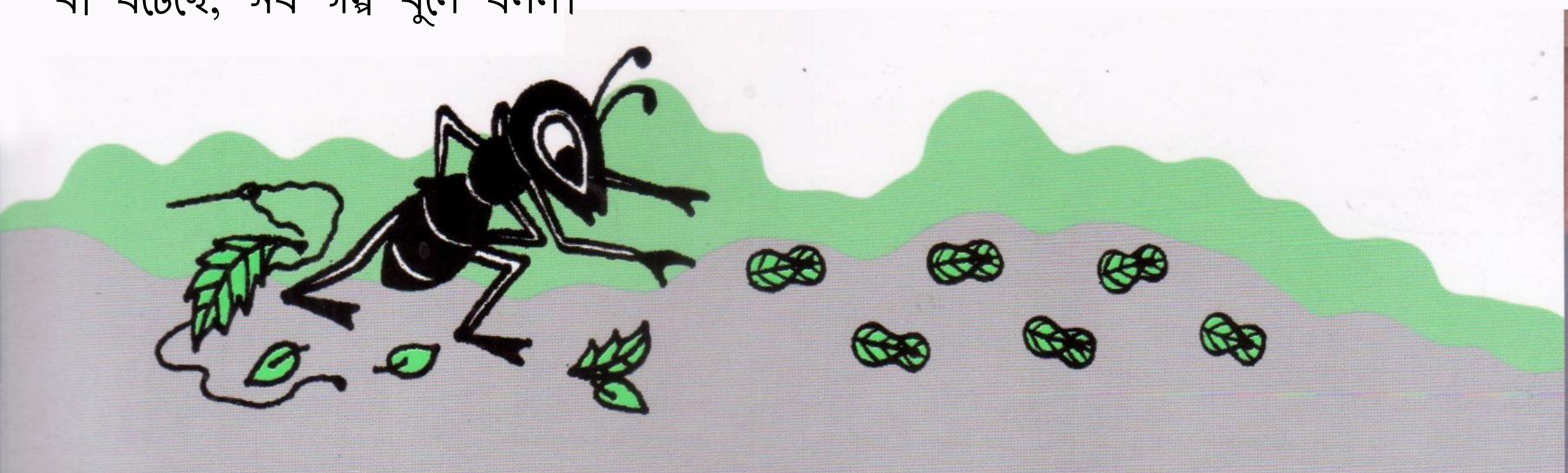
সে চটিগুলো গুছিয়ে নিয়ে মাকড়সার বাড়ির দিকে রওনা দিল।

মাকড়সার বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে সে থেমে গেল—ভেতরে গেলে যদি সে জালে আটকে যায়!

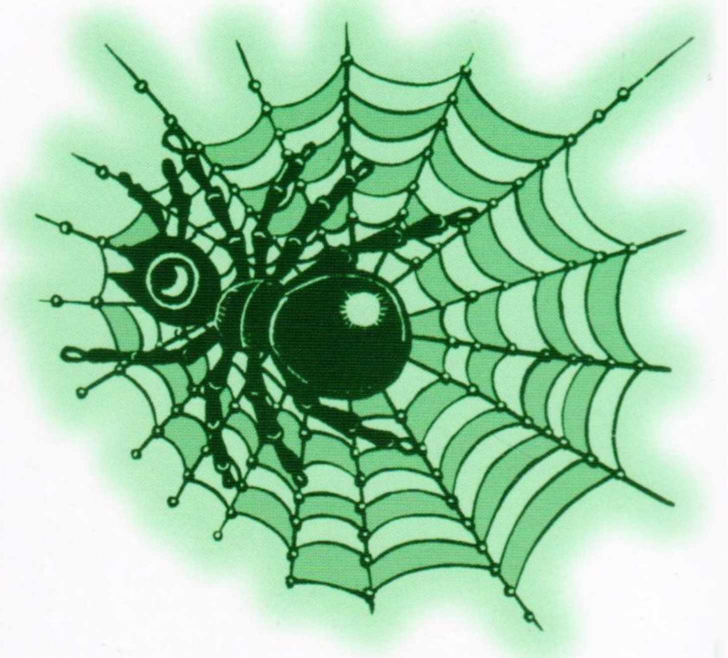
সে ডাকল, "মাসি! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!"

মাকড়সা তাকে ভালো করে দেখে বলল, "কী হয়েছে, সোনা? তুমি এত মন খারাপ করে আছ কেন?"

তখন পিঁপড়েটি প্রথম জোড়া চটি সেলাই করার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব গল্প খুলে বলল।







বলতে গিয়ে হঠাৎ পিঁপড়েটির মনে হলো, "আরে! মাকড়সার তো আটটা পা। সে নিশ্চয়ই আমাকে আবার আরেক জোড়া চটি বানাতে বাড়ি পাঠাবে!"

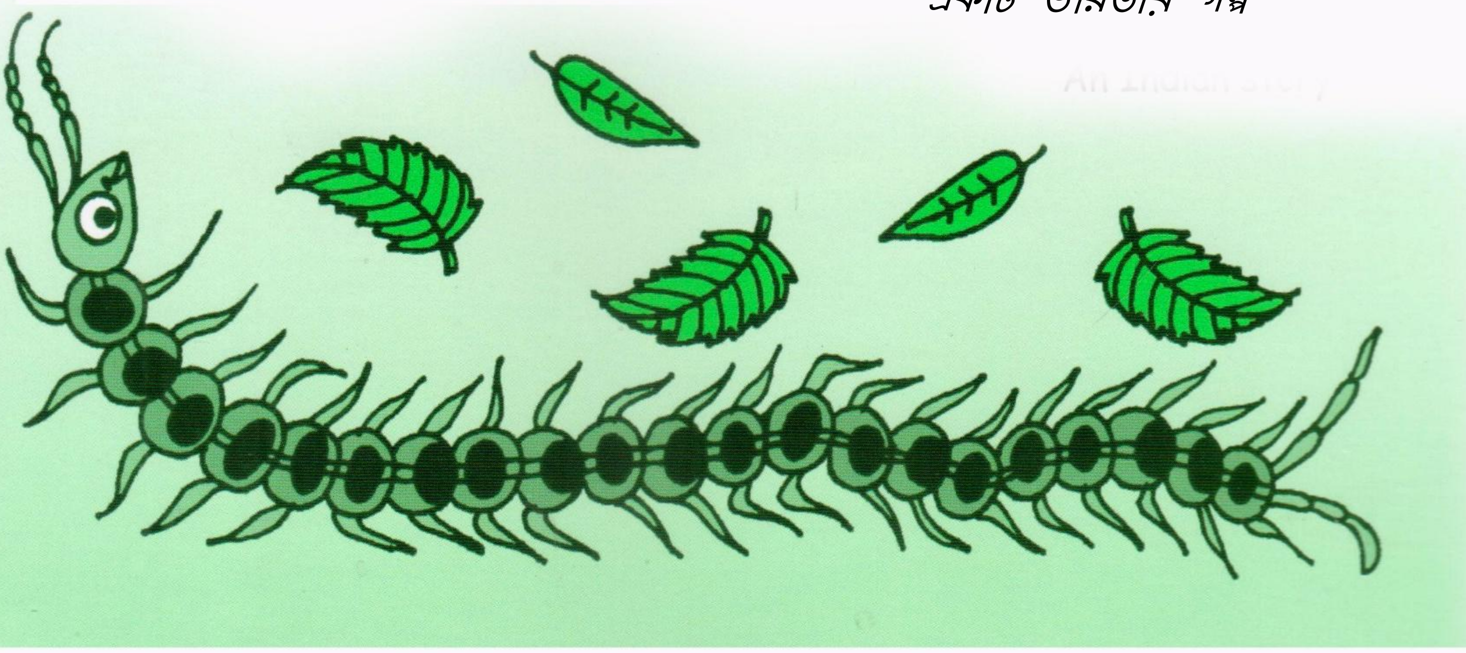
কিন্তু মাকড়সার মাথায় ছিল আরও ভালো বুদ্ধি।

সে বলল, "আমি তোমাকে বলি কীভাবে চটিগুলো বিক্রি করবে।

তুমি **কেন্নোর সাথে** গিয়ে দেখা করো। তার **তো** অনেক অনেক পা আছে। তুমি যত জোড়া চটি বানাতে পারবে, তার সবই তার লাগবে।"

"ধন্যবাদ, মাসি!" পিঁপড়েটি বলল।
খুশি মনে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

একটি ভারতীয় গল্প



চিত্রকর ইয়াং

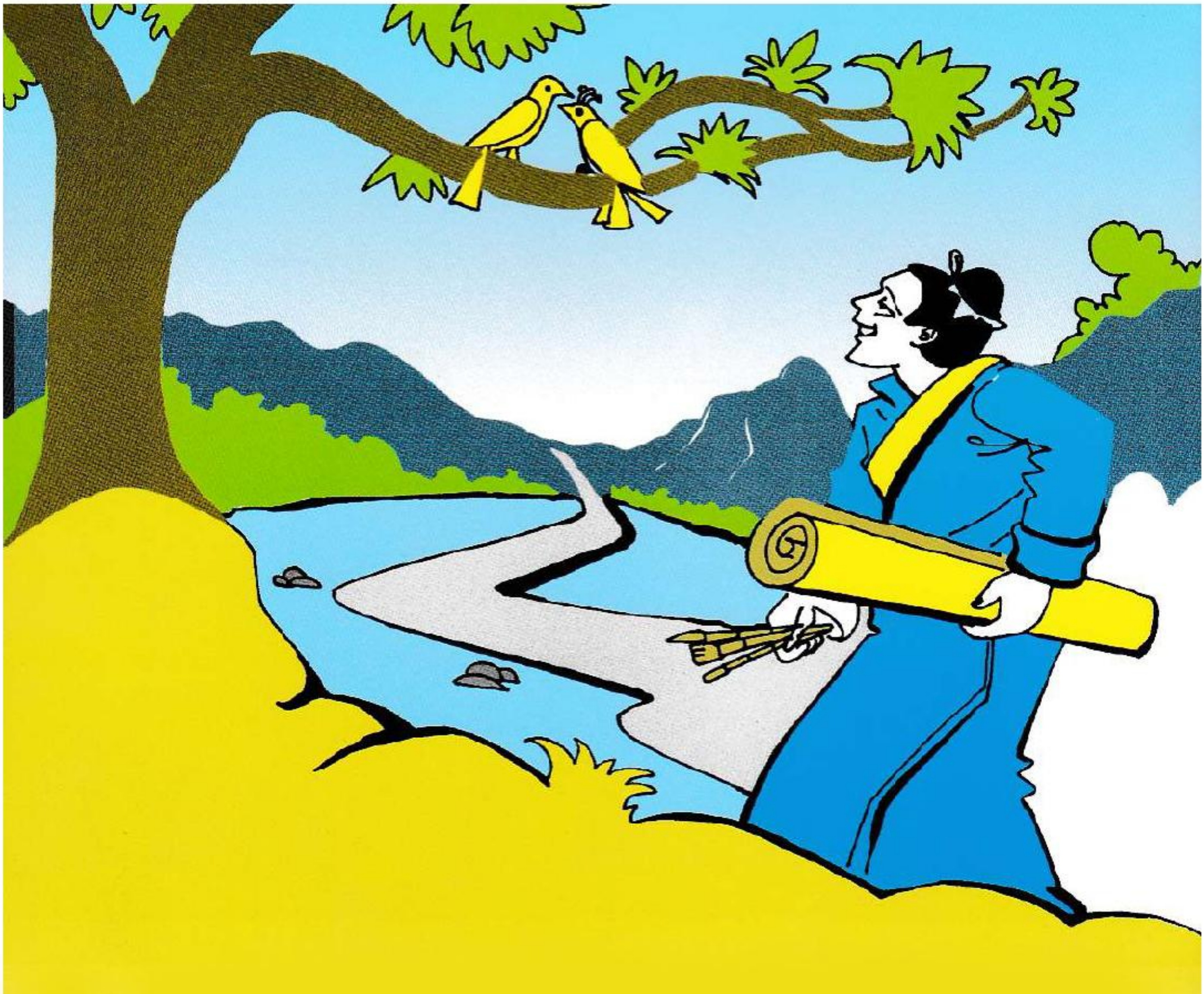
অনেকদিন আগে ইয়াং নামের ছোট্ট এক ছেলে। সে তার কাকার সঙ্গে থাকত। তার কাকা ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী।

প্রতিদিন ইয়াং কাকার পাশে বসে তাঁকে ছবি আঁকতে দেখত। সে খুব মন দিয়ে সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করত। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত, সে বুঝতেই পারত না।

ইয়াংয়ের কাকা বুঝতে পারলেন, দিন যত যাচ্ছে, ছেলেটির আগ্রহ তত বাড়ছে। তাই তিনি ইয়াংয়ের জন্য রং-তুলি আর কাগজ কিনে দিলেন। তারপর বললেন, “যাও, তুমি-ও ছবি আঁকো!”

ইয়াং গ্রাম জুড়ে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতে লাগল। যখনই সে একটি ছবি শেষ করত, তার কাকা সেটি দেখে দিতেন।





একদিন তার কাকা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোমার ছবিগুলো একেবারে দারুণ! তোমার ভীষণ প্রতিভা আছে!"

তিনি একটু ভেবে বললেন, "চলো, আমরা একটি ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করি। আমাদের সব প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানাব। আমরা তোমার ছবিগুলো সাজিয়ে রাখব। আমাদের বন্ধুরা খুব খুশি হবে!"

প্রতিবেশীরা ইয়াংয়ের ছবি দেখতে এলেন। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

একজন বললেন, "এই ছবিগুলো তো একেবারে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে!"

আরেকজন বললেন, "তোমার আঁকা ফুলে তো মৌমাছিরা মধু খেতে আসবে!"

"তারা তোমার মৌচাকে পরাগ নিয়ে যাবে!" ইয়াংয়ের কাকা খুব খুশি হলেন।

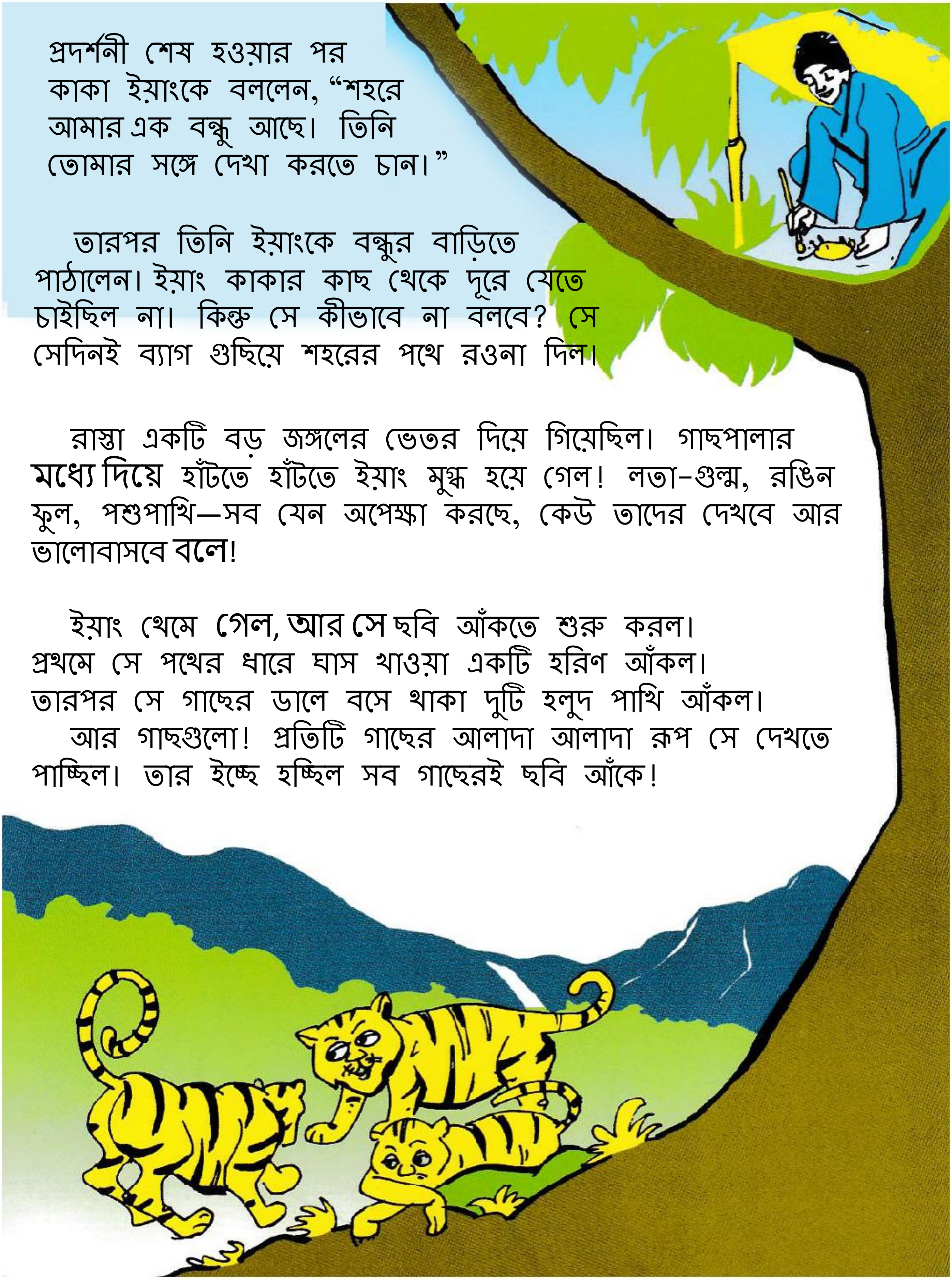
প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর কাকা ইয়াংকে বললেন, "শহরে আমার এক বন্ধু আছে। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

তারপর তিনি ইয়াংকে বন্ধুর বাড়িতে পাঠালেন। ইয়াং কাকার কাছ থেকে দূরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু সে কীভাবে না বলবে? সে সেদিনই ব্যাগ গুছিয়ে শহরের পথে রওনা দিল।

রাস্তা একটি বড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইয়াং মুগ্ধ হয়ে গেল! লতা-গুল্ম, রঙিন ফুল, পশুপাখি—সব যেন অপেক্ষা করছে, কেউ তাদের দেখবে আর ভালোবাসবে বলে!

ইয়াং থেমে গেল, আর সে ছবি আঁকতে শুরু করল। প্রথমে সে পথের ধারে ঘাস খাওয়া একটি হরিণ আঁকল। তারপর সে গাছের ডালে বসে থাকা দুটি হলুদ পাখি আঁকল।

আর গাছগুলো! প্রতিটি গাছের আলাদা আলাদা রূপ সে দেখতে পাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সব গাছেরই ছবি আঁকে!



ইয়াং অনেক দিন ধরে জঙ্গলে থেকে ছবি আঁকতে লাগল।

প্রতিদিন রাতে সে পথের ওপর একটি গাছের মাচায় নিরাপদে ঘুমাত। একদিন ইয়াং একটি শূকর দেখল। সে যখন শূকরের ছবি আঁকছিল, তখন একজন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসে বলল, "বাঘ! বাঘ!"

হে ভগবান! এখন কীভাবে বাঁচা যাবে?
ইয়াংয়ের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে শূকরের আঁকা ছবিটি নিয়ে একটি ঝোপের সামনে ঠেস দিয়ে রাখল। তারপর সে আর লোকটি যত জোরে পারে দৌড়ে পালাল।

কিছুক্ষণ পর বাঘটি ঝোপের কাছে এল। সে ছবির শূকরটিকে দেখে থেমে গেল।
"গররর!" সে গর্জে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।
এই সুযোগে ইয়াং আর লোকটি তাড়াতাড়ি গাছের মাচায় উঠে গেল।
এইভাবে তারা নিজেদের জীবন বাঁচাল!

একটি চীনা গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

31 সেরা ছাত্র





পাণ্ডব ও কৌরবরা যুদ্ধবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। দ্রোণাচার্য ছিলেন তাদের শিক্ষক।

সেই সময়ে যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে ধনুর্বিদ্যাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হতো। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন ছিলেন সেরা ধনুর্ধর।

অর্জুন এই বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলন করতেন। এর ফলে তিনি বাকি সবার চেয়ে নিজেকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দ্রোণের সেরা ছাত্র।



অর্জুনের এই একাগ্রতা দ্রোণের হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা করে অর্জুনকে বিশেষ শিক্ষা দিতেন।

কৌরব ভাইয়েরা বিষয়টি মোটেও পছন্দ করত না! তারা ঈর্ষার দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থাকত।

একদিন দ্রোণ তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটি গাছের উঁচু ডালে কাঠের তৈরি একটি লক্ষ্যবস্তু ঝুলিয়ে দিলেন। লক্ষ্যবস্তুটি এমনভাবে তৈরি ও রঙ করা হয়েছিল, যাতে দেখতে ঠিক একটি পাখির মতো মনে হয়।

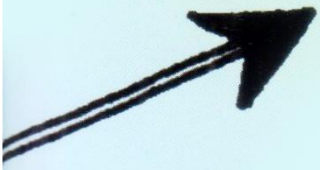


"ছাত্ররা!" দ্রোণ তাদের নিজের কাছে ডেকে বললেন।



সবাই সমবেত হলে তিনি বললেন, "ওই কাঠের পাখিটির দিকে তাকাও। ওটাই তোমাদের লক্ষ্যবস্তু। ওটিকে খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করো এবং নিখুঁতভাবে তোমাদের লক্ষ্য স্থির করো! তোমাদের তীরটি যেন ঠিক পাখিটির চোখের মাঝখানে বিদ্ধ হয়।"





পাণ্ডব ও কৌরবরা ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ডাকলেন।

যুধিষ্ঠির লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা করলেন। তিনি তাঁর তীরটি প্রস্তুত করে নিলেন। হঠাৎই দ্রোণের কন্ঠস্বর তীক্ষ্ণভাবে শোনা গেল—"যুধিষ্ঠির!"

বালকটি অপেক্ষা করল। প্রশ্ন এল—"তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?"

"হে গুরু!" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আমি গাছটি দেখতে পাচ্ছি। আমি গাছের পাতাগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি পাখিটিকেও দেখতে পাচ্ছি," তিনি বললেন।

"একপাশে সরে দাঁড়াও, যুধিষ্ঠির!" দ্রোণ বললেন। "লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার মতো যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুমি ওটিকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

এরপর এল দুর্যোধনের পালা। দ্রোণ তাকেও একই প্রশ্ন করলেন। দুর্যোধন বলল, "হে গুরু! আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আর আমি অন্য ছাত্রদেরও দেখতে পাচ্ছি! তাছাড়া আমি গাছপালা, ডালপালা আর পাতাগুলোও দেখতে পাচ্ছি! আর আমি পাখিটিকেও দেখতে পাচ্ছি!" "আমার চোখে কত কিছুই না ধরা পড়ছে!" সে গর্বের সাথে বলল।



"তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, দুর্যোধন!" উত্তর এল।

ভীম, নকুল, সহদেব এবং অন্যদের পালাও একইভাবে কেটে গেল।

অবশেষে, অর্জুনের পালা এল। সে তার তীর প্রস্তুত করল। সে আর সবকিছু ভুলে গেল। এমনকি সে নিজের কথাও ভুলে গেল। সে কাঠের পাখিটির ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করল।

দ্রোণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?"

"পাখিটির চোখ, হে গুরু," অর্জুন বলল। "আমি কেবল ওটাই দেখতে পাচ্ছি।"

দ্রোণ বুঝতে পারলেন যে, অর্জুন তার লক্ষ্যের ওপর পুরোপুরি একাগ্রচিত্ত। তাই তিনি তাকে বললেন, "তোমার তীর নিক্ষেপ করো।"

অর্জুন তার তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি সোজা ও নির্ভুলভাবে ছুটে গেল। সেটি পাখিটির চোখ বিদ্ধ করল।

© Katha Jharna 2008

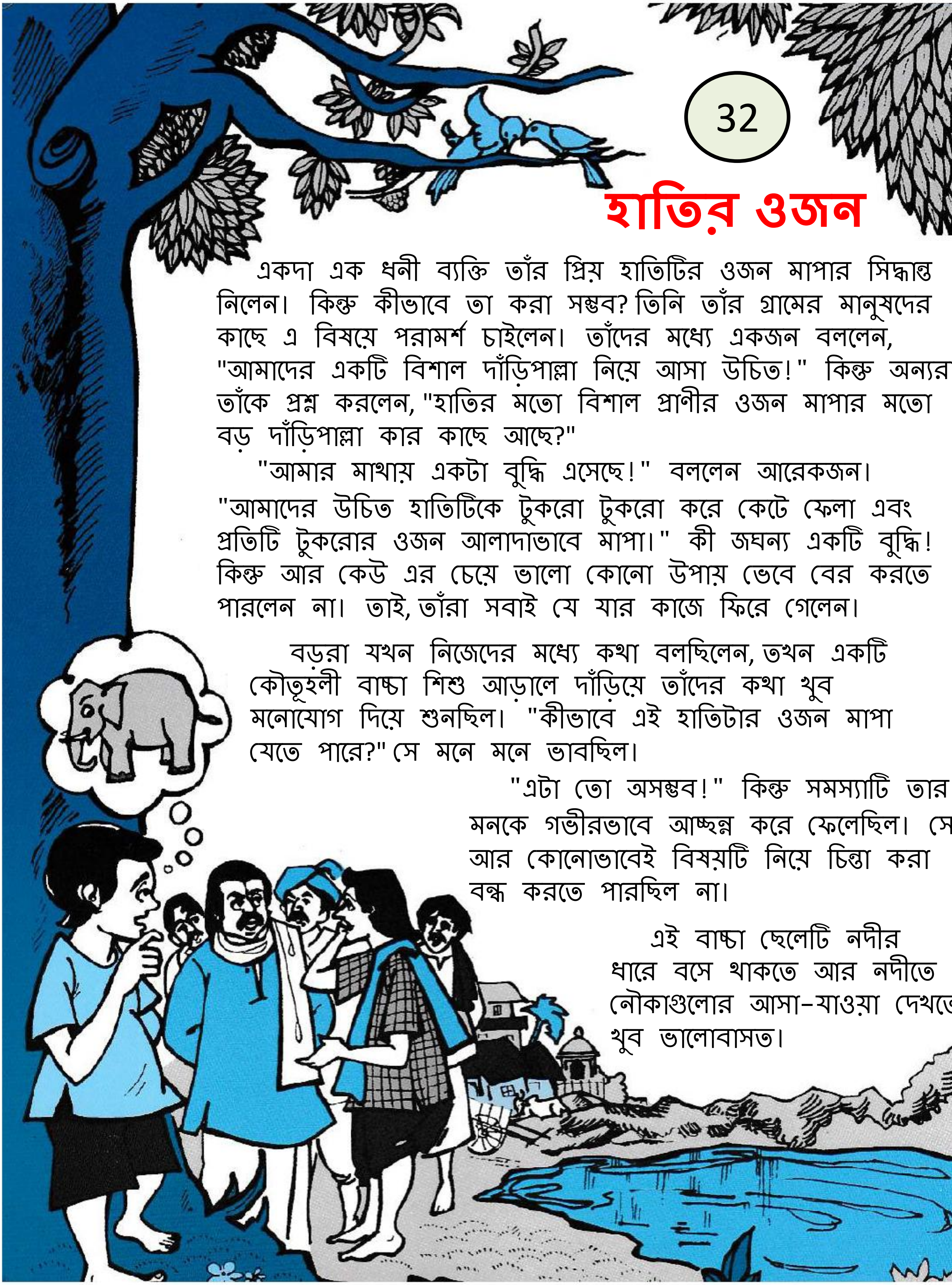
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy



32

হাতির ওজন

একদা এক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রিয় হাতিটির ওজন মাপার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কীভাবে তা করা সম্ভব? তিনি তাঁর গ্রামের মানুষদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "আমাদের একটি বিশাল দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসা উচিত!" কিন্তু অন্যরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "হাতির মতো বিশাল প্রাণীর ওজন মাপার মতো বড় দাঁড়িপাল্লা কার কাছে আছে?"

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!" বললেন আরেকজন। "আমাদের উচিত হাতিটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা এবং প্রতিটি টুকরোর ওজন আলাদাভাবে মাপা।" কী জঘন্য একটি বুদ্ধি! কিন্তু আর কেউ এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় ভেবে বের করতে পারলেন না। তাই, তাঁরা সবাই যে যার কাজে ফিরে গেলেন।

বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, তখন একটি কৌতূহলী বাচ্চা শিশু আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। "কীভাবে এই হাতিটার ওজন মাপা যেতে পারে?" সে মনে মনে ভাবছিল।

"এটা তো অসম্ভব!" কিন্তু সমস্যাটি তার মনকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সে আর কোনোভাবেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারছিল না।

এই বাচ্চা ছেলেটি নদীর ধারে বসে থাকতে আর নদীতে নৌকাগুলোর আসা-যাওয়া দেখতে খুব ভালোবাসত।

একদিন সে লক্ষ্য করল, একটি নৌকা জলের বেশ গভীরে ডুবে আছে। ঢেউগুলো নৌকার দুপাশ দিয়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছিল।

হঠাৎই ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠল এবং দৌড়ে সেই ধনী ব্যক্তির বাড়িতে গেল। "আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারব আপনার হাতিটির ওজন ঠিক কতটুকু!" সে ধনী ব্যক্তিকে বলল। এরপর সে তাঁকে হাতিটিকে নিয়ে নদীর তীরে আসার অনুরোধ করল।

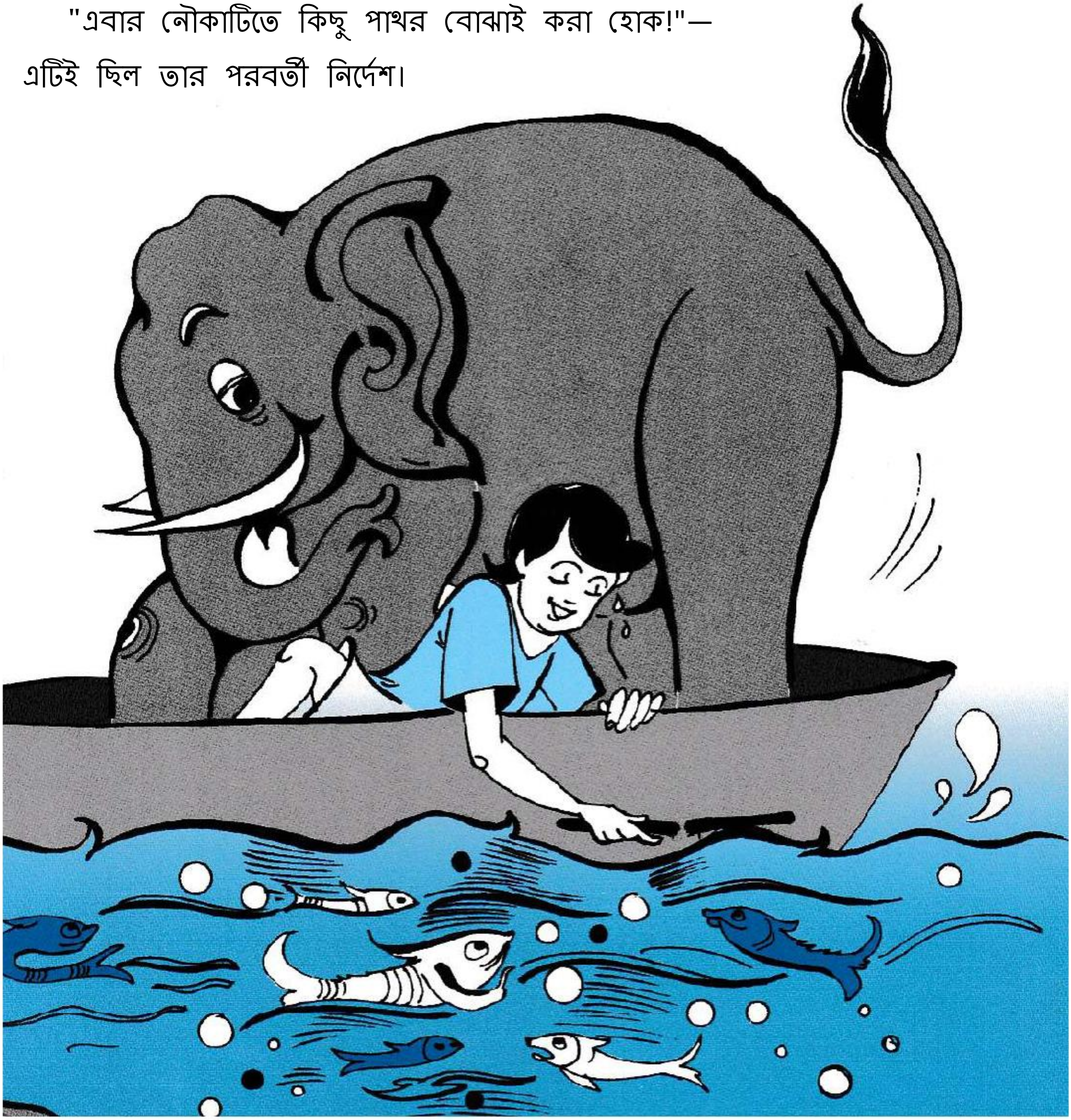


গ্রামের সব মানুষও এসে সেখানে জড়ো হলো। ছেলেটি এবার নির্দেশ দিতে শুরু করল। "আমাদের একটি মজবুত নৌকা প্রয়োজন!" সে বলল। একটি নৌকা নিয়ে আসা হলো। "এবার, হাতিটাকে নৌকার ভেতরে উঠতে দিন!"

হাতিটা নৌকায় ওঠার সাথে সাথেই নৌকাটি জলের আরও গভীরে নেমে গেল।

ছেলেটি বাড়ি থেকে সঙ্গে করে আনা একটি দাগ কাটার যন্ত্র বের করল। সে নৌকার গায়ে ঠিক সেই জায়গাটিতে একটি রেখা টেনে দিল, যেখানে জলের উপরিতল নৌকাটিকে স্পর্শ করে ছিল। "এবার, হাতিটিকে নৌকা থেকে নামিয়ে আনুন!" সে নির্দেশ দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই হাতিটি নিরাপদে নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। আর নৌকাটি জলের ওপরের দিকে উঠে এল! নৌকার গায়ে আঁকা রেখাটি এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল!

"এবার নৌকাটিতে কিছু পাথর বোঝাই করা হোক!"— এটিই ছিল তার পরবর্তী নির্দেশ।





"ততক্ষণ পর্যন্ত পাথর বোঝাই করতে থাকুন, যতক্ষণ না নৌকাটি আবার আগের অবস্থানে নেমে আসে! নৌকার গায়ে আঁকা রেখাটি যেন পুনরায় জলের উপরিতলকে স্পর্শ করে!"

"থামুন!"—রেখাটি জলের স্তর স্পর্শ করার সাথে সাথেই ছেলেটি বলে উঠল। "এখন নৌকায় থাকা সব পাথরের মোট ওজন ঠিক হাতির ওজনের সমান!"

গ্রামবাসীরা হাততালি দিয়ে উঠল। "কী বুদ্ধিমান ছেলে!" তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু ঠিক তখনই ছেলেটি চেঁচিয়ে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিল: "আমরা কি পাথরগুলোর মোট ওজন বের করে দেখব?"

মুহূর্তের মধ্যেই লোকজন তাদের দাঁড়িপাল্লাগুলো আনতে নিজেদের বাড়ির দিকে ছুটে গেল। নৌকা থেকে পাথরগুলো একে একে বের করে আনা হলো। পাথরের ওজনগুলো যখন বলা হচ্ছিল, গ্রামের ছেলেমেয়েরা তখন সেগুলো লিখে নিচ্ছিল।

অবশেষে শেষ পাথরটির ওজন মাপা হলো। সব পাথরের ওজন একত্র করে যোগ করা হলো। সব হিসাব-নিকাশ দুবার করে যাচাই করে নেওয়া হলো। তারপর ছেলেটি মোট ওজনটি পড়ে শোনাল।

আর সেই ধনী লোকটি আনন্দে হেসে উঠল! কারণ, সেটাই ছিল হাতির আসল ওজন।

একটি ঐতিহ্যবাহী চীনা লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

একটি অত্যন্ত দীর্ঘ গল্প

একদা এক রাজা ছিলেন, যিনি সব ধরণের গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। যখনই তিনি অবসর পেতেন, তিনি তাঁর রাজকর্মচারীদের কাউকে—সে মন্ত্রী হোক, সেনাপতি হোক, প্রহরী হোক, এমনকি মালী হোক—ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁদের প্রিয় কোনো গল্প শোনাতে বলতেন। গল্প শোনার যে তাঁর তৃষ্ণা, তা কখনোই মিটত না।

একদিন তিনি আরও বেশি মানুষের গল্প শোনার একটি উপায় ভেবে বের করলেন। "আমি একটি গল্প বলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করব!" তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজ্যের সব প্রান্তে একটি ঘোষণা করা হলো: "যে গল্পকথক সবচেয়ে দীর্ঘ গল্পটি শোনাতে পারবেন, রাজা তাঁকে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেবেন!"

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে গল্পকথকরা এসে জড়ো হলেন। আর তাঁদের গল্পগুলো ছিল সত্যিই দীর্ঘ! একজনের গল্প শেষ করতে পুরো এক সপ্তাহ সময় লেগে গেল। আরেকজনের লাগল দশ দিন। এমনকি অন্য একজনের গল্প তো টানা এক মাস ধরে চলল! কিন্তু রাজা সব গল্পকথককে উদ্দেশ্য করে কেবল একটাই কথা বলতেন, "তোমাদের গল্পটা খুব একটা দীর্ঘ নয়।" আর এই বলে তিনি তাঁদের বিদায় করে দিতেন।

গল্পকথকরা আসতেই থাকলেন। আর রাজা তাঁদের বিদায় করতেই থাকলেন। এভাবেই মাসের পর মাস কেটে গেল, যতক্ষণ না...

একদিন এক চতুর কবি রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। "আমাকে ওই ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা জিততেই হবে!" তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

রাজার সামনে উপস্থিত হওয়ার পালা যখন এল, তখন তিনি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আমি এমন একটি অত্যন্ত দীর্ঘ গল্প জানি, যা পুরোপুরি বলে শেষ করতে আমার সারাটি জীবন কেটে যাবে!"

"চমৎকার!" রাজা বলে উঠলেন। "তবে আর দেরি কেন? শুরু করো!"



"বেশ," কবি বললেন। "তবে আপনাকে একটি শর্তে রাজি হতে হবে।"

"বলো, কী সেই শর্ত," রাজা জানতে চাইলেন।

"গল্প শোনার সময় আপনাকে মাঝে মাঝে বলতে হবে—'তারপর কী হলো? তারপর কী হলো?'" কবি জানালেন।

"এটুকুই তো?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন। ব্যস, কবি তাঁর গল্প শুরু করলেন:

একদা এক অত্যন্ত বিত্তশালী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের ধানের ক্ষেতগুলো ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। রাজ্যের প্রজাদের কখনোই অনাহারে দিন কাটাতে হতো না। তারা কঠোর পরিশ্রম করত এবং সুখে-শান্তিতে দিন কাটাত।

একবার এমন একটি ঋতু এল, যখন ধানের ফলন হলো অভূতপূর্ব—যা আগে কখনো দেখা যায়নি। ফসল উঠল বিপুল পরিমাণে! রাজ্যের সর্বত্র সদ্য ঝাড়াই করা ধানের স্তূপ জমে গেল।

রাজার এক মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, "চলুন মহারাজ, আমরা একটি বিশাল শস্যাগার নির্মাণ করি। আমাদের উদ্বৃত্ত শস্যের সবটুকু সেখানে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। তাতে করে, ভবিষ্যতে যদি কখনো আমাদের ফসলের ফলন ভালো নাও হয়, তবুও আমরা প্রজাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারব।" রাজা মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। নতুন শস্যাগারটি নির্মাণের কাজে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল। যখন এর নির্মাণকাজ শেষ হলো, তখন সারা পৃথিবীতে এর জুড়ি মেলা ভার ছিল! দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এটি দেখতে আসত। এটি যে কেবল বিশাল আকৃতির ছিল তাই নয়; এটি শস্যে কানায় কানায় পূর্ণও ছিল।

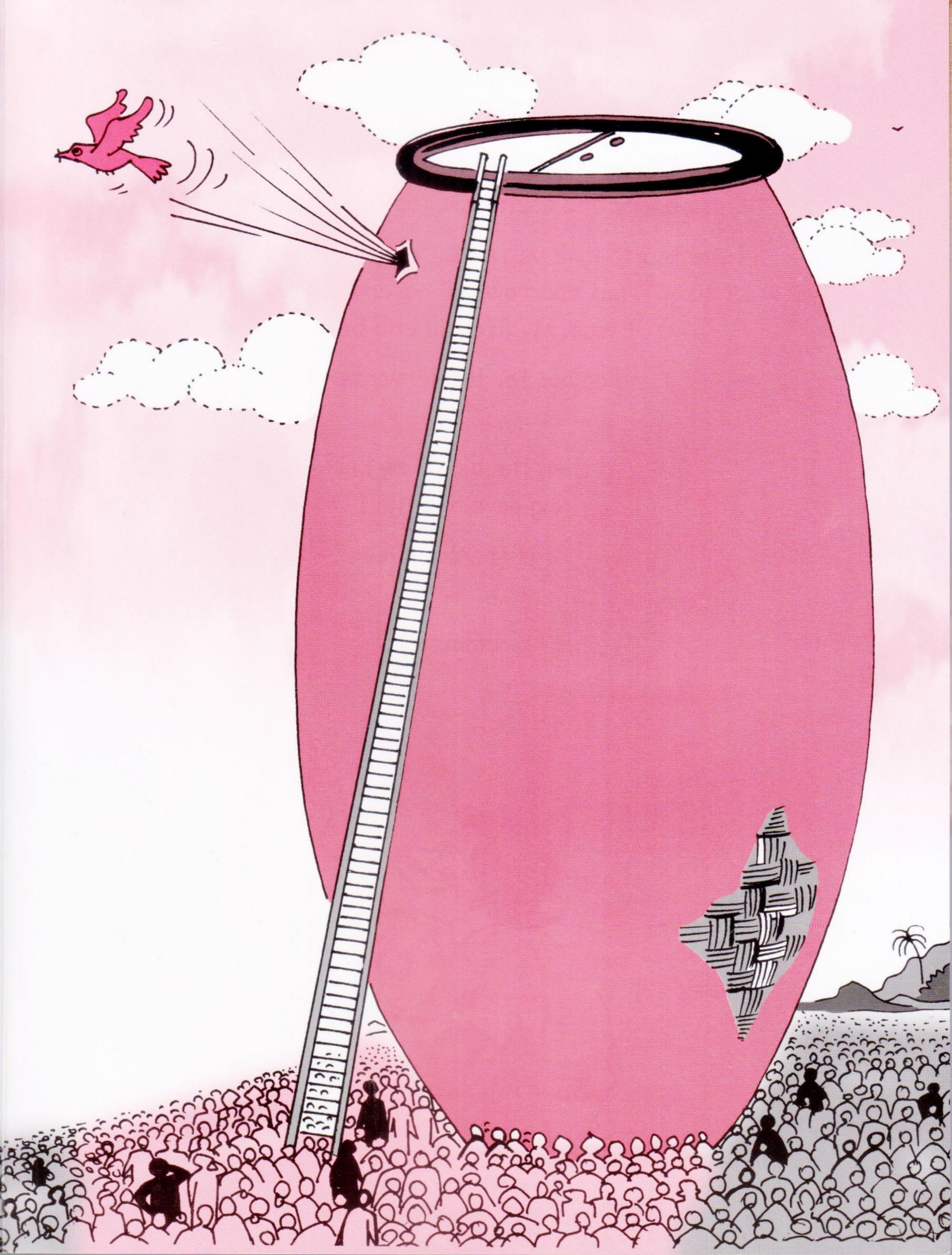
শস্যাগারের দেয়ালের বেশ উঁচুতে বাতাস চলাচলের জন্য একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছিল। একদিন একটি চড়ুই পাখি সেই ছিদ্রটি দেখতে পেল। সে উড়ে ভেতরে ঢুকল এবং ঠোঁটে করে একটি ধানের দানা তুলে নিল। তারপর সে সেই দানাটি নিয়ে তার বাসায় ফিরে গেল...

কবি ক্ষণিকের জন্য থামলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"চড়ুইটি আবার শস্যাগারের ভেতরে উড়ে গেল এবং—সোঁওওওও—আবারও ঠোঁটে একটি ধানের দানা নিয়ে বেরিয়ে এল। সে এই দানাটিও তার বাসায় রেখে এল..."

কবি আবারও থামলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"





"আবারও চড়ুইটি শস্যাগারের ভেতরে উড়ে গেল এবং ঠোঁটে একটি ধানের দানা তুলে নিল। সোঁওওওও! আবারও সে উড়ে তার বাসায় ফিরে গেল..."

কবি তার গল্প বলে চললেন। তিনি বর্ণনা করলেন, কীভাবে চড়ুইটি বারবার শস্যাগারে যাচ্ছিল এবং প্রতিবারই সেখান থেকে একটি করে ধানের দানা বের করে আনছিল।

শীঘ্রই রাজার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করল। "তারপর? তারপর কী হলো?" তিনি বলে উঠলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, "ওই চড়ুইটা তো ধানের দানা নিয়ে এভাবে আসা-যাওয়া করা কখনোই থামাবে না। এই গল্প শেষ হওয়ার আগেই তো আমার জীবনাবসান ঘটবে!"

তিনি নিজের কান চেপে ধরলেন এবং ভৃত্যদের ডাকলেন। "এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসো!" তিনি গর্জন করে উঠলেন।

কবি তখন বলছিলেন, "এরপর পাখিটি উড়ে তার বাসায় ফিরে গেল..." এই বলে তিনি থেমে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা তাকে সেই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলেন।

কবি অত্যন্ত সুচারু ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় রাজাকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করলেন, কিন্তু রাজা তাকে থামিয়ে দিলেন।

"দূর হও এখান থেকে! দূর হ, দূর হ!" তিনি আদেশ দিলেন।

তাই, কবি আর একটিও কথা না বলে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। আর রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ভারতের একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

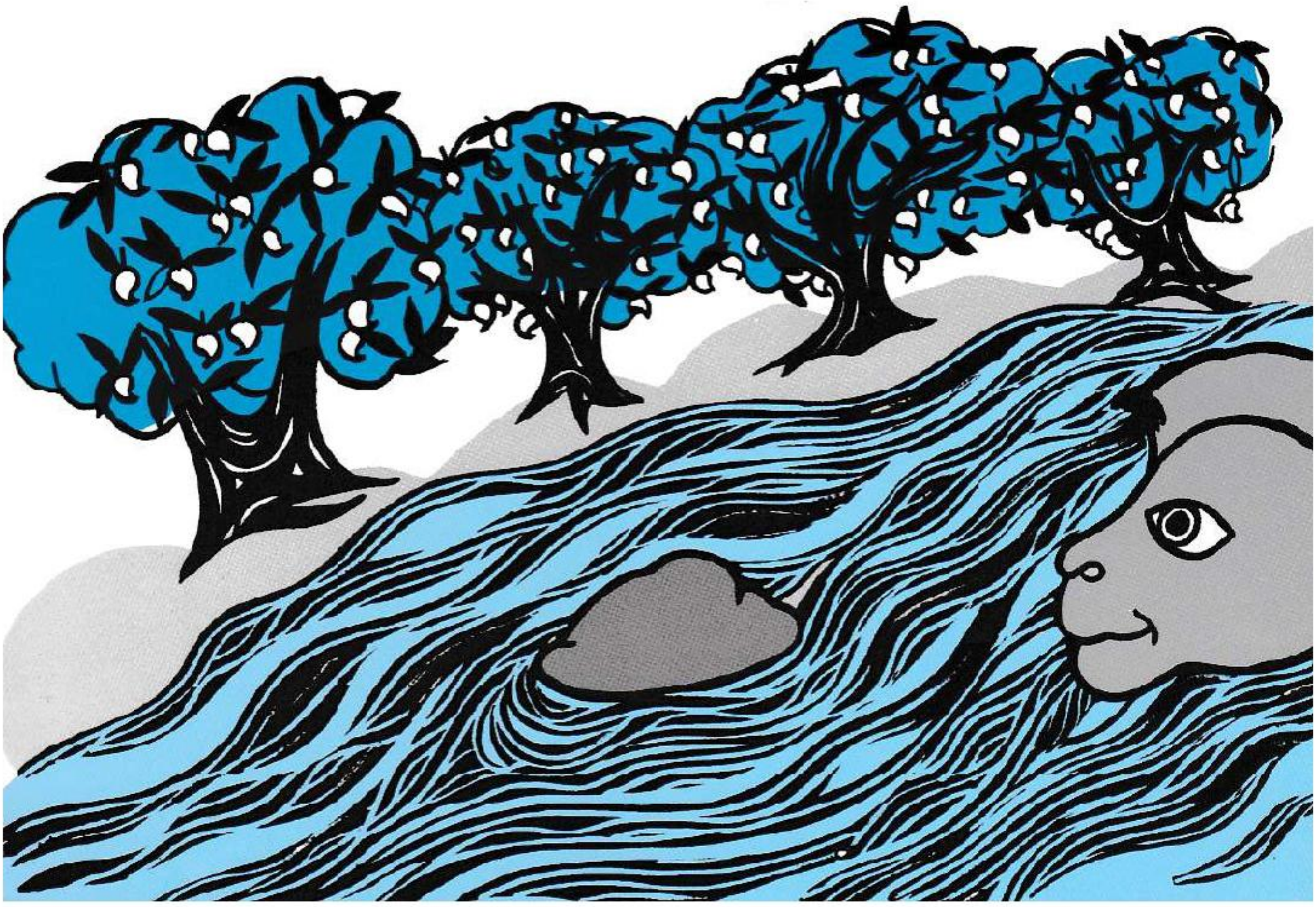
নন্দরিয়া ও কুমির

নন্দরিয়া—এক সাহসী ছোট্ট বানর—সে একা বুনো ও বিপদসংকুল অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসত।

একদিন সে এমন এক বিশাল নদীর দেখা পেল, যার ঠিক মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ। কী চমৎকার সেই দ্বীপ! দ্বীপটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছিল আমগাছে ভরা। আমগাছের পাতার আড়ালে লোভনীয় পাকা আমগুলো উঁকি দিচ্ছিল।

"ইশ, ওই আমগুলো যদি একবার চেখে দেখতে পারতাম!" মনে মনে ভাবল নন্দরিয়া। "কিন্তু নদীটা যে বড্ড চওড়া আর তার স্রোতও খুব তীব্র। আমি ওপারে যাব কী করে?"

হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, দ্বীপে যাওয়ার প্রায় মাঝপথে নদীর জলের ওপর একটি পাথরের চাঁই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আহা! ... এক বিশাল লাফে নন্দরিয়া সেই পাথরের ওপর গিয়ে পৌঁছাল। সেখান থেকে আরেকটি লাফ দিয়ে সে পৌঁছে গেল দ্বীপে। কী বিপদসংকুল এক পথ! তবে সাহসী ছোট্ট নন্দরিয়ার কাছে তা মোটেও ভীতিজনক ছিল না!



নন্দরিয়া একটি গাছে চড়ে একটি আম পেড়ে খেল। কী সুস্বাদু সেই আম! সে আরেকটি আম খেল। সেটির স্বাদ তো আরও চমৎকার! নন্দরিয়া মন ভরে আম খেল। তারপর সে লাফ দিয়ে আবার সেই পাথরের ওপর ফিরে এল এবং সেখান থেকে নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। এরপর সে বাড়ি ফিরে গেল।

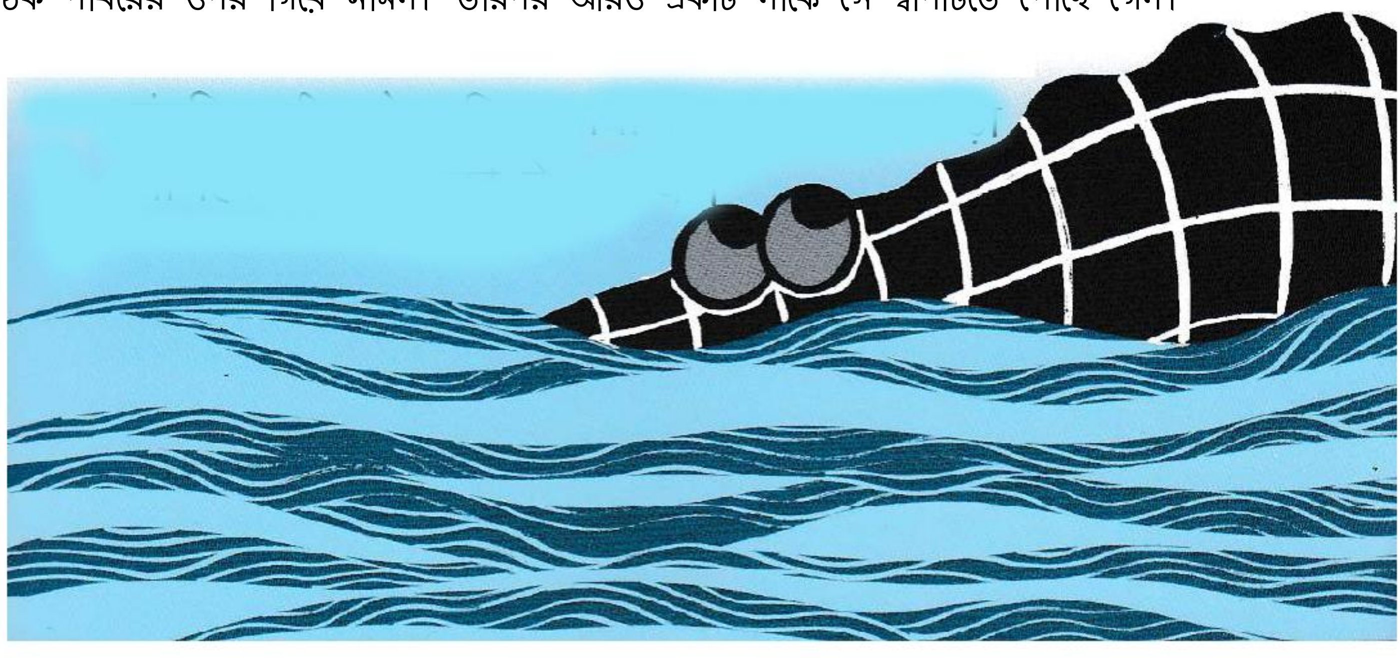
সে রাতে নন্দরিয়া তার বাবা-মাকে সেই দ্বীপটি এবং সেখানকার চমৎকার সব ফলের কথা সবিস্তারে শোনাল। "চলো আমার সাথে, তোমরাও গিয়ে আম খেয়ে এসো একদিন..." সে তাদের আমন্ত্রণ জানাল। "আমাদের হাতে একদম সময় নেই," তারা উত্তর দিল। নন্দরিয়ার বন্ধুরাও তার প্রস্তাবে রাজি হলো না। "ওই দ্বীপটা যে বড্ড বেশি দূরে," তারা বলল।

নন্দরিয়া তাদের কাউকেই রাজি করাতে পারল না। তাই যখনই সে দ্বীপে আম পাড়তে যেত, সে সব সময় একাই যেত। এতে কি তার মন খারাপ হতো? ভয় হত? একদমই না। এমন সাহসী ছোট্ট বানরের কাছে গভীর অরণ্যের কোনো ভয়ই ছিল না।

কিন্তু বিপদ যে ওত পেতে ছিল! একটি কুমির নন্দরিয়ার এই আসা-যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছিল। "ওহ! একটি ছোট্ট বানর একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী চমৎকার এক ভোজ হবে!" কুমিরটি মনে মনে ভাবল। সে বানরটিকে খেয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। তার ধূর্ত মস্তিষ্কে একটি পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠল। সে নন্দরিয়ার আসার অপেক্ষায় রইল।

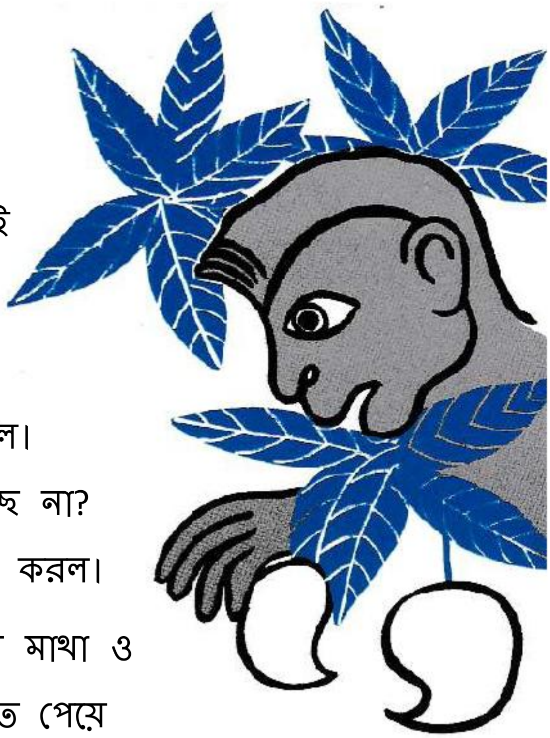
খারাপ আবহাওয়ার কারণে নন্দরিয়াকে কয়েক দিন বাড়িতেই থাকতে হলো। এরপর যখন সে আবার আম পাড়তে গেল, তখন এক বড়সড় ধাক্কা খেল! বৃষ্টির কারণে নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল! জলের উচ্চতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, পাথরের চাঁইটির উপরিভাগ প্রায় জলের নিচেই তলিয়ে গিয়েছিল।

"আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে," নন্দরিয়া মনে মনে ভাবল। "নইলে, এই তীব্র স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!" সে তার সমস্ত শক্তি এক করে এক বিশাল লাফ দিল। কী দারুণ সাফল্য! সে ঠিক পাথরের ওপর গিয়ে নামল। তারপর আরও একটি লাফে সে দ্বীপটিতে পৌঁছে গেল।



ফিরে আসতে পেরে সে কী যে রোমাঞ্চিত বোধ করছিল! সে খুব ধীরস্থিরভাবে ভোজ সারল। সে সবচেয়ে পাকা ফলগুলো বেছে নিল। প্রতিটি কামড়ের স্বাদ সে পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করল।

আর এখন সময় হলো বাড়ি ফেরার। নন্দরিয়া পাথরের ওপর লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু একি! পাথরটি যেন অন্যরকম মনে হলো! সে খুব সতর্কতার সাথে পাথরটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। হুমম... সে যখন এসেছিল, তার চেয়ে পাথরটি এখন অনেক বড় দেখাচ্ছে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদীর জলরাশির ওপর এটি এখন অনেক উঁচুতে উঠে আছে। "কেউ নিশ্চয়ই আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে!" সে বুঝতে পারল। কিন্তু কে? সে তা জানার চেষ্টা করল।



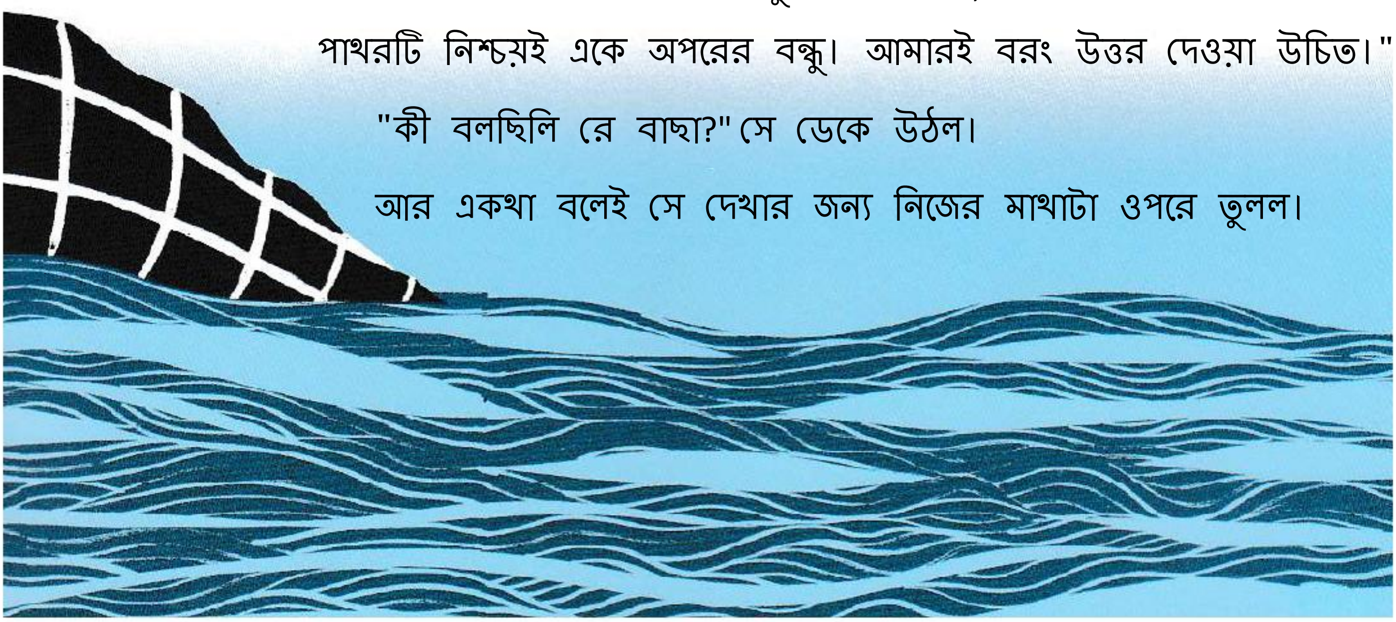
"ভাই পাথর! আজ তোমার কী খবর?" সে ডেকে উঠল। কোনো উত্তর এল না। "তুমি কেন আমার সাথে কথা বলছ না? আমাদের বন্ধুত্ব কি তবে শেষ হয়ে গেল, ভাই?" সে জিজ্ঞেস করল।

কুমিরটি পাথরের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে ছিল; তার মাথা ও লেজ ছিল জলের নিচে। নন্দরিয়ার ডাক অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়ে সে তার মাথাটা সামান্য একটু ওপরে তুলল। এবার সে নন্দরিয়ার ডাক স্পষ্টভাবে শুনতে পেল: "ভাই পাথর, ভাই পাথর!"

লোভের বশে নির্বোধ হয়ে কুমিরটি ভাবল, "ওহ! এই বানর আর পাথরটি নিশ্চয়ই একে অপরের বন্ধু। আমারই বরং উত্তর দেওয়া উচিত।"

"কী বলছিলি রে বাছা?" সে ডেকে উঠল।

আর একথা বলেই সে দেখার জন্য নিজের মাথাটা ওপরে তুলল।



এবার নন্দরিয়া সব বুঝতে পারল। "নমস্কার, মিস্টার কুমির!" সে ডেকে উঠল। "আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?" কুমিরটির ফন্দি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল! সে ভীষণ রেগে গেল! "আমি তোকে খেয়েই ফেলব!" সে গর্জন করে উঠল।

"আমি কীভাবে পালাব?" নন্দরিয়া ভাবতে লাগল। কিন্তু সে তো ছিল নির্ভীক। সে চটজলদি চিন্তা করল এবং একটি ফন্দি আঁটল।

"ঠিক আছে, মিস্টার কুমির!" সে বলল। "আপনি আমাকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। আমি সোজা আপনার মুখের ভেতর লাফ দেব। দয়া করে আপনার মুখটা যতটা সম্ভব বড় করে হাঁ করুন। তবে চোখ দুটো বন্ধ রাখবেন, পাছে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।"

সেই নির্বোধ কুমিরটি তার চোখ বন্ধ করল এবং মুখটা বিশাল করে হাঁ করল। নন্দরিয়া লাফ দিল—ওপরে, আরও ওপরে, অনেক ওপরে—এবং কুমিরটির চোয়াল অনায়াসেই পার হয়ে গেল। সে গিয়ে পড়ল কুমিরটির পিঠের ঠিক মাঝখানে এবং সেখান থেকে এক লাফে নদীর তীরে গিয়ে উঠল।

"ওহ, মিস্টার কুমির! আপনি তো আমাকে ধরতেই পারলেন না!" সে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠল এবং দৌড়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

একটি জাতক কাহিনী



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

চার বন্ধু



একদা একটি কচ্ছপ, একটি কাক, একটি ইঁদুর এবং একটি হরিণ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। তারা প্রতিটি মুহূর্ত একে অপরের সাথে কাটাত; কেবল খাবারের সন্ধানে বের হওয়ার সময়টুকুতেই তারা আলাদা হতো। কাক, ইঁদুর এবং হরিণ খাবারের খোঁজে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়াত, আর কচ্ছপটি তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি ঝোপঝাড় ও ঘাস-লতাপাতার মধ্যেই খাবার খুঁজে নিত।

এক সন্ধ্যায় কাক, কচ্ছপ এবং ইঁদুর—এই তিনজন হরিণের জন্য অপেক্ষা করছিল; কারণ হরিণটি তখনো খাবার সংগ্রহ করে ফিরে আসেনি। "নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে!"—তিন বন্ধু দুশ্চিন্তা করতে লাগল।

কাকটি বলল, "আমি গিয়ে চারপাশটা একটু দেখে আসি।" এই বলে সে হরিণের খোঁজে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে তার বন্ধুকে দেখতে পেল। কিন্তু পরিস্থিতিটা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না!



ঘটনাটি কী তা দেখতে কাকটি নিচে নেমে এল। সর্বনাশ! বেচারা হরিণটি এক শিকারির জালে আটকা পড়েছিল! কাকটি দ্রুত অন্যদের কাছে ফিরে এল। সে তাদের সেই দুঃসংবাদটি জানাল।

"আমাদের হরিণকে উদ্ধার করতেই হবে!" ইঁদুরটি বলে উঠল। "আমি জালটা কেটে হরিণকে মুক্ত করে দেব!" সে লাফ দিয়ে কাকের পিঠে চড়ে বসল। কাকটি তাকে উড়িয়ে ঠিক সেই জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে হরিণটি আটকা পড়েছিল।

ইঁদুরটি মনোযোগ দিয়ে জালটি কাটতে লাগল এবং অবশেষে জালটি কেটে ফেলল। সে হরিণটিকে জালের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করল। ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে এসে হাজির হলো কচ্ছপটি!

"ওহ, সর্বনাশ! তুমি কেন আমাদের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এখানে চলে এলে?" ইঁদুরটি জিজ্ঞেস করল। "শিকারিরা যদি এখানে চলে আসে, তবে কাকটি উড়ে পালাবে, হরিণটি দৌড়ে পালাবে, আর আমি কোনো গর্তের ভেতর লুকিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমি তো আটকা পড়ে যাবে।"

"হরিণ বিপদে পড়েছে জেনে আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না," কচ্ছপটি উত্তর দিল। "তাই আমাকে আসতেই হলো।"





তারা যখন কথা বলছিল, ঠিক তখনই একজন শিকারি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। এক লাফে হরিণটি চোখের আড়াল হয়ে গেল। ইঁদুরটি কাছেই থাকা একটি গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর কাকটি উড়ে পালাল।

বেচারা কচ্ছপ! সে আটকা পড়ে গেল। শিকারি কিছু লম্বা ঘাস ছিঁড়ে এনে তা দিয়ে একটি দড়ি তৈরি করল। তারপর সে কচ্ছপটির চার পা একসঙ্গে বেঁধে ফেলল। সেই ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণীটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে বাড়ির পথে রওনা হলো। বন্ধুরা তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিণটি বলল, "আমাদের কচ্ছপকে উদ্ধার করতেই হবে!"

ইঁদুরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে হরিণটিকে বলল, "তুমি এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকার ভান করো। এমনভাবে পড়ে থাকবে যেন মনে হয় তুমি মারা গেছ।"



সে কাকটিকে বলল, "তুমি হরিণটির পিঠে গিয়ে বসো এবং এমন ভান করো যেন তাকে ঠোকর দিচ্ছ। শিকারি তোমাকে দেখতে পাবে এবং কচ্ছপটিকে নিচে নামিয়ে রাখবে। যখন সে তোমার কাছে এগিয়ে আসবে, তখন আমি দড়িটি কেটে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দেব।"

তারা সবাই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল। শিকারি পথের ধারে হরিণটিকে শুয়ে থাকতে দেখল। একটি কাক তার শরীরে ঠোকর দিচ্ছিল। শিকারি কচ্ছপটিকে নিচে নামিয়ে রাখল এবং হরিণটির দিকে এগিয়ে গেল। তখন ইঁদুরটি দড়িটি কেটে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দিল। শিকারি যখন হরিণটির খুব কাছে পৌঁছাল, তখন সেটি লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে পালাল। কাকটিও উড়ে গেল। শিকারি বিস্ময়ের সাথে তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। আর যখন সে কচ্ছপটিকে তুলে নেওয়ার জন্য ফিরে তাকাল, দেখল সেটিও উধাও হয়ে গেছে!

পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

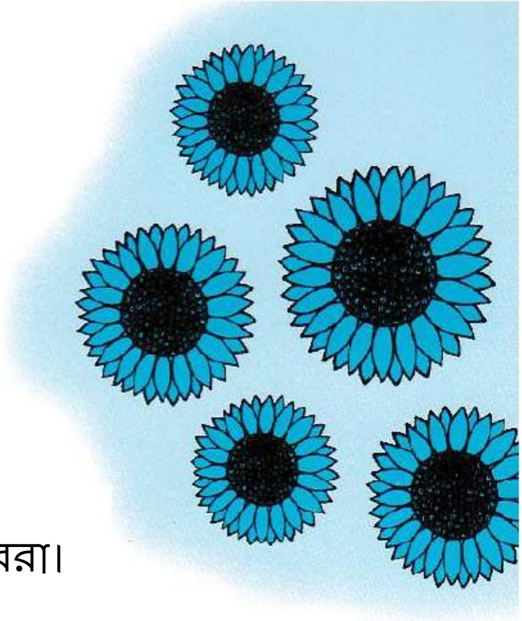
P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?



স্বচ্ছ জলের বিন্দুকণায় শোভিত,
গোলাকার পাতাগুলো ভেসে থাকে শান্ত সমাহিত।
আর তাদের ঠিক ওপর, বলিষ্ঠ ডাঁটার আগায়,
নিখুঁত সব ফুল সে ফোটায়।

ফুলগুলো সব বিশাল আর নজরকাড়া,
তূর্য-আকৃতির, দারুন লাল রঙ।
মৃদু হাওয়ায় তারা দোলে,
তাদের থেকে উঁকি দেয় বাইরে সরু,লম্বা পুংকেশরেরা।

স্তরে স্তরে পাপড়িরা করে ঝলমল,
সোনালি হলুদ কিংবা গাঢ় কমলা।
একে একে গেঁথে তৈরী হয় মালা।
এরই সাজসজ্জায় হয়ে ওঠে আলো, উৎসবমুখর ঘরগুলো।

বিশাল, হলুদ আর মৌমাছির গুঞ্জনে মুখর—
সূর্যের পানে চেয়ে সারাদিন!
আমাদের দেয় বীজ—মৌমাছিরা যা করে পান—
তার থেকে বানায় মধু, সুমধুর!

ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হই আমরা
স্তরে স্তরে সাজানো পাপড়ি ধরি মেলে
ছড়াই আমাদের মিষ্টি সুবাস **যখন**,
কাঁটায় ভরা ডাঁটাগুলো আমাদের রক্ষা করে তখন।

হাসছে দেখো সাদা সাদা ফুল
গোছা গোছা, সব ডালে ডালে।
লতায় লতায় ফুটে থাকে ওরা,
কী সুবাসে মাতায় রাতের বাতাস তারা!

গোলাপ, জবা, গাঁদা, সূর্যমুখী, পদ্ম, জুঁই





তার আছে ডানা
তবু উড়তে সে পারে না
আছে তার পা মাত্র দুটি
তবু সে ছোটে যেন, ঘোড়াটি

হলুদ পা, হলুদ ঠোঁট
হলুদ বলয়— চোখের চারিপাশে
শিস দেয়, আর করে কিচিরমিচির
ডাকে কর্কশ স্বরে আর গর্জন করে প্রচুর
সে তোমার ডাকে সাড়া দেয়

অন্ধকারে শিকার ধরার সময় চিঁ চিঁ চেঁচায়
ভোরের আলোটি ফুটলে পরে, ফিরে আসে বাসায়
গোল গোল চোখ দুটি তার ঘুমে ঢলে যায়

মাথার ওপর একটি লাল ফুল— কে তা ছিঁড়ে নেবে?
পায়ের ওপর একটি হলুদ কাঁটা— কে তা সরিয়ে দেবে?
সকালে ঘুম ভাঙানোর ডাক—কে-ই বা তা এড়াতে পারে?
লড়াইয়ের ময়দানে এক দুর্ধর্ষ প্রতিযোগী—কে-ই বা তাকে হারাতে পারে?

আহ! আমার এই পাখা—
সহস্র উজ্জ্বল চোখ তার মেলে
রাজকীয় নৃত্যের তালে!
ঝিকিমিকি সবুজ আর নীল রঙের ছটায়
পালকগুলো সব দুলে কাঁপায়।



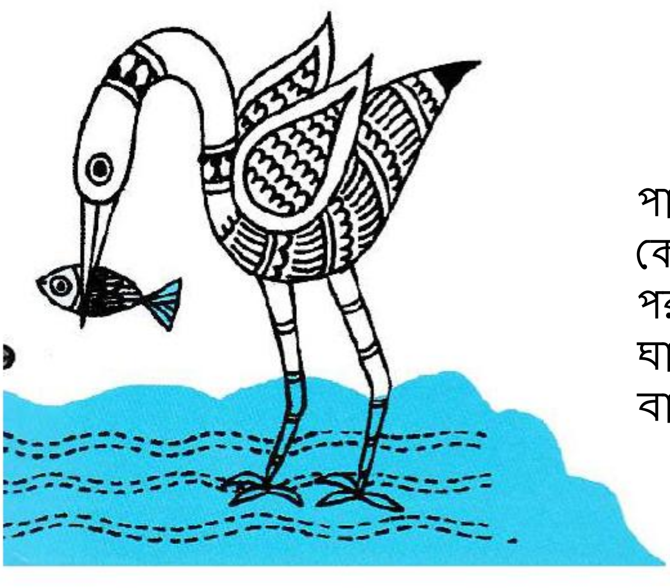


ওড়ার জন্য আমার আছে শক্তপোক্ত ডানা
হাঁটার জন্য আছে মজবুত পা
সাঁতার কাটার জন্য আছে শক্ত
পায়ে আঙ্গুল জোড়া দেওয়া
গাওয়ার জন্য আছে জোরালো এক কন্ঠস্বর—
শুধু আমি গাই 'প্যাক-প্যাক-প্যাক প্যাকর'।

এই কালো রূপসীটি গায় মিষ্টি সুরে
সুমধুর গান- শোনা যায় দূর থেকে দূরে;
কিন্তু তোমায় যেই না দেখে, সে চুপ হয়ে যায়
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই
সে আকাশে মিলিয়ে যায়।



তোমাদের যত বার্তা বয়ে নিয়ে যাই আমি বহুদূর
উড়ে আবার ফিরেও আসি আমার পরিবারের কাছে;
ঝাঁকে ঝাঁকে আমরা শুধু থাকি চক্কর দিতে
কিংবা বসি মিনারের নিচে, শস্যদানা খেতে।

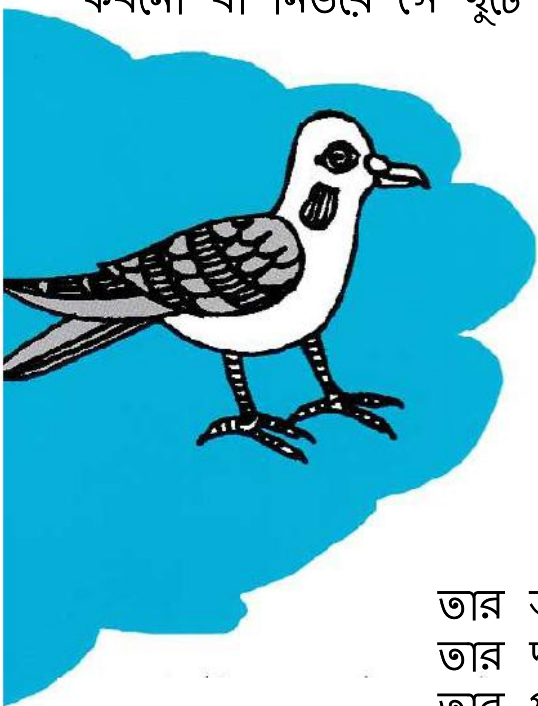


পাতা আর ঘাস কুড়িয়ে বেড়ায় খালি
কেবলই ওড়ে, বা ছোটে এদিক-সেদিক;
পরম যত্নে সে জড়ায় আর বোনে
ঘাস-পাতার সরু সরু আঁশগুলো টেনে—
বাসা গড়া হলে শেষ, ঢোকে লাফ দিয়ে গলে!

দেখো তাকে জলে দাঁড়িয়ে থাকতে—
ঠিক যেন নিশ্চল মূর্তি এক!
হঠাৎই সে বিদ্যুতের গতিতে ডুব দেয় জলে—
ঠোঁটে নিয়ে একটি মাছ উঠে আসে উপরে!



কী অপরূপ তার রূপ!
সবুজ শরীর, ঠোঁট দুটি যেন প্রবালের মতো লাল!
সে শান্ত হয়ে বসত করে গাঁয়ের মাঝে বসে,
কখনো বা নির্ভয়ে সে ছুটে বেড়ায় মাঠের ওপর এসে।



এই যে কালো পোশাক-পরা ইনি—
সারাদিন ধরে খাটেন অবিরাম;
তুমি যদি তাকে দুপুরের দাওয়াত দিলে—
'কা! কা! কা!'—
সে আসে পুরো সদলবলে!

তার আছে ধারালো ও বাঁকানো ঠোঁট,
তার দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর;
তার পালকগুলো শক্ত ও রুক্ষ,
শিকারের সন্ধানে সে চষে আকাশের বক্ষ।

কাক, ঈগল, ময়ূর, টিয়া, কোকিল, পায়রা, সারস,
মোরগ, পেঁচা, ময়না, উটপাখি, বাবুই পাখি, হাঁস



© Katha Jharna 2008
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi **Bengali** Suchandrima Chowdhury
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi **Artist** Uma Krishnaswamy

ছোট ঘোড়াটি ও নদী

অনেকদিন আগে একটি ছোট ঘোড়া তার মায়ের সাথে গাছপালায় ঘেরা এক সুন্দর উপত্যকায় বাস করত। ছোট ঘোড়াটি তার মাকে খুব ভালোবাসত। সে কখনোই তার মায়ের সঙ্গ ছাড়তে চাইত না! দিন হোক বা রাত—যখনই তারা একসাথে থাকত, সে তার মায়ের সাথে একদম লেপ্টে থাকত।

একদিন মা-ঘোড়াটি তার বাচ্চাটাকে খুব আদর করে বললেন, "আমার সোনাটা," তিনি বললেন, "তুমি তো আর এখন একদম বাচ্চা নও! তুমি কবে থেকে কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হবে?"

"আমি এখনই প্রস্তুত!" ছোট ঘোড়াটি বলল। "আমাকে বলো, আমাকে কী করতে হবে!" "খুব ভালো!" তার মা বললেন। তিনি পরম স্নেহে তার বাচ্চার মুখটি চেটে দিলেন।



"শস্যভর্তি এই বস্তাটি নিয়ে মিলে যাও, সেখানে এটি পিষে আটা তৈরি করা হবে।"

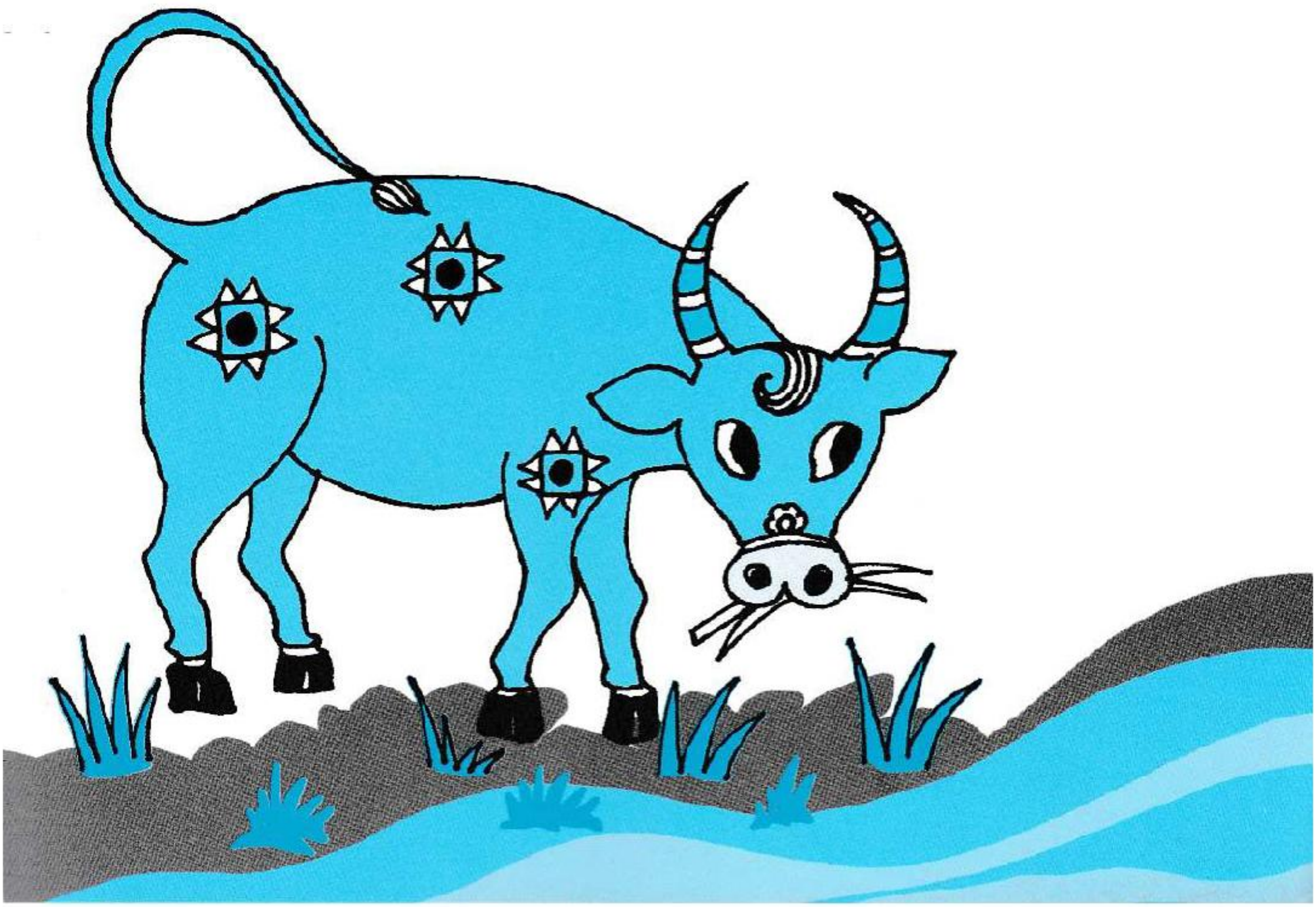
"আচ্ছা মা!" ছোট ঘোড়াটি বলল। বস্তাটি তার পিঠের ওপর তুলে দেওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর সে মিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। "ওহ, সর্বনাশ!" সে বলে উঠল। "এ আবার কী?"

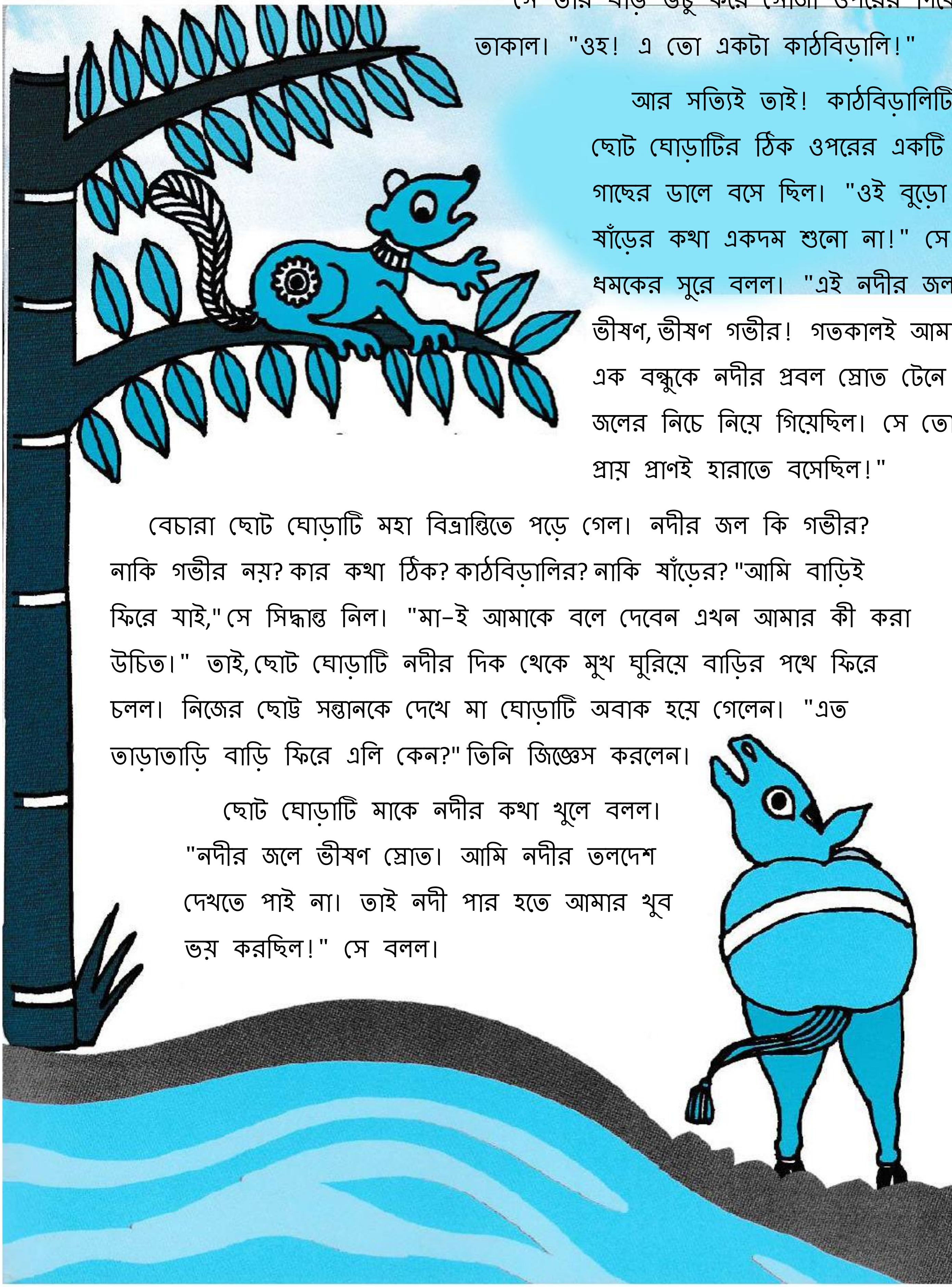
মিলের দিকে যাওয়ার পথটি একটি নদীর ওপর দিয়ে গেছে! ছোট ঘোড়াটি নদীর খরস্রোতা জলের দিকে তাকাল। "আমি কি নদীটি পার হতে পারব?" সে মনে মনে ভাবল।

কাছেই একটি ক্ষেতে একটি ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। "ষাঁড়মশাই! ষাঁড়মশাই!" ছোট ঘোড়াটি ডেকে উঠল। "দয়া করে আমাকে বলুন ষাঁড়মশাই, আমি কি এই নদীটি পার হতে পারব?"

"ভালো করে তাকিয়ে দেখো!" ষাঁড়টি বলল। "এই নদীর জল আমার হাঁটুর ওপরেও ওঠে না। তাহলে তোমার জন্য জল বেশি গভীর হবে কেন?" ছোট ঘোড়াটি সাহস সঞ্চয় করল। সে নদীর জলে পা রাখল। কিন্তু হঠাৎ একটি কন্ঠস্বর বলে উঠল, "দাঁড়াও! হুট করে কোনো কাজ কোরো না!"

"কে ওখানে?" ছোট ঘোড়াটি জিজ্ঞেস করল।





সে তার ঘাড় উঁচু করে সোজা ওপরের দিকে তাকাল। "ওহ! এ তো একটা কাঠবিড়ালি!"

আর সত্যিই তাই! কাঠবিড়ালিটি ছোট ঘোড়াটির ঠিক ওপরের একটি গাছের ডালে বসে ছিল। "ওই বুড়ো ষাঁড়ের কথা একদম শুনো না!" সে ধমকের সুরে বলল। "এই নদীর জল ভীষণ, ভীষণ গভীর! গতকালই আমার এক বন্ধুকে নদীর প্রবল স্রোত টেনে জলের নিচে নিয়ে গিয়েছিল। সে তো প্রায় প্রাণই হারাতে বসেছিল!"

বেচারা ছোট ঘোড়াটি মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। নদীর জল কি গভীর? নাকি গভীর নয়? কার কথা ঠিক? কাঠবিড়ালির? নাকি ষাঁড়ের? "আমি বাড়িই ফিরে যাই," সে সিদ্ধান্ত নিল। "মা-ই আমাকে বলে দেবেন এখন আমার কী করা উচিত।" তাই, ছোট ঘোড়াটি নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ির পথে ফিরে চলল। নিজের ছোট্ট সন্তানকে দেখে মা ঘোড়াটি অবাক হয়ে গেলেন। "এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলি কেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ছোট ঘোড়াটি মাকে নদীর কথা খুলে বলল। "নদীর জলে ভীষণ স্রোত। আমি নদীর তলদেশ দেখতে পাই না। তাই নদী পার হতে আমার খুব ভয় করছিল!" সে বলল।

"তাই নাকি?" মা ঘোড়াটি জিজ্ঞেস করলেন। "আমি তো রোজই যাই। আর সবসময়ই নিরাপদে ফিরে আসি।"

"হ্যাঁ মা। কিন্তু আমি তো বেশ গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি," ছোট ঘোড়াটি বলল। "ষাঁড়মশাই আমাকে বললেন যে, নদীটা মোটেও গভীর নয়। জল নাকি বড়জোর তাঁর হাঁটু পর্যন্ত ওঠে। অথচ কাঠবিড়ালি আমাকে বলল যে, নদীটা নাকি ভীষণ গভীর। নদীর প্রবল স্রোত নাকি তার এক বন্ধুকে প্রায় ভাসিয়েই নিয়ে যাচ্ছিল। এখন আমি কী করব, মা?"

মা ঘোড়াটি মৃদু হাসলেন। "আমাকে বল তো বাছা—ষাঁড়টি লম্বায় কতটা? কাঠবিড়ালিটাই বা কতটা লম্বা? আর তুই-ই বা লম্বায় কতটা?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "এবার নিজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নে। তুই কি নদীটা পার হতে পারবি?"

"ওঃ!" ছোট ঘোড়াটি বলে উঠল এবং আনন্দে লাফিয়ে উঠল। "এবার আমি বুঝতে পেরেছি! নদীটা মোটেও গভীর নয়! অন্তত আমার জন্য তো নয়ই!"

আর তারপর সে হাসিমুখে কলের পথের দিকে রওনা দিল।

চীনের একটি গল্পের অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমাদের বিড়ালছানা



বানু আর ভেনুর একটি বিড়াল ছিল। তারা বিড়ালটিকে কতই না ভালোবাসত আর আদর-যত্ন করত! কিন্তু একদিন তাদের সেই প্রিয় বিড়ালটি হারিয়ে গেল। বানু আর ভেনু বিড়ালটির সব প্রিয় জায়গাগুলোতে খুঁজে দেখল। কিন্তু সে কোথাও ছিল না।

তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিনে... "মিউ, মিউ!"

"আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?" বানু একটি মই নিয়ে উপরে উঠে চারপাশটা ভালো করে দেখল। আহা! "ও এই যে এখানে, ভেনু! আমাদের বিড়ালটা চিলেকোঠায় বসে আছে!" সে ডেকে বলল। "আর জানো কী? সাথে পাঁচ-পাঁচটা বিড়ালছানাও আছে! এসো, দেখে যাও!"

ভেনু মই বেয়ে উপরে উঠল। আর সেখানে দেখা গেল তাদের সেই বিড়ালটিকে—আর তার পাশে গা ঘেঁষে বসে ছিল তার বিড়ালছানাগুলো।



বানু আর ভেনুর গর্বের সীমা রইল না! তারা তাদের বাড়িতে আসা প্রতিটি দর্শনার্থী আর অতিথিকে বিড়ালছানাগুলো দেখাত। সবাই সেগুলো দেখে খুব খুশি হতো!

বিড়ালছানাগুলো খুব দ্রুত বড় হতে লাগল। তারা সারা বাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াত। তারা খেলা করত আর নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করত। তারা একে অপরের ওপর চড়ে পাহাড়ের মত হয়ে থাকত। তারা হাঁড়ি-পাতিলের ভেতরে লুকিয়ে পড়ত আর গড়াগড়ি খেত।

একদিন বানুর মা বলে উঠলেন, "এই বাড়িতে বড্ড বেশি বিড়ালছানা হয়ে গেছে!" এরপর তিনি বানু আর ভেনুকে বললেন, তাদের নিজেদের জন্য কেবল একটি বিড়ালছানা বেছে নিতে এবং বাকিগুলো অন্যদের দিয়ে দিতে। মন ভেঙে গেলেও, তারা চারটি বিড়ালছানা তাদের বন্ধুদের দিয়ে দিল। নিজেদের জন্য তারা কেবল একটি ধূসর রঙের বিড়ালছানা রেখে দিল।

তারা সেই বিড়ালছানাটিকে কতই না আদর করত! তারা তাকে নিয়মিত খেতে দিত এবং পান করার জন্য সবসময় পরিষ্কার জল রেখে দিত। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা তার সাথে খেলা করত। এমনকি রাতে ঘুমানোর সময়ও তারা তাকে নিজেদের বিছানায় নিয়ে যেত।

একবার বানু আর ভেনু সেই ধূসর বিড়ালছানাটিকে নিয়ে খড়ের গাদায় ভরা একটি মাঠে খেলতে গেল। সোনালি রঙের খড়গুলো সেখানে উঁচু হয়ে স্তূপ করে রাখা ছিল। খড়ের আলগা আঁশগুলো মৃদু বাতাসে দুলছিল।

তারা যখন বিড়ালছানাটিকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তখন সে গুটিসুটি মেরে মাটির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল। এই নতুন জায়গায় না জানি কী বিপদ অপেক্ষা করছে! তবে শীঘ্রই সে খেলা শুরু করে দিল। সে লাফ দিয়ে খড়ের গাদার ওপর উঠে গেল এবং সেখান থেকে পিছলে নিচে নেমে এল।

সে তার থাবা দিয়ে খড়ের একটি আঁশ আঁকড়ে ধরল এবং সেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। নিজেদের বিড়ালছানাটিকে এভাবে আনন্দে মেতে উঠতে দেখে বাচ্চাগুলো হাসতে লাগল। আরও অনেক বাচ্চা সেখানে ছুটে এল সেই দৃশ্য দেখতে আর হাসাহাসি করতে। এরপর তারা সবাই মিলে খেলা শুরু করে দিল।

তারা কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল? না! তবে ততক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিড়ালছানাটি কোথায়? বাচ্চাগুলো তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সেই ধূসর রঙের বিড়ালছানাটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বানু আর ভেনু কান্না কিছুতেই থামাতে পারছিল না। "আহা, বেচারা কিটি!"—তারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কে তাকে খেতে দেবে, দুধ খাওয়াবে? সে কোথায় ঘুমাবে? কীভাবে সে শীত থেকে বাঁচবে? বাড়িতে ফিরে তাদের মন থেকে এই প্রশ্নগুলো একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের মা তাদের শান্ত করে বললেন, "তোমাদের বিড়ালছানাটি ঠিকই নিজের পথ খুঁজে ফিরে আসবে!"



বাচ্চারা সন্ধ্যার পড়াশোনার জন্য তাদের বই নিয়ে বসল। কিন্তু তাদের মন পড়ে রইল সেই ছোট্ট ধূসর বিড়ালছানাটির কাছেই।

হঠাৎই ঘরের এক কোণে, মেঝের ওপর দিয়ে একটি টুপি নড়তে শুরু করল। "ওরে বাবা, বাঁচাও! একটা টুপি হেঁটে যাচ্ছে!"—বানু চিৎকার করে উঠল। সে আর ভেনু দৌড়ে তাদের মায়ের কাছে গেল। তিনজন মিলে সেই টুপিটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখন তাদের মা মুচকি হাসলেন।

"ওটা কী? টুপির আড়ালে আমি তো ধূসর রঙের কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি!"—তিনি বললেন। একটি ধূসর লেজের আগা আলতোভাবে এদিক-ওদিক নড়ছিল। "ওহ! ওটা তো আমাদের কিটি!"—বানু বলে উঠল। সে দৌড়ে বিড়ালছানাটির কাছে গেল এবং খুব সাবধানে টুপিটি তুলে ধরল। সে বিড়ালছানাটিকে কোলে তুলে নিল এবং আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি কি এতক্ষণ এখানেই লুকিয়ে ছিলে?"—সে আদুরে গলায় বলল। তারপর একটু বকুনি দিয়ে বলল, "জানো, আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি!" ভেনু আলতো করে বানুর কাছ থেকে বিড়ালছানাটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। সে বিড়ালছানাটিকে নিজের খুব কাছে ধরে ফিসফিস করে বলল, "আমি খুব খুশি যে তুমি হারিয়ে যাওনি!"



রাশিয়ার একটি গল্পের অবলম্বনে রচিত

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

জাদুর ঢোল

অনেক কাল আগের কথা, জাপানে জেঙ্কোরা নামের এক বালক বাস করত। জেঙ্কোরার কাছে ছিল একটি জাদুর ঢোল।

যখন সে ঢোলের এক পাশে আঘাত করে বলত, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!", তখন তার নাক লম্বা হয়ে যেত। আর যখন সে ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করে বলত, "ছোট নাক, ছোট নাক!", তখন তার নাক ছোট হয়ে যেত।

অনেকেই তাদের নাক পরিবর্তন করার আশায় জেঙ্কোরার কাছে আসত। আর সেও সানন্দে তাদের সাহায্য করত।

কেউ যদি লম্বা নাক চাইত, তবে সে ঢোলের সেই পাশে আঘাত করত এবং মন্ত্রের মতো আওড়াত, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" আর কেউ যদি ছোট নাক চাইত, তবে সে ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করত এবং আওড়াত, "ছোট নাক, ছোট নাক!" সে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢোল বাজাতে ও মন্ত্র আওড়াতে থাকত, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি বলে উঠত, "থামাও!"



মাঝে মাঝে কেউ কেউ "থামাও!" বলতে ভুলে যেত। তখন জেঙ্কোরা—যে ছিল এক চঞ্চল বালক!—ঢোল বাজানো চালিয়েই যেত। একবার তো একজনের নাক ঢোলের কাঠির চেয়েও বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিল!

একদিন জেঙ্কোরা ভাবল, "আমার নাক কতদূর পর্যন্ত লম্বা হতে পারে?" এই ভেবে সে ঢোলের এক পাশে আঘাত করতে করতে বলতে শুরু করল, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" দেখতে দেখতেই তার নাক তার হাতের সমান লম্বা হয়ে গেল!

জেঙ্কোরাকে থামানোর আর কোনো উপায় ছিল না। সে মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং ঢোল বাজিয়েই চলল। "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" তার নাক বাড়তে বাড়তে একটি গাছের সমান উঁচু হয়ে গেল।

"লম্বা নাক, লম্বা নাক!" তার নাক পাহাড়-পর্বতের চেয়েও উঁচু হয়ে গেল।

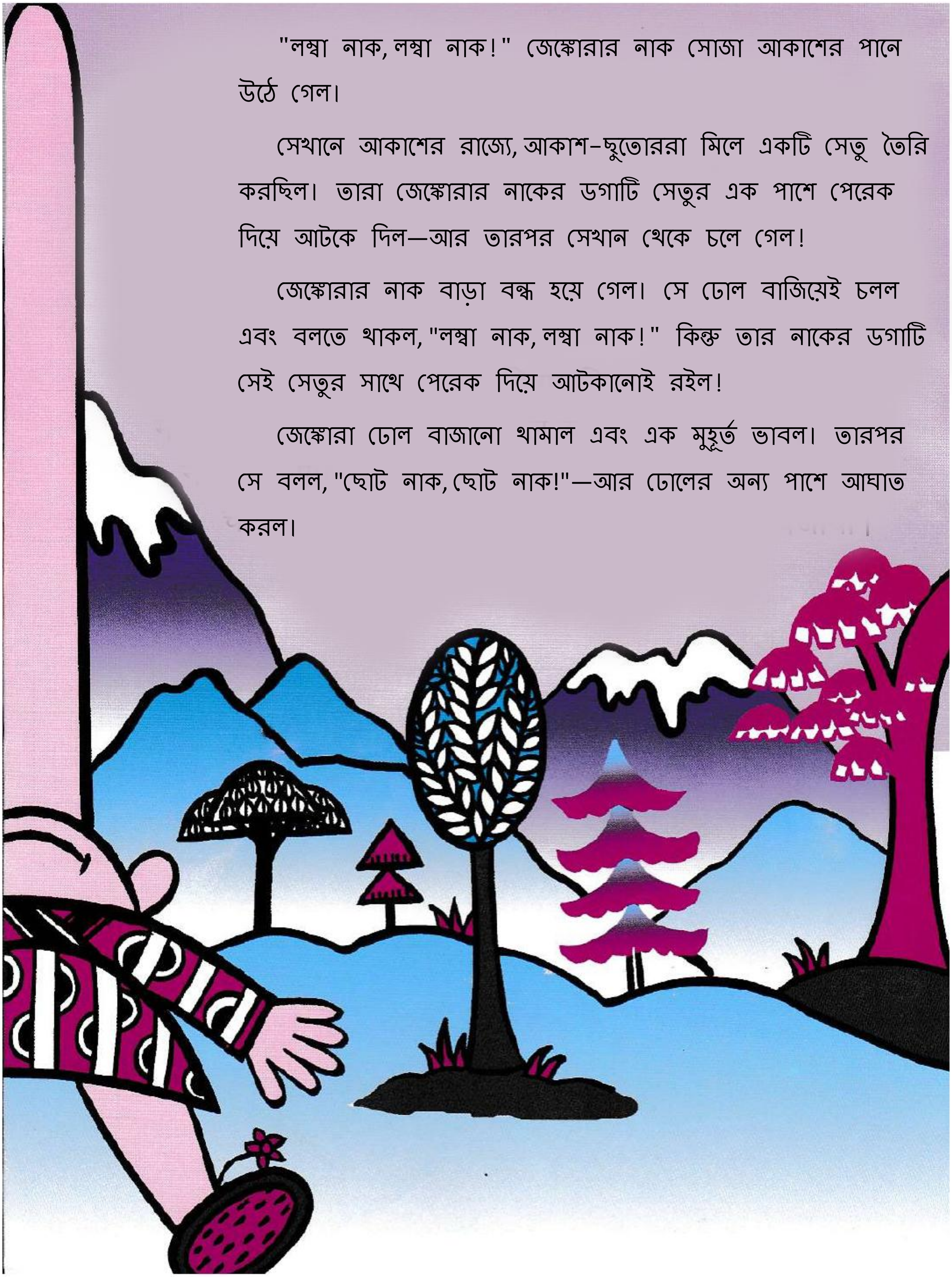


"লম্বা নাক, লম্বা নাক!" জেঙ্কোরার নাক সোজা আকাশের পানে উঠে গেল।

সেখানে আকাশের রাজ্যে, আকাশ-ছুতোররা মিলে একটি সেতু তৈরি করছিল। তারা জেঙ্কোরার নাকের ডগাটি সেতুর এক পাশে পেরেক দিয়ে আটকে দিল—আর তারপর সেখান থেকে চলে গেল!

জেঙ্কোরার নাক বাড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে ঢোল বাজিয়েই চলল এবং বলতে থাকল, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" কিন্তু তার নাকের ডগাটি সেই সেতুর সাথে পেরেক দিয়ে আটকানোই রইল!

জেঙ্কোরা ঢোল বাজানো থামাল এবং এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর সে বলল, "ছোট নাক, ছোট নাক!"—আর ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করল।



এবার তার নাক ছোট হতে শুরু করল। কিন্তু নাকের ডগাটি তো আর নিচে নেমে এল না! জেঙ্কোরা এবং তার ঢোলটি ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উপরে উঠে যেতে লাগল!

অবশেষে জেঙ্কোরা সেই আকাশ-সেতুটির কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সে তার নাক থেকে পেরেকটি সজোরে টেনে বের করে আনল। মুহূর্তের জন্য সে যেন শূন্যে ভেসে রইল... তারপরই সে নিচে পড়তে শুরু করল—আকাশ ফুঁড়ে, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে, গাছপালা পেছনে ফেলে...

আকাশ-সেতুটির ঠিক নিচেই ছিল একটি মাছের পুকুর। ঝপাং! জেঙ্কোরা সেই পুকুরে গিয়ে পড়ল। সে একেবারে তলদেশে ডুবে গেল। তার চারপাশ ঘিরে ছিল নানা রঙের ঝলমলে মাছেরা। কৌতূহলবশত তারা সাঁতরে তার খুব কাছে চলে এল।

জেঙ্কোরার হাত থেকে তার ঢোলটি খসে পড়ল। তার শরীরের রূপ বদলে যাচ্ছিল! তার দুই হাত রূপান্তরিত হলো পাখনায়! তার দুই পা জোড়া লেগে তৈরি হলো একটি লেজ! এরপর সে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

আজও সেই পুকুরের মাছগুলোকে "জেঙ্কোরা মাছ" নামেই ডাকা হয়।

একটি জাপানি লোককথা



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

কবি এজুমালাই

এজুমালাই বাস করত কল্পনার এক জগতে। সে জানালার পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, "কী করছ এজুমালাই?" সে কবিতার ছন্দে উত্তর দিত:

দেখো, প্রজাপতিটা কেমন উড়ে গেল!

ইঁদুরের দল প্রায়ই ছোটে—তবে কি শুধুই মজার জন্য?

অন্য ছেলেরা তাকে খেপাত। তাকে দেখলেই তারা চেঁচিয়ে উঠত, "ওই আসছে কবি এজুমালাই!" কিন্তু শব্দের জাদুতে ছবি আঁকতে সে কখনোই ক্লান্ত হতো না।



একদিন এজুমালাই তার দিদিমার বাড়ি বেড়াতে গেল। পথের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাছপালা, বাগান আর পাখিরা... আহা! কী অপূর্ব সুন্দর!

সে একটা তালগাছের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই সে গেয়ে উঠল—

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

সে আরও এগিয়ে চলল। ওহ! ওখানে তো একটা পেঁচা! এজুমালাই গেয়ে উঠল—

বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

হঠাৎ সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে গেয়ে চলল—

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা! বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

আরও কিছুটা এগিয়ে সে দেখল একটা কুকুর মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো বুনো জন্তু—একটা শেয়াল!



চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!

কী এক অলৌকিক ব্যাপার! এজুমালাইয়ের মুখ থেকে কবিতার পঙক্তিগুলো যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছিল।

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!

সে হাঁটছিল আর গাইছিল। অবশেষে সে তার দিদিমার গ্রামে এসে পৌঁছাল।

রাত নেমে এসেছে। গ্রামটি তখন নিস্তব্ধ। ওহ, একী! তার দিদিমার বাড়িতে তালা ঝুলছে, বাড়িটা একদম ফাঁকা! এজুমালাই চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু এখন কী করা যায়? অপেক্ষা করার মতো একটা জায়গার খোঁজে সে চারদিকে তাকাল।

কাছেই একটা বাড়ি ছিল, যার সামনে বেশ বড় একটা বারান্দা। এজুমালাই সেই বাড়ির প্রবেশপথের পাশে শুয়ে পড়ল। সে চোখ বুজল...

...আর হঠাৎই চমকে জেগে উঠল! ওটা কিসের শব্দ?!

সে জানালার শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল এবং দেখতে পেল দুটি লম্বা পা! ঘুমের ঘোরে বিভ্রান্ত হয়ে সে ভাবল—ওগুলো বুঝি তালগাছ! তাই সে গেয়ে উঠল—

উঁচু তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

চোরটি গানের সুর শুনতে পেল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল, কিন্তু গায়ককে দেখতে পেল না।

এঝুমালাই, আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিল; সে গেয়ে উঠল—

বড়-বড় চোখ মেলে পেঁচা তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

"কেউ একজন এদিকেই আসছে!" চোরটি মনে মনে ভাবল। "আমার উচিত হবে লুট করা জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা!" সে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল এবং মাটিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল।

এঝুমালাই তখন গেয়ে উঠল—

চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে, গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!



চোরটি ভয়ে জমে গেল! সে পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর সে তার যন্ত্রপাতি ও লুট করা জিনিসপত্র ফেলে রেখেই সেখান থেকে দৌড়ে পালাল!

ঠিক তখনই এঝুমালাই চিৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!" লোকজন দৌড়ে সেখানে ছুটে এল। তারা চোরের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতি ও লুট করা জিনিসগুলো দেখতে পেল। কী ঘটেছে, তা বুঝতে তাদের বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। তারা এঝুমালাইয়ের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। "তুমি আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছ! হুররে! হুররে!"

সেই দিন থেকে, সবাই এঝুমালাইয়ের কবিতা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত।

তামিলনাড়ুর একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

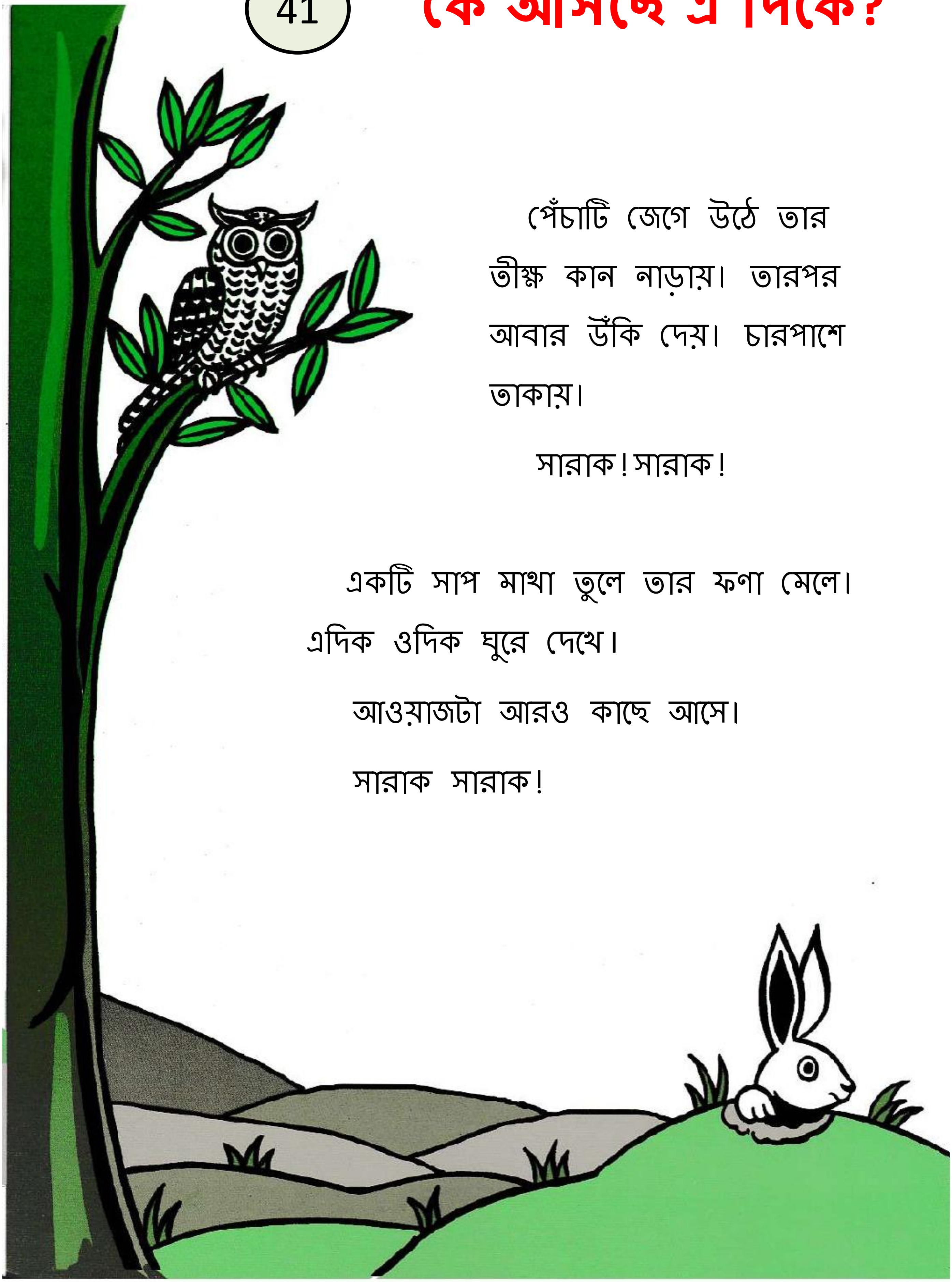
P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

কে আসছে এ দিকে?



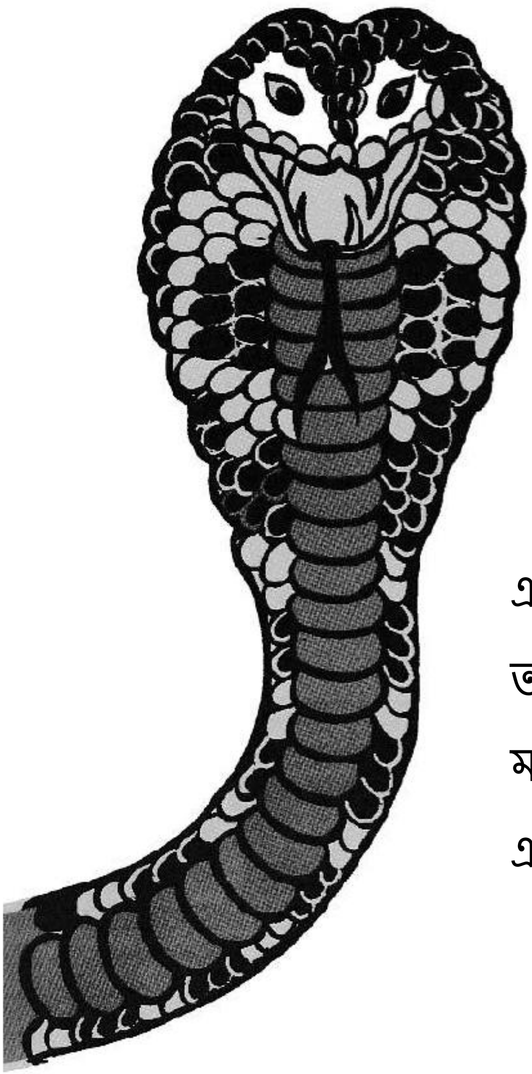
পেঁচাটি জেগে উঠে তার তীক্ষ্ণ কান নাড়ায়। তারপর আবার উঁকি দেয়। চারপাশে তাকায়।

সারাক! সারাক!

একটি সাপ মাথা তুলে তার ফণা মেলে। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে।

আওয়াজটা আরও কাছে আসে।

সারাক সারাক!



যাদুকরী দক্ষতায় একটি গিরগিটি নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ধীরে ধীরে তার শরীরের রঙের পরিবর্তন হয় । সে তার চারপাশের সাথে মিশে যায়। এখন সে একটি পাতা!

একটি শামুক গুটি গুটি এগোনো বন্ধ করে দেয়। সে তার দেহকে তার খোলের মধ্যে টেনে নেয়। এখন সে একটি পাথর!



সারাক! সারাক!

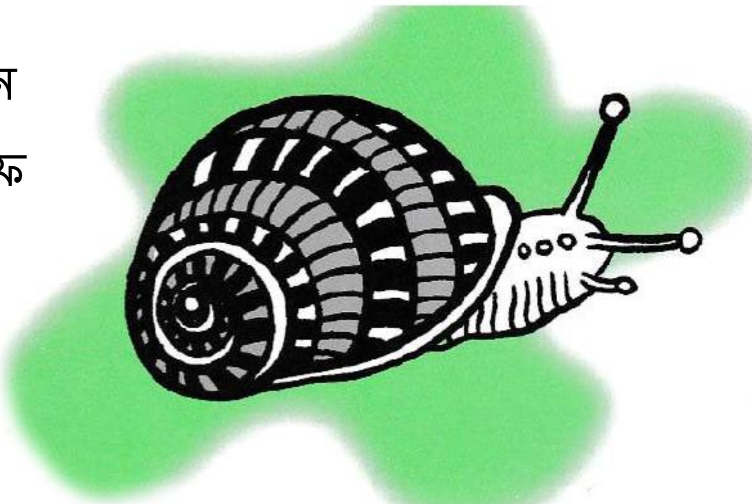
একটি কাঁটাচুয়া কেঁপে ওঠে । এটি গড়িয়ে একটি বল এর মতন হয়ে যায় এবং তার লম্বা কাঁটা ছড়িয়ে দেয়।

একটি কাঁকড়া পাশে পা রাখা বন্ধ করে বালিতে গর্ত খোঁড়ে।



পদ্ম পাতায় থাকা ব্যাঙটি গান গাওয়া বন্ধ করে দেয়। এক লাফে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সারাক! সারাক!



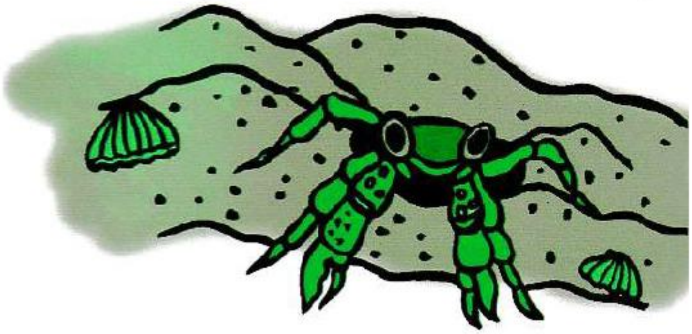


শব্দটি আরও কাছে আসে। সবাই সেই দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে।

সারাক! সারাক!

একটি খরগোশ তার গর্তে ঝাঁপ দেয়। তারপর সে আবার মুখ তুলে চারিদিক দেখে।





সারাক! সারাক!

বাঁকা পথ ধরে কে আসছে?

সারাক! সারাক! সারাক!

ওহ! এটা তো আমাদের কেন্নো! এর প্রতিটি পায়ে একটি করে স্যান্ডেল! সে এখনও সেই স্যান্ডেল পরে হাঁটতে শেখেনি। কিন্তু সে আসে, পিছলে যায়, কখনো টকটক আওয়াজ করে তো কখনও প্যাঁকপ্যাক আওয়াজ করে!



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

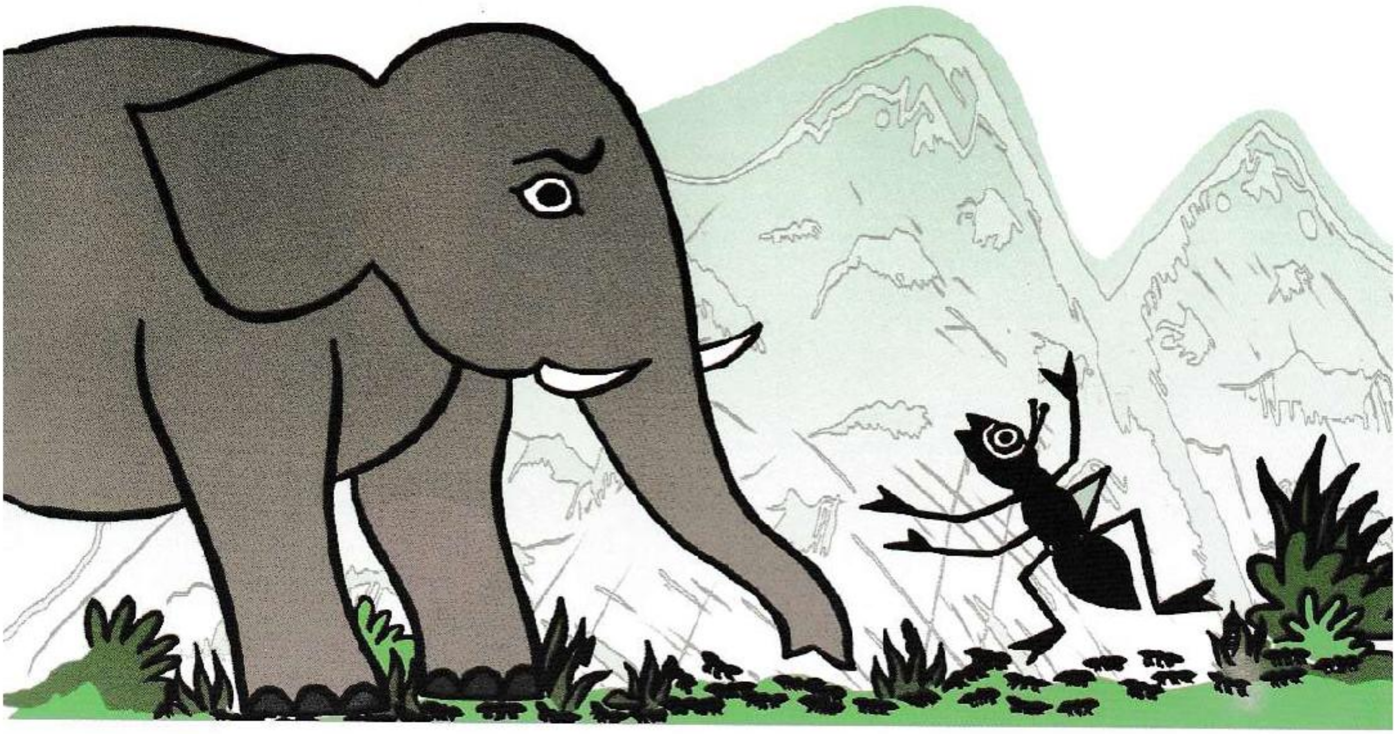
P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

দৌড় প্রতিযোগিতা

একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে একটি হাতি পুকুর থেকে বাড়ি ফিরছিল। সে আনন্দে ছিল। হঠাৎ সে এই দেখে আশ্চর্য হল যে একটি পিঁপড়ের সারি তার পথ কেটে চলেছে।

"তুমি কি আমাকে এখানে হাঁটতে দেখছো না?" হাতিটি গর্জন করে উঠল। “অপদার্থ পোকামাকড়!"



একটি সাহসী ছোট্ট পিঁপড়ে উত্তর দিল, "আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু অপদার্থ নই!"

"আমার দিকে তাকাও, ছোট্ট পিঁপড়ে" হাতিটি বলল। "আমি বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী! আমি সবকিছু করতে পারি! এখন নিজের দিকে তাকাও। তুমি কী করতে পারো?"

কিন্তু ছোট্ট পিঁপড়েটি পিছপা হলো না। "তুমি যা করতে পারো আমরা তাই করতে পারি!" সে দাবি করল।



"তাই?" হাতিটি হেসে উঠল। "হুমম... দৌড়ের বেলা? তুমি কি আমার বিরুদ্ধে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে?"



"আমি আনন্দের সাথে তোমার বিরুদ্ধে দৌড় প্রতিযোগিতা করবো!" পিঁপড়েটি বলল।

"বোকা," হাতিটি নাক ডাকল। “তুমি একদিনে যতটা হাঁটতে পারো তার চেয়ে বেশি জমি জুড়ে আমার তিনটি ধাপ”

পিঁপড়েটি কেবল তাকিয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না। এতে হাতির রাগ আরও তীব্র হয়ে উঠল।

"এখন আমি তোমাকে একটা শিক্ষা দেব!" সে গর্জে উঠল।

দৌড় শুরু হল!

হাতিটি একটা হালকা গতিতে এগিয়ে গেল। বনের পথ ধরে দ্রুত হেঁটে গেল। কিছুক্ষণ পর হেসে উঠল। "ওই বোকা পিঁপড়েটা

নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেক পিছনে রয়ে

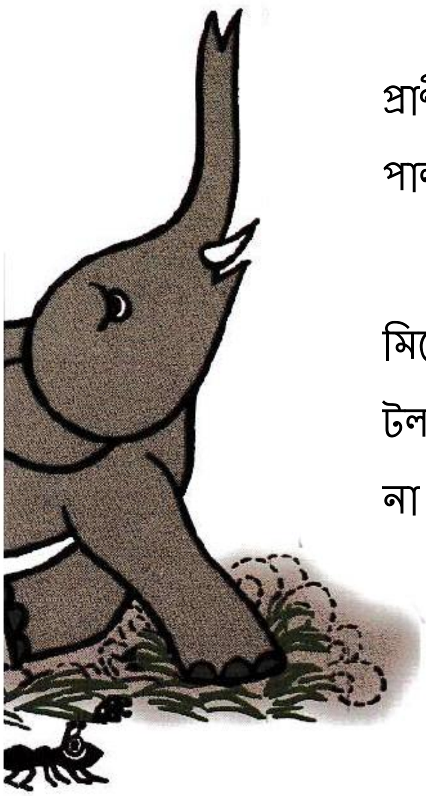
গেছে!"

সে নীচে তাকিয়ে. অবাক হল। নীচে সে একটি পিঁপড়ে দেখতে পেল ।

হাতিটি আবার যাত্রা শুরু করল। এবার, সে দ্রুত এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড় আর লতাগুলোকে মাড়িয়ে গেল। গাছপালা ঠেলে দিল। বনের পথ ধরে ধাক্কা মারল, ধপ ধপ শব্দ করে। "জয়"

সে ভাবল। কিন্তু যখন সে বিশ্রাম নিতে থামল, তখন সে কী দেখল? একটা পিঁপড়ে।

"ছোট্ট পিঁপড়েটা কীভাবে আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে?" হাতিটি ভাবল। "আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছি!" সে নিজেকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। "আমি হারবো না!" সে প্রতিজ্ঞা করল।



ইতিমধ্যে, দৌড়ের খবর বনজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য প্রাণীরা দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। "পালাও, ছোট্ট পিঁপড়ে, পালাও!" তারা চিৎকার করে উঠল। "হুররে! হুররে!"

হাতিটি রেগে গেল। কিন্তু এখন তার রাগের সাথে ব্যথা মিশে গেল। তার পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। তার পা টলমল করছিল। সে আর দৌড়াতে পারছিল না। পথের পাশে একটি গর্ত দেখা দিল।

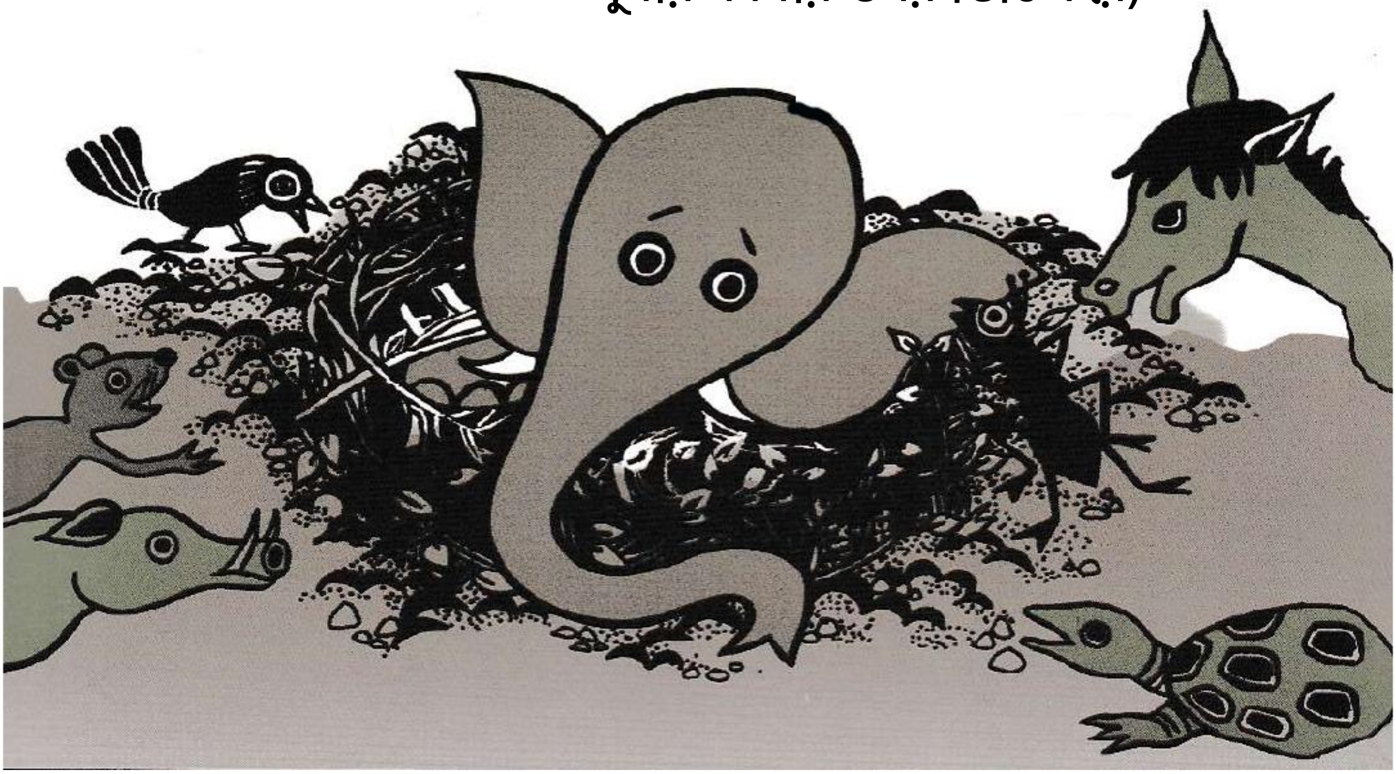


হাতিটি অবাক হয়ে গর্তে পড়ে গেল এবং গর্তে একটি পিঁপড়ে দেখতে পেল! "আমি তোমাকে সাহায্য করব না!" পিঁপড়েটি উঠে বেরিয়ে আসার সময় বলল। অন্যান্য প্রাণীরা সংগ্রামরত হাতিটিকে দেখল। "আমাকে সাহায্য করুন!" হাতিটি তাদের কাছে মিনতি করল। "আমাকে এখান থেকে বের করুন!"

অবশেষে প্রাণীদের করুণা হল। তারা হাতিটিকে গর্ত থেকে বের করে দিল ।হাতি তাদের ধন্যবাদ জানাল এবং বাড়ির দিকে ফিরে গেল। হাতিটি খুব বিভ্রান্ত বোধ করল। "একটি ছোট পিঁপড়ে কীভাবে দৌড়ে একটি হাতিকে হারাতে পারে?" সে ভাবল।বেচারা হাতি! দৌড়ের সময় যখনই সে নীচের দিকে তাকাত, তখনই কাছেই একটি পিঁপড়ে থাকত। হাতিটি ভেবেছিল যে প্রতিটি পিঁপড়েই পুকুরের ধারে দেখা সাহসী পিঁপড়েটি।

সে বুঝতে পারেনি৷ প্রতিবার নীচে তাকালেই সে একটি ভিন্ন পিঁপড়ে দেখেছে! কারণ পিঁপড়েরা সর্বত্র আছে!

(একটি ভারতীয় লোককাহিনী (শোবিতা পুঞ্জার বর্ণনার উপর ভিত্তি করে)



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

43

রাতে চাঁদ কেন ঝলমল করে।

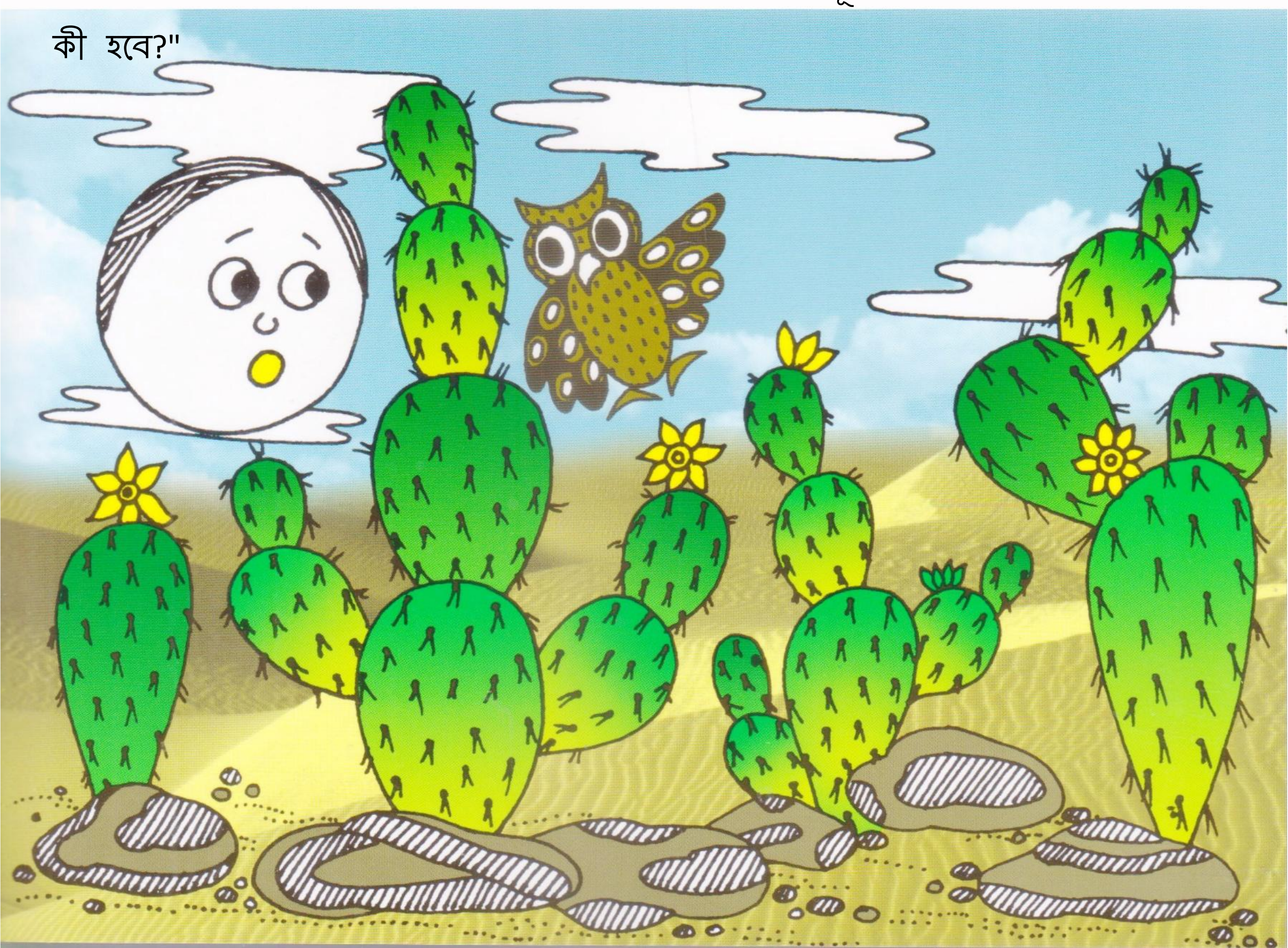
অনেক দিন আগে, চাঁদ আর সূর্য আকাশে একসাথে ঝলমল করতো। একদিন চাঁদ সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "সূর্য কত বড়! আর কত উজ্জ্বল!" চাঁদের নিজেকে ছোট এবং নিস্তেজ লাগলো।

চাঁদ ঠিক করলো একটি পেঁচার কাছে সাহায্য চাইবে। চাঁদ পেঁচাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, "তুমি কি খোঁজ নিতে পারবে সূর্য কোথায় তার আলো রাখে?"

"আনন্দের সাথে!" পেঁচা বললো ।

"ধন্যবাদ!" চাঁদ বললো। "আমি এই ক্যাকটাস গাছের পিছনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

পেঁচা উড়ে গেলো । চাঁদ অপেক্ষা করছিলো। তার ভয় করছিলো। "সূর্য কোথায় আলো রাখে তা পেঁচা কীভাবে জানতে পারবে? পেঁচা যদি সূর্যকে জাগিয়ে তোলে তাহলে কী হবে?"



চাঁদ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সন্ধ্যায়, চাঁদ ক্যাকটাস গাছের কাছে ছুটে গেলো। সে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিলো, মাঝে মাঝে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছিলো পেঁচা আসছে কিনা।

অবশেষে পেঁচা ফিরে এলো । "অবশেষে তুমি এসেছো!" চাঁদ বললো । "আমি তোমার জন্য চিন্তিত ছিলাম।"

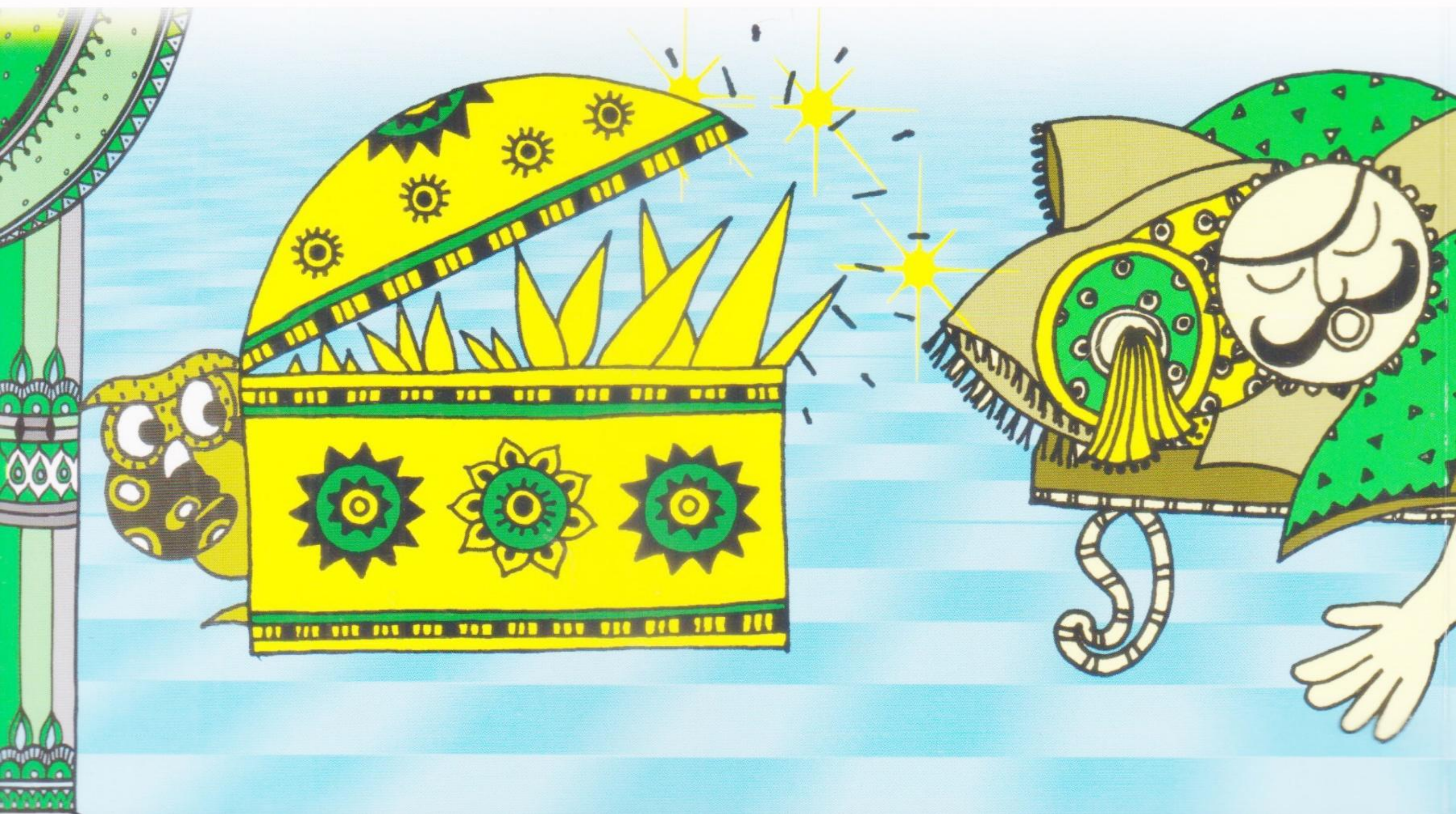
"সূর্য ঘুমানোর আগে তার আলো একটা সিন্দুকে রাখে," পেঁচা ফিসফিসিয়ে বললো।

"ওহ, ধন্যবাদ!" চাঁদ ও ফিসফিসিয়ে বললো । তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, "প্রিয় বন্ধু, তুমি কি আমার জন্য আর একটা উপকার করবে?"

" নিশ্চই " পেঁচা বললো।

"তুমি কি আমাকে সূর্যের আলোর একটা ছোট টুকরো এনে দেবে?" "দেব!" পেঁচা বললো।

"আগামীকাল সূর্যাস্তের সময় এখানে দেখা হবে," চাঁদ বললো।



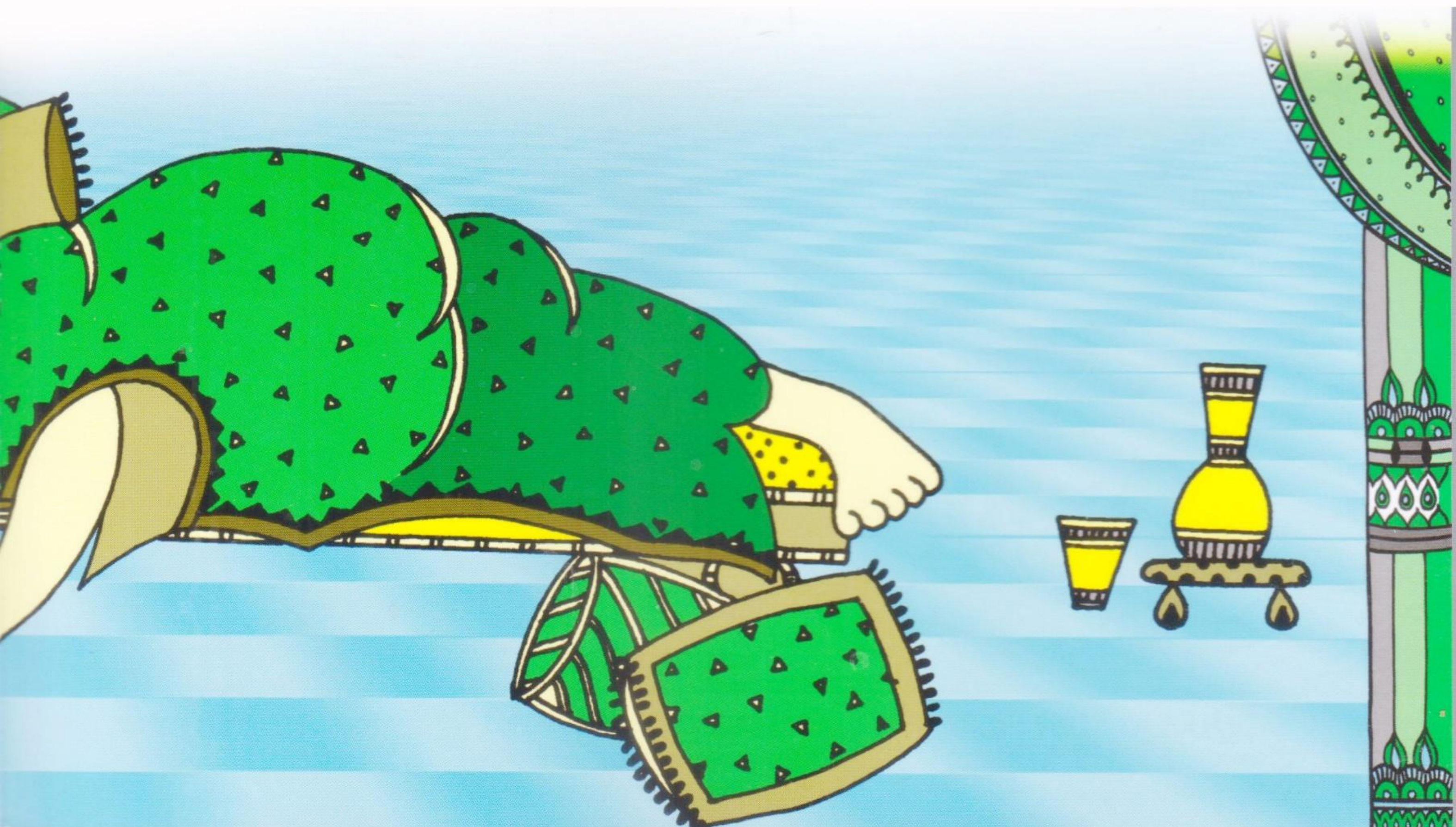
সেই রাতে চাঁদ ঘুমায়নি। "যদি পেঁচা ধরা পড়ে..." সেই চিন্তায় পড়ে গেলো। "পেঁচা কি শব্দ না করে ভেতরে ঢুকতে পারবে?" চাঁদ সারা রাত এবং পরের দিন ভয়ে অপেক্ষা করলো।

অবশেষে, সূর্যাস্তের ঠিক পরে, পেঁচা এলো। সে সূর্যের আলোর একটা ছোট টুকরো নিয়ে এসেছিলো ।

"ধন্যবাদ বন্ধু!" চাঁদ বললো । সে সূর্যের আলো নিজের উপর রাখলো। পেঁচা চাঁদকে প্রশংসা করে বললো"এখন তুমি সত্যিই উজ্জ্বল!"

অনেক মাস কেটে গেলো। প্রতি রাতে পেঁচা সূর্যের বাড়িতে উড়ে যেত। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতো সূর্য ঘুমাচ্ছে কিনা। তারপর সে চাঁদের জন্য একটু আলো নিতো । ধীরে ধীরে চাঁদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেলো । সে রোমাঞ্চিত হলো!

কিন্তু একদিন, সূর্য চাঁদের দিকে তাকালো এবং তারপর নিজের দিকে তাকালো। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো যে চাঁদ তার আলো চুরি করছে! সে সারা রাত জেগে থেকে আলোর সিন্দুকটি রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো ।



পেঁচা আসার সাথে সাথেই সূর্য তাকে দেখতে পেলো। পেঁচাকে চাঁদের জন্য আলো নিতে দেখলো । সূর্য পেঁচাকে অনুসরণ করলো এবং চাঁদকে সেই আলো মাখতে দেখলো। সূর্য তখনি চাঁদের মুখোমুখি হল। "তুমি আমার আলো চুরি করলে কেন?" সে জানতে চাইলো।

"তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল! তাই!" চাঁদ বললো।

তারপর সূর্য চাঁদের সমস্ত আলো কেড়ে নিলো। সে চাঁদকে দিনের বেলা ঘুমাতে এবং কেবল রাতে বেরিয়ে আসতে আদেশ দিলো।

পেঁচা তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দিলো: "দুঃখ করো না!" সে বললো। "আমি প্রতি রাতে তোমাকে কিছু আলো এনে দেব।"

এবং সে তাই করে। প্রতি রাতে সে সূর্যের আলোর কিছুটা চুরি করে। তাই চাঁদ সর্বদা উজ্জ্বল এবং সুন্দর। তারপর ভোরের ঠিক আগে, চাঁদ পেঁচাকে আলো দেয় এবং পেঁচা সেই আলো আবার সূর্যের সিন্দুকে রেখে আসে ।

এবং এখনও পর্যন্ত সূর্য তাদের ধরতে পারেনি!

নিরুপমা রাঘবন কর্তৃক একটি আদিবাসী আমেরিকান গল্প থেকে রূপান্তরিত



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

শিবি এবং ঈগল



অনেক দিন আগে রাজা শিবি কাশীতে রাজত্ব করত। শিবি তার সকল কাজে সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিল। সে সকলের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু ছিল এবং সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

একদিন রাজা যখন তাঁর বাগানে ছিল, তখন একটি পায়রা দ্রুত উড়ে এল। "আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!" সে চিৎকার করে উঠল।



"ভয় পেও না!" শিবি বলল। "আমি তোমাকে বাঁচাবো।" সে পায়রাটিকে তার বাহুতে ধরে রাখল।

হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ থেকে উড়ে এল। "আমাকে ওই পায়রাটা দাও!" সে বলল।

"আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমি ওকে বাঁচাবো," শিবি বলল। "এবং আমি কখনও আমার কথার খেলাপ করব না ।"

"এই পায়রা আমার শিকার," ঈগল বলল। "এটি আমার পরিবারকে খাওয়াবে। তুমি কীভাবে আমার পরিবারকে তাদের খাবার থেকে বঞ্চিত করতে পারো?"

"তুমি ঠিক বলেছো!" শিবি বলল। "তবুও এই পায়রা আজ তোমার শিকার হবে না। আমার কাছে অন্য কিছু চাও। আমি আনন্দের সাথে দেব।"

"কিন্তু আমি আর কিছু চাই না," ঈগল বলল। "এই ছোট্ট পায়রাটি আমার একমাত্র চাওয়া।"

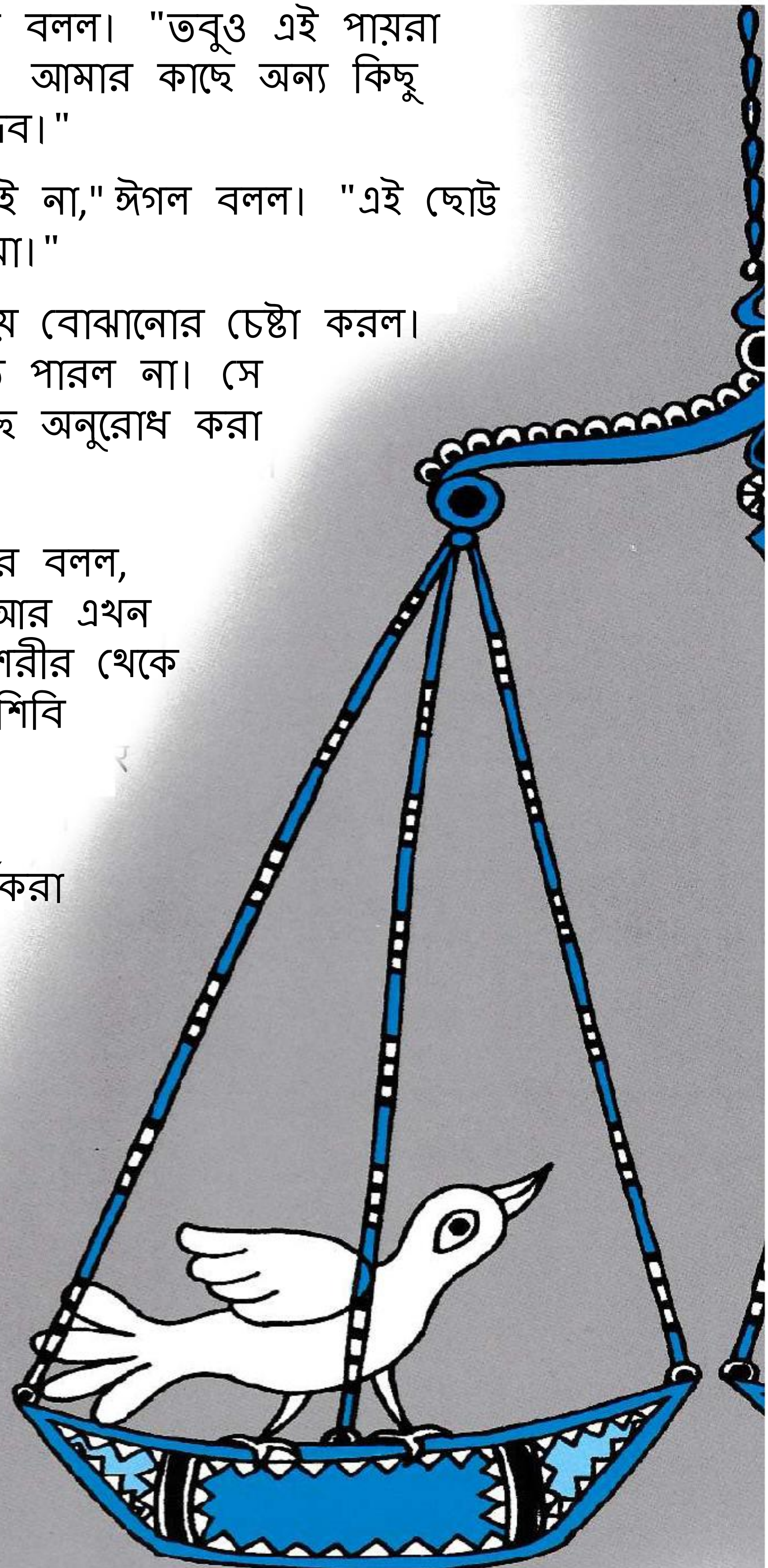
শিবি ঈগলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই তার মন বদলাতে পারল না। সে অনড় ছিল। শিবিও তার কাছে অনুরোধ করা বন্ধ করল না।

অবশেষে, ঈগল চিৎকার করে বলল, "তুমি পায়রাটিকে বাঁচিয়েছ! আর এখন তার জায়গায় আমি তোমার শরীর থেকে সমান পরিমাণ মাংস নেব।" শিবি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

এই আশ্চর্যজনক বিবাদের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দর্শকরা বাগানে ভিড় জমাল। এমনকি দেবতারাও উপরে থেকে দেখছিলেন।

সেখানে একটি বিশাল দাঁড়িপাল্লা আনা হয়েছিল। শিবি আলতো করে পায়রাটিকে দাঁড়িপাল্লার এক দিকে শুইয়ে দিল।

তারপর সে তার উরুর একটি টুকরো কেটে দাঁড়িপাল্লার অন্য দিকে রাখল।



অবাক কাণ্ড! দাঁড়িপাল্লার যে দিকে শিবির গায়ের মাংস ছিল সেটা নীচে নেমে গেল ঠিক ই, কিন্তু যে দিকে পায়রাটি ছিল সেদিকটা আরও নীচে নেমে গেল!

প্রহরীরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবি কিন্তু আশ্চর্য হল না। সে কেবল তার উরুর আরেকটি টুকরো দাঁড়িপাল্লায় রাখল।



কিন্তু তবুও পায়রার দিকটা তার দিকের থেকে নীচে রইল!

শিবি নিজের টুকরো আরও বেশি করে দাঁড়িপাল্লায় রাখল। কিন্তু পায়রার দিকটা তার দিকের থেকে নীচে রইল।

শেষে, রাজা তার সম্পূর্ণ দেহটি দাঁড়িপাল্লার এক দিকে রাখল। অবশেষে, দাঁড়িপাল্লার দুটি দিক সমান হল। "এই যে," শিবি বলল। " এবার তোমার দাবি পূরণ হয়েছে।"

সব দর্শকরা রাজার বলিদানে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। "শিবি! শিবি!" তাঁরা ডাকলেন।

দেবতারা নিজেরাই ফুল ছিটিয়ে দিলেন। তারা তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং প্রশংসা করলেন।



তারা শিবিকে বললেন, "আরেকজন রাজা হয়তো বলতেন, 'ওটা তো একটা ছোট্ট পাখি। আমার জীবন আরও মূল্যবান!' কিন্তু তুমি তোমার কথার প্রতি সত্যনিষ্ঠ ছিলে এবং পায়রাটির জীবনের জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করেছ। পৃথিবী চিরকাল তোমাকে সম্মান করবে।"

এবার ঈগল এবং পায়রা তাদের ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করল। তারা কেবল রাজাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিল! সমস্ত দেবতা শিবিকে আবার আশীর্বাদ করলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

অনুগত ছাত্ররা

একদিন একজন গুরু এবং তাঁর ছাত্ররা একটি যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। তারা একটি গরুর গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন।

মৃদু বাতাস বইছিল। বাতাস উষ্ণ ছিল। তাদের চারপাশের মাঠ থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গাড়িটি আগে পিছে মৃদু দুলছিল। গুরু আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ পথটা এবড়োখেবড়ো হয়ে উঠল। গাড়িটি কাঁপতে শুরু করল। গুরুর পাগড়িটি মাথা থেকে সরে মাটিতে পড়ে গেল!

ছাত্ররা কাঁপতে শুরু করল । কী করা উচিত?

গুরু বলেছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনও কিছু করবে না!"

তারা পাগড়িটা পথেই পড়ে থাকতে দিল!



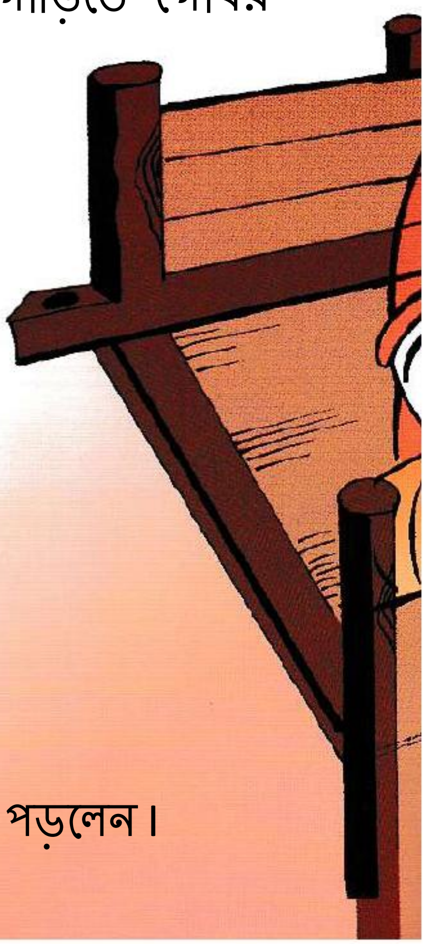
গুরু চোখ খুললেন। "আমার পাগড়ি কোথায়?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্ররা তাকে কী ঘটেছে তা জানাল।

"বোকা! অপদার্থের দল!" তিনি ধমক দিলেন। " তোমরা পাগড়িটি মাটিতে পড়ে যেতে দেখলে! কি করে সেটা না তুলে থাকলে ?" তারপর তিনি তাদের আদেশ দিলেন, "এখন থেকে যা পড়ে যাবে তা তুলে নিও।“

গুরু তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। কিন্তু ছাত্ররা পলক ফেলার ও সাহস করল না! তারা দেখল যে গাড়ি থেকে যেন কিছু পড়ে না যায়।

তারা ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে লাগল । হঠাৎ একটি ষাঁড় তার গোবরের একটি স্তূপ ফেলে দিল। ছাত্ররা কাঁপতে শুরু করল। তারপর তারা গোবরটুকু একটি ঝুড়িতে তুলে ঝুড়িটি তাদের গাড়িতে তুলে নিল।

শীঘ্রই গুরুর চোখ খুলল। তিনি বুঝতে পারলেন গাড়িতে গোবর আছে। গোবর দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এটা কি?" "আপনি বলেছিলেন যা পড়ে যাবে তা তুলে নিতে। আমরা তাই করেছি। "



গুরু তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না । তিনি ছাত্রদের খুব বকলেন ও তাদের দিয়ে গোবর টা ফেলালেন ।

উফ !

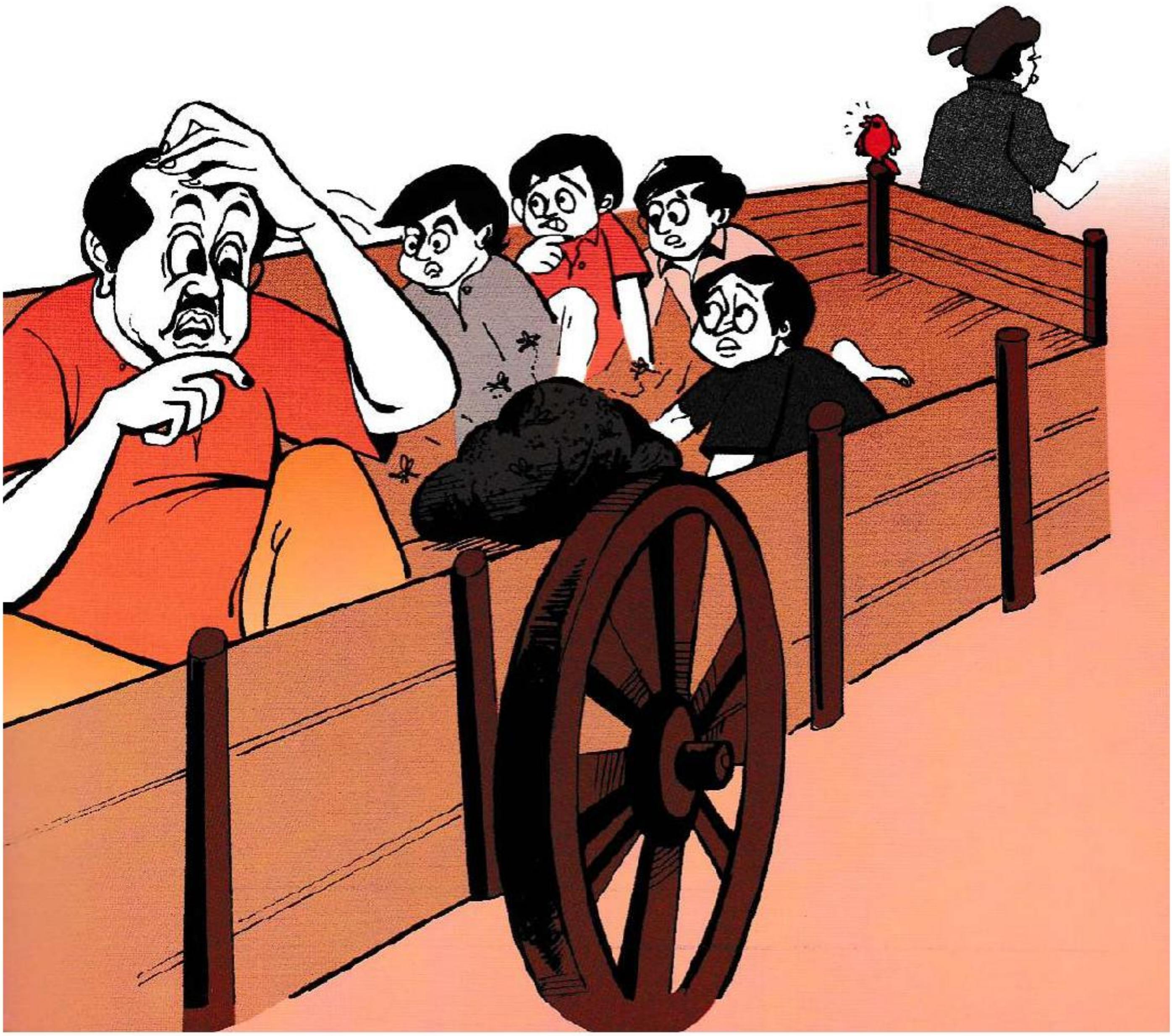
গুরু এবার দুটি তালিকা তৈরী করলেন । পড়ে গেলে কী কী জিনিস তোলা উচিত ও কী কী তোলা উচিত না। সেই

তালিকা দুটি ছাত্রদের দিয়ে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারা মাঠ ঘাট ও গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে চলল । তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে মাটি খুব রুক্ষ ছিল। হঠাৎ গাড়িটি ভীষনভাবে দুলতে লাগল। গুরু একটি গর্তে পড়ে গেলেন!

"আমাকে এখান থেকে বের কর!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ছাত্ররা কাঁপতে লাগল । তারা গুরুর দেওয়া তালিকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

তারপর, তারা চিৎকার করে বলল "হে গুরু! তালিকায় আপনার নাম নেই। অতএব, আপনাকে গর্ত থেকে বের করা উচিত নয়!"।



গুরু মিনতি ও অনুনয় করলেন। কিন্তু ছাত্ররা হাল ছাড়ল না। "আপনি আমাদের পরীক্ষা করছেন! এটা স্পষ্ট!" তারা বলল। "আমরা আপনার অবাধ্য হব না, গুরুদেব!"

গুরু এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেন। তিনি গর্ত থেকে বেরোনোর কোনো উপায় দেখতে পেলেন না। তিনি অনেক ভেবে দেখলেন।

অবশেষে, তিনি ছাত্রদের বললেন তাকে তালিকাগুলো দিতে। তিনি একটা কলম চাইলেন। তারপর তিনি সেই তালিকাটি নিলেন যাতে গাড়ি থেকে পড়ে গেলে কী কী জিনিস তুলতে হবে তার নাম লেখা ছিল। গুরু তাঁর নাম সেই তালিকায় যোগ করলেন। তারপর তিনি তালিকাগুলো ছাত্রদের ফেরত দিলেন।

"এক, দুই, তিন!" বলে ছাত্ররা গুরুকে গর্ত থেকে তুলে নিল। তিনি আবার গাড়িতে বসলেন।

যাত্রা চলতে থাকল। গাড়িটা মৃদুভাবে দুলছিল। ছাত্ররা আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু গুরু ঘুমোলেন না। তিনি তাঁর চোখ খোলা ই রাখলেন।

ভারতের একটি গল্প.



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

তোতাপাখির রত্ন

একবার এক বণিকের একটি তোতা ছিল যে কথা বলত । সে তোতাপাখিটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করত এবং তাকে থাকার জন্য একটি রুপোর খাঁচা কিনে দিয়েছিল । সে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তার জ্ঞানের কথাগুলো শুনত।

তোতাপাখি তার সব প্রশ্নের উত্তর স্বেচ্ছায় দিত। কিন্তু সে সবসময় বলত, "আমাকে আমার খাঁচা থেকে বের করে দাও। আমি মুক্ত হতে চাই।"

বেচারা বণিক উত্তর দিত, "ওটা ছাড়া আর কিছু! আমি তোমাকে ওটা ছাড়া আর যে কোনও কিছু দেব!"

একদিন তোতাপাখি বলল, "যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে তিনটি কালজয়ী উক্তি বলব।"



বণিক ভাবল, "জীবনব্যাপী উত্তরের বিপরীতে মাত্র তিনটি উক্তি?" সে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মুখ খুলল।

তারপর সে ভাবল, "যদি আমি তোতাপাখিকে তার খাঁচায় রাখি, তাহলে সে আমার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে। কিন্তু যদি আমি কখনও সঠিক প্রশ্ন না করি? আমি কখনও তিনটি কালজয়ী উক্তি শুনতে পাব না!"

তাই সে বলল, "তোতাপাখি, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!"

সে খাঁচা খুলে দিল এবং তোতাপাখি উড়ে গেল। বণিকের হাতে বসে রইল। "এই প্রথম উক্তি," সে বলল। "হারানো ধন নিয়ে কেঁদো না।"

"তুমি আমাকে নতুন কিছু বলছো না!"
বণিক চিৎকার করে উঠলো।

তোতাটি উড়ে বাড়ির উপরে গিয়ে বসল ।

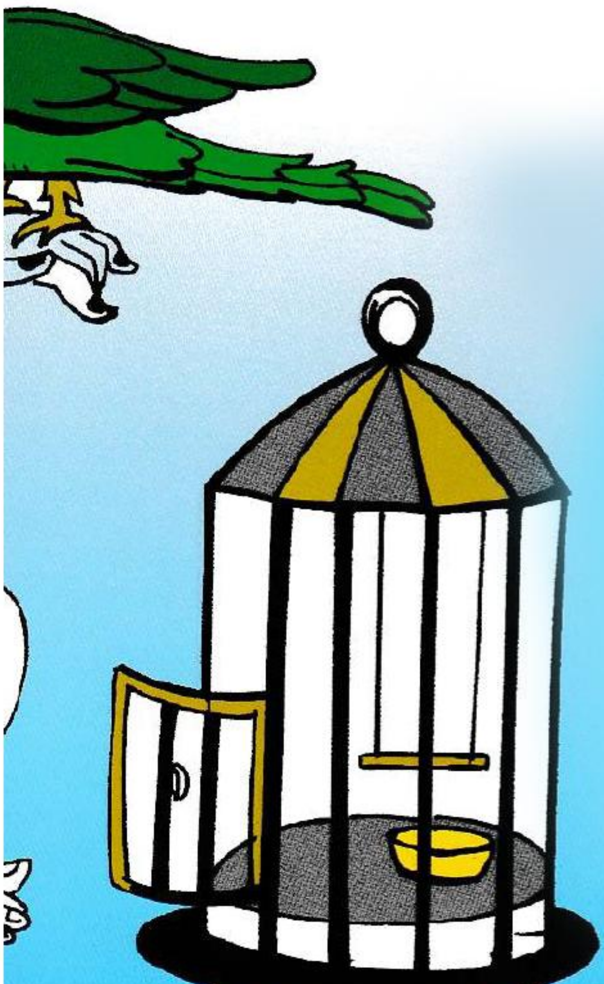


"এই হল পরের উক্তি: “যা শুনছ তা বিশ্বাস কর না।" এবার বণিক সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠল। “ এ তো আমি জানি। আমাকে এমন কিছু বল যা আমি জানি না!"

তোতা হেসে উঠল। "তোমাকে এমন কিছু বলব যা তুমি জানো না? ঠিক আছে: আমি আমার পেটে মূল্যবান পাথর বহন করছি!"

এটা অবিশ্বাস্য ছিল। "মূল্যবান পাথর! ! আর আমি কি না তোমাকে ছেড়ে দিলাম ! " বণিক মাথা নাড়লো। "আমি কী বোকা! আমি সারা জীবন সেই সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত থাকবো!"

তৎক্ষণাৎ তোতা বলল"এক মিনিট আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'হারানো ধন নিয়ে কেঁদো না।' আর তুমি ঠিক তাই করছ।"



বণিক বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

"এরপর, আমি বললাম, 'যা শুনছ তা বিশ্বাস করো না!' কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর যে আমার পেটে মূল্যবান পাথর আছে!"

বণিক পাখিটির দিকে তাকিয়ে রইল। "আমি..." সে শুরু করল।

তাকে চুপ করিয়ে তোতাপাখি বলল, "আমার দিকে তাকাও। আমি তোমার ঘরের ছাদে কিভাবে উঠেছি? পেটে মূল্যবান পাথর থাকা সত্ত্বেও, আমি কি উড়তে পারি ?"

তোতাপাখি সত্যি বলছিল!

যদি বণিক তার কথা ফিরিয়ে নিতে পারত! এই অসাধারণ পাখিটি তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিনোদন করে এসেছে। সে কীভাবে একে হত্যা করার কথা ভাবতে পেরেছিল?

"আমি দুঃখিত," সে বলল।

"আর এখন," তোতাপাখি বলল, "আমার তৃতীয় এবং শেষ উক্তি: কথা কেবল কানের শোনার জন্য নয়, মনের বোঝার জন্যও! বিদায়! এবং মনে রেখো। শোনার সাথে বুঝতে ভুলো না!"

বণিক হাঁ করে তোতাপাখিটিকে উড়ে যেতে দেখল।.



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

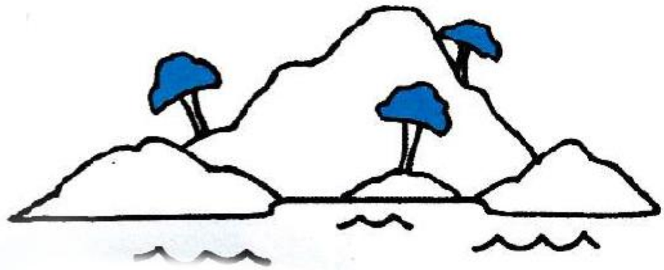
Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

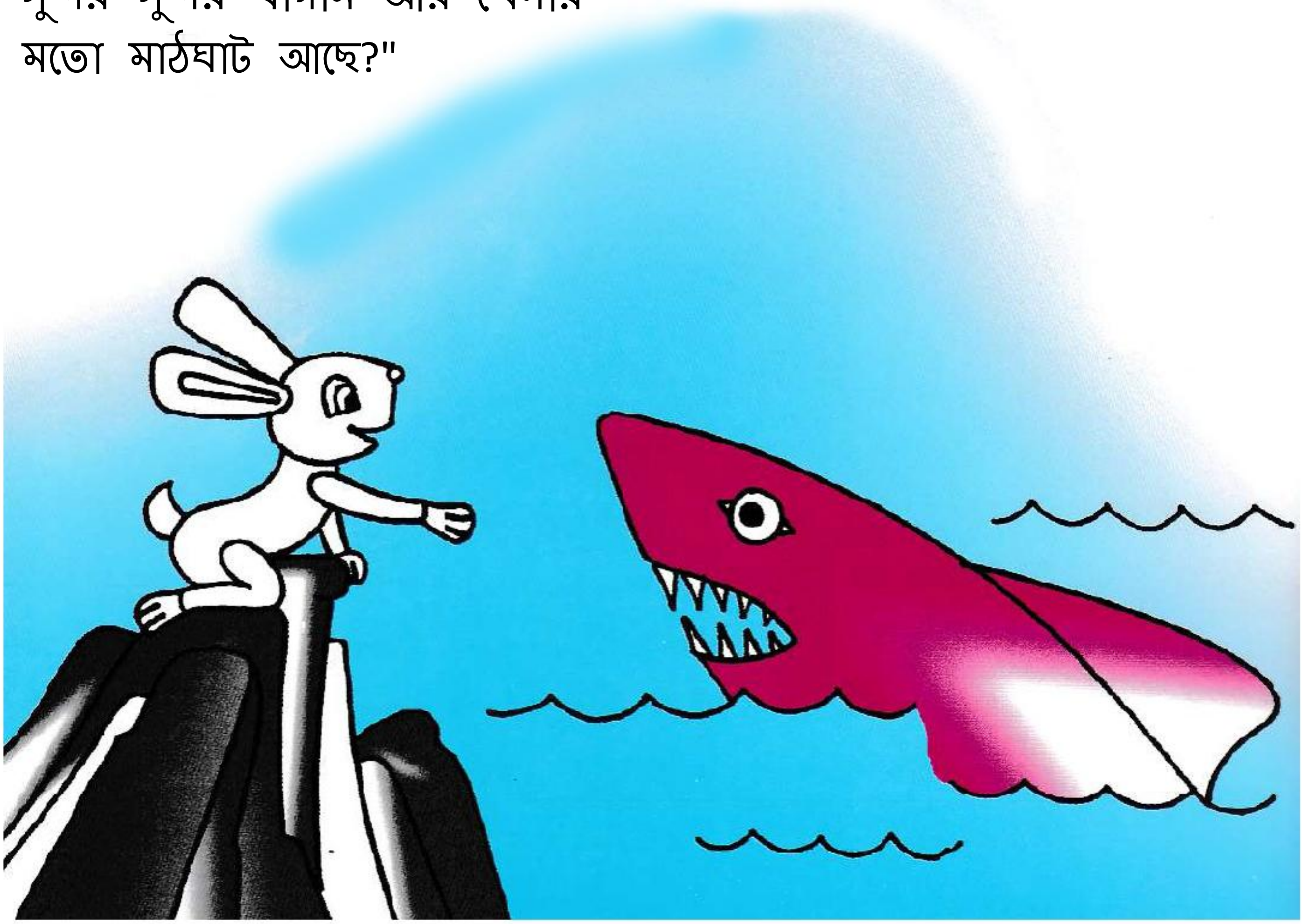
47 যে খরগোশটি সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল

একদা এক ছোট্ট খরগোশ ছিল, যে সমুদ্রকে খুব ভালোবাসত। সে ঘন্টার পর ঘন্টা সমুদ্রতীরে বসে ঢেউ দেখত, দেখত সমুদ্রের পাখিদের আর জোয়ারের টানে ভেসে আসা নানা জিনিস।

সমুদ্রের ওপারে, খুব বেশি দূরে নয়—এমনই এক জায়গায় ছিল একটি ছোট দ্বীপ। কোনো কোনো দিন মেঘ বা কুয়াশার আড়ালে দ্বীপটি ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু অন্য দিনগুলোতে খরগোশটি সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পেত।



দ্বীপটি খরগোশটির কল্পনাকে জাগ্রত করল । সে ভাবল, "ওখানে কারা থাকে? ওখানে কি সুন্দর সুন্দর বাগান আর খেলার মতো মাঠঘাট আছে?"

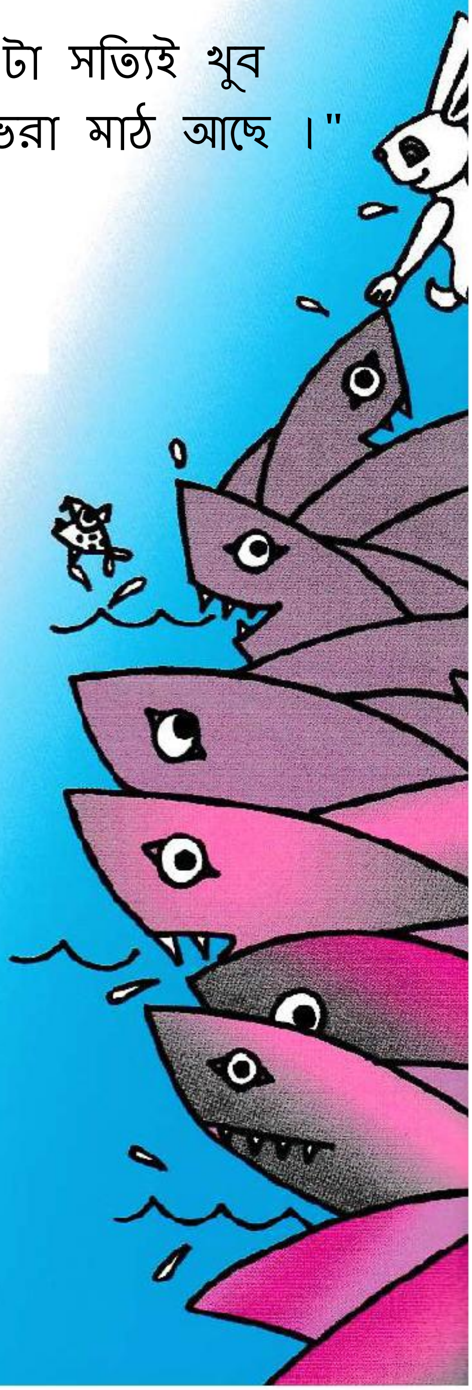


এখন যখনই খরগোশটি বসে সমুদ্রের দিকে তাকাত, তার দৃষ্টি গিয়ে আটকে যেত সেই দ্বীপটির ওপর। তার মনে সেখানে যাওয়ার জন্য এক গভীর বাসনা জেগে উঠল। কিন্তু যাবে কীভাবে?

একদিন একটি হাঙ্গর লক্ষ্য করল যে, খরগোশটি সমুদ্রের ওপারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাঙ্গরটি তার মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু খরগোশ, তুমি ওদিকে কী দেখছ?"

খরগোশটি বলল, "আমি ওই দ্বীপটি দেখছি। ওটা ভীষণ সুন্দর! তুমি কি কখনো সেখানে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, আমি সেখানে গিয়েছি," হাঙ্গরটি বলল। "ওটা সত্যিই খুব সুন্দর। ওখানে সমুদ্রসৈকত, বন-জঙ্গল আর ফুলে ভরা মাঠ আছে ।"



খরগোশটির মনে তখন সেখানে যাবার জন্য তীব্র বাসনা জাগল । কিন্তু হাঙ্গরের কাছে সাহায্য চাইতে সে ভয় পাচ্ছিল। কারণ হাঙ্গরটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, আর খরগোশটি ছিল ছোটখাটো ও দুর্বল।

খরগোশটি বুঝতে পারল যে তার একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। সে ঠিক করল, সে হাঙ্গরটিকে বোকা বানিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নেবে। সে বলল, "আচ্ছা বলো তো বন্ধু হাঙ্গর, কার আত্মীয়স্বজন বেশি—তোমার, নাকি আমার?"

হাঙ্গরটি হেসে উঠল, "আরে, অবশ্যই আমার! আমার আত্মীয়স্বজনরা তো পুরো সমুদ্রটাই দখল করে রেখেছে!"

"তুমি কি আমাকে তাদের দেখাবে?" খরগোশটি জিজ্ঞেস করল। "তুমি কি তাদের ডেকে এক সারিতে দাঁড় করাবে, যাতে আমি তাদের গুনে দেখতে পারি?"



"ডাকবোনা কেন?" হাঙ্গরটি বলল।

অচিরেই হাঙ্গরদের একটি দীর্ঘ সারি তৈরি হয়ে গেল, যা সমুদ্রের এপার থেকে একেবারে সেই দ্বীপটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"এবার দেখ!" খরগোশটি বলল। "যদি খরগোশের চেয়ে হাঙ্গরের সংখ্যা বেশি হয়, তবে আমি তোমাকে একটি পুরস্কার দেব! আর যদি হাঙ্গরের চেয়ে খরগোশের সংখ্যা বেশি হয়, তবে তুমি আমাকে একটি পুরস্কার দেবে। রাজি?"

"রাজি!" হাঙ্গরটি বলল।

"আমি তোমার আত্মীয়দের সংখ্যা গুনতে যাচ্ছি," খরগোশটি বলল। "আমি তাদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এই গণনার কাজটি সম্পন্ন করব।" খরগোশটি খুব সাবধানে প্রথম হাঙ্গরটির পিঠে পা রাখল এবং গুনে বলল, "এক!" এরপর সে সাবধানে দ্বিতীয় হাঙ্গরটির পিঠে পা রাখল এবং গুনে বলল, "দুই!" দ্বীপটি পৌঁছানো পর্যন্ত সে এভাবেই পা ফেলে সামনে এগোতে থাকল এবং গুনতে থাকল। তার নতুন বন্ধুটি তার পাশ দিয়েই সাঁতরে তাকে সঠিকভাবে গণনা করতে সাহায্য করছিল।

অবশেষে যখন খরগোশটি ডাঙায় পা রাখল, তখন সে বেশ স্বস্তিবোধ করল। সে হাঙ্গরটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং বলল—

"বন্ধু হাঙ্গর, আমার মনে হয় হাঙ্গরের চেয়ে খরগোশের সংখ্যাই বেশি। তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তাই আমি এই দ্বীপে থাকা আমার আত্মীয়দের সংখ্যা গুনতে যাচ্ছি। আমার গণনা শেষ হলে আমি এসে তোমাকে ডাকব। ঠিক আছে?"

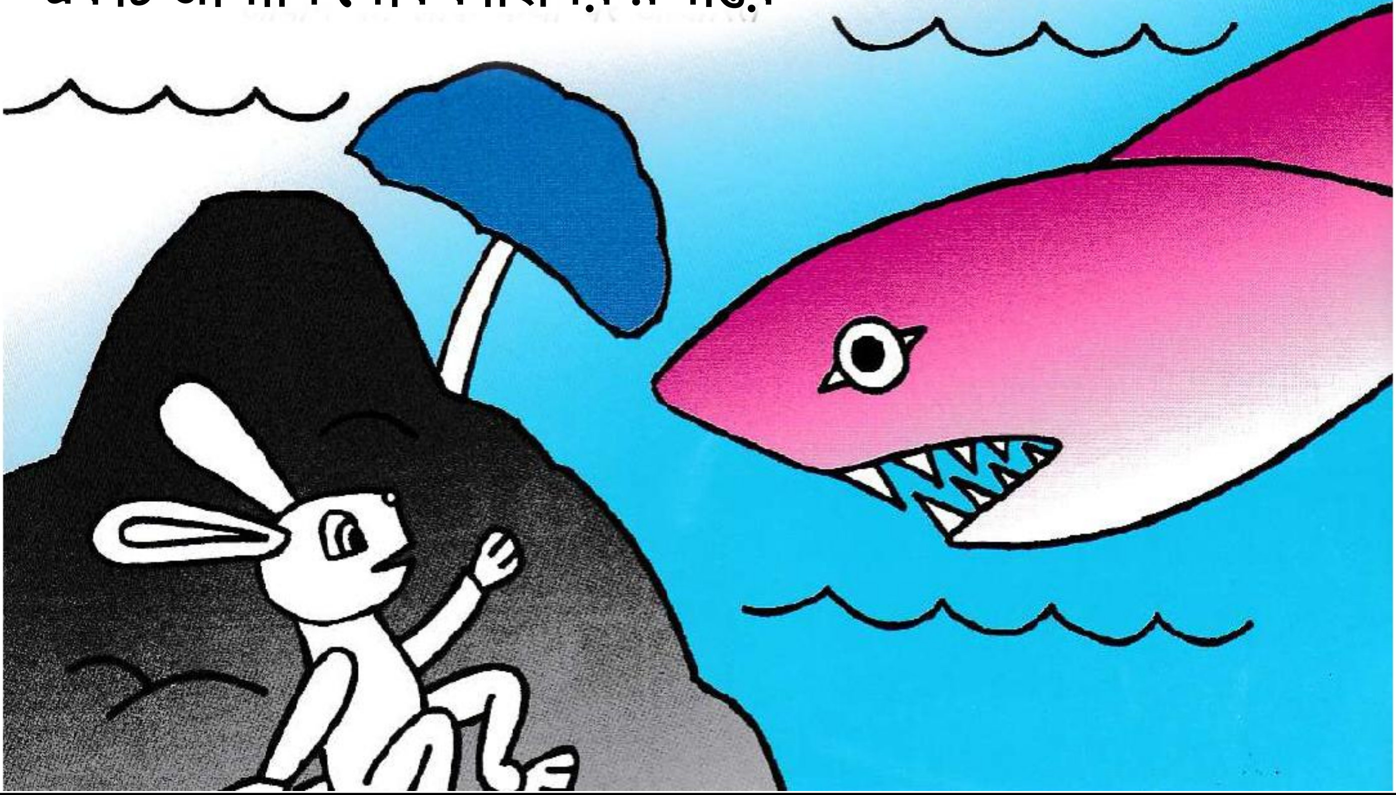
"ঠিক আছে," হাঙ্গরটি উত্তর দিল।

"তোমার আত্মীয়স্বজনদের মোট সংখ্যাটা কিন্তু ভুলে যেও না!" খরগোশটি বলল। এরপর সে দ্বীপটি ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে দৌড়ে চলে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পর সে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। সে সমুদ্রতীরে গেল এবং হাঙ্গরটিকে ডাকল। কিন্তু তার সেই ডাকের জবাবে কেবল ঢেউয়ের কলকলানি ভেসে এল।

এখন বাড়ি ফিরবে কীভাবে? খরগোশটি একটি পাথরের ওপর বসল এবং ভাবতে লাগল... একদিন তার মাথায় একটি নতুন বুদ্ধি এল...

একটি জাপানি লোককাহিনির রূপান্তর



© Katha Jharna 2008
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?

মাটির উপরে ফুলেরা এখনো হাসছে,
আর ফলগুলো লুকিয়ে আছে মাটির নিচে!

আমরা লুকিয়ে থাকি আমাদের পাতলা, কালচে খোসার আড়ালে;
জলে ভিজে নরম হওয়ার পর, আমরা সেই খোসা ফেটে বেরিয়ে আসি—
পুষ্টিকর ইডলি আর দোসা তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়ে।



আমার রঙ কখনো ঘিয়ে–সাদা, আবার কখনো মুক্তোর মতো ধবধবে সাদা;
আমি তেলে পরিপূর্ণ;
আমার স্বাদ বাদামের স্বাদের মতন;
আমি প্রোটিন আর ভিটামিনে ভরপুর;
আমার মতো এক হাজার দানা তুমি এক হাতেই ধরে রাখতে পারবে!



এই যে ছোট ছোট মেরুন রঙের দানাগুলো—
কে পারবে এদের এক সুতোয় গেঁথে ফেলতে?
আর যদি এরা ছড়িয়ে পড়ে, তবে কে পারবে
এদের আবার এক জায়গায় জড়ো করতে?

রেশমের মতো সোনালি সূত্র —
যেন হালকা সবুজ রঙের চাদরের ওপর বিছানো;
এই দেয়ালগুলোর আড়ালে—
দাঁড়িয়ে আছে এক সোনালি রত্নভাণ্ডার।

যদি সে তোমাকে আঘাত করে—
তবে কী ভীষণ ব্যথা!
আর যদি তুমি তাকে খাও—
তবে কী দারুণ তৃপ্তি!



রাগি, আখ, ধান, তিল, চীনাবাদাম, কলাই, ভুট্টা।







তার জন্ম হয় মাটির বুকে;
সে মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে প্রবেশ করে;
সে মাটির ভেতর থেকেই তার খাবার খুঁজে নেয়—
এই জাদুকরই মাটিকে করে তোলে উর্বর।

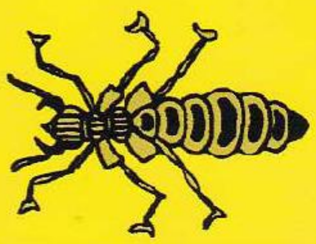


আমার বিশাল চোখ দিয়ে আমি সব দিকেই দেখতে পাই;
ঘরের যেকোনো কোণেই আমি উড়ে যেতে পারি;
তোমরা যে খাবার রান্না করছ, তা খেতে আমি খুব ভালোবাসি—
আবার যে খাবার তোমরা ফেলে দিচ্ছ, সেটাও আমি চেটেপুটে খাই;
আর যদি তোমরা আমাকে মারতে তেড়ে আসো—তবে আমি ঠিকই
ফসকে বেরিয়ে যাই!

মাটি দিয়ে গড়া তাদের সেই দুর্গের ভেতর—
ছোট ছোট সাদা প্রাণীরা অবিরাম পরিশ্রম করে চলে;
একটু উঁকি দিয়ে দেখো তো ভেতরে—হয়তো দেখবে
একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে!



আমি কখনো স্থির হয়ে ভাসি, আবার কখনো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলি;
আমি মুহূর্তেই ওপর-নিচ করে উড়ে বেড়াই;
আমি সামনে-পেছনে তীব্র বেগে ধাবিত হই;
আমার ধারালো ডানাগুলো সবসময়ই সোজা ও প্রসারিত থাকে—
সে আমি উড়ন্ত অবস্থাতেই থাকি, কিংবা বিশ্রামরত অবস্থাতেই;
আমিই সবচেয়ে দ্রুতগামী, আর আমিই সেরা!





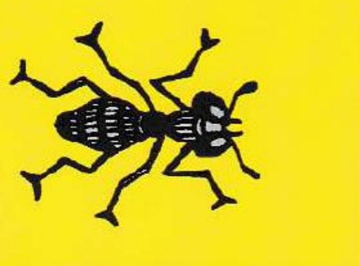
উজ্জ্বল, রঙিন আর রেশমের মতো কোমল
গঠনে ছিমছাম আর কাগজের মতো পাতলা
একটি থাকে প্রতীক্ষায়, অন্যটি আসে পান করতে—
বল তো দেখি, কোনটি পাপড়ি আর কোনটি ডানা?

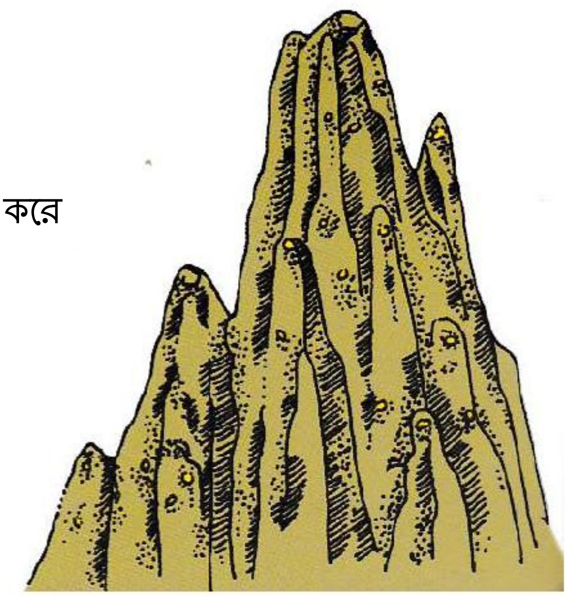
দেখতে এটি যেন এক ছোট্ট সাপ
বাদামী আর লালচে রঙের ছটায় রাঙানো
এর রয়েছে শত শত পা
এর কামড় বিষাক্ত এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক

আমার আছে অসংখ্য পায়ের জোড়া
তবুও আমি চলি অতি ধীরগতিতে
পড়ে থাকা শুকনো পাতাই আমার আহার
তুমি যদি আমাকে স্পর্শ করো—
তবে আমি গুটিয়ে গিয়ে বলের আকার নিতে পারি

আলোর নাচে মেতে ওরা ওড়ে দল বেঁধে
অন্ধকারের মাঝে ওরা জ্বলে আর নিভে যায়
ওদের ধাওয়া করায় কি মজা!

সে তার সুতো কাটে
আর বোনে তার জাল
সে তার অতিথিকে ভক্ষণ করে
তারপর নেয় বিশ্রাম



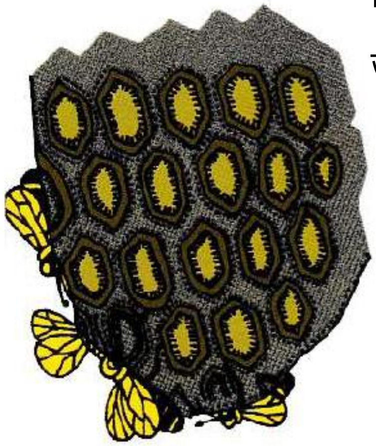


হাজার মানুষের এক বিশাল রাজপ্রাসাদ—
সেখানকার সমস্ত ক্ষমতা কেবলই এক স্ত্রীর হাতে



আমাদের গায়ের রঙ বাদামী
আমরা লুকিয়ে থাকি নর্দমা আর ফাটলের মধ্যে
অন্ধকার নামলেই আমরা বেরিয়ে আসি—
কিন্তু তুমি যদি আলো জ্বালিয়ে দাও, তবেই আমরা পালাই

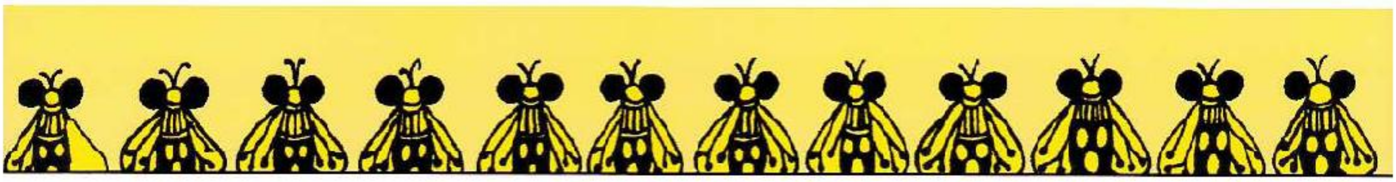
সে এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী
ঘুরে বেড়ায় গভীর অরণ্যের মাঝে
নিজের ইচ্ছেমতোই সে শিকার করে ফেরে—
তাকে শাসন করার কেউ নেই সেখানে



আমাদের বসতির সবার আহার জোগাতে
আমরা অবিরাম করে যাই কঠোর পরিশ্রম
বোঝা কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যাই
একসাথে কাজ করি, একে অপরকে সাহায্য করি—
আর সবসময়ই খুঁজে নিই কোনো না কোনো কাজ

সেই রূঢ় ডাক্তারটি এসে আমাকে ইনজেকশন দিল
তারপর তার পারিশ্রমিকটুকু পান করে সে বিদায় নিল

পিঁপড়া, মাছি, মশা, মিলিপিড, জোনাকি, প্রজাপতি, উকুন, উইপোকা,
ফড়িং, মাকড়সা, রানি মৌমাছি, কেঁচো, সেন্টিপিড, তেলাপোকা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

পাখি ও ছোট্ট মেয়েটি

একটি গাছ এবং একটি পাখি খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন গাছটিতে ফুল ফুটতে শুরু করল। এতে গাছটি ভীষণ খুশি হল। সে পাখিটিকে দুটি সুন্দর ফুল উপহার দিল।

পাখিটি একটি ফুল তার বাসায় রেখে দিল এবং অন্যটি নিয়ে উড়ে চলল। "আমি এই ফুলটি অন্য কাউকে দেব," সে মনে মনে ভাবল। "এটি তাকে খুশি করবে!"

কিছুক্ষণ পর পাখিটি একটি চমৎকার বাগান দেখতে পেল। সেখানে কতই না বিচিত্র ধরণের ফুল ফুটে ছিল! আহা! বাগানটি সেই ফুলগুলোর সুবাসে ভরে ছিল।



পাখিটি দেখতে পেল, বাগানের মালী একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে ভাবল,



"এই মালী ফুল খুব ভালোবাসে। আমি কি আমার ফুলটি তাকে দেব?"

পাখিটি নিচে নেমে এল এবং গাছের একটি ডালে বসল। মালী যখন পাখিটিকে দেখতে পেল, সে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, "তোমার কাছে কী চমৎকার একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও! আমি এটি একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখব, যেখানে সবাই এটিকে দেখতে পাবে। তখন সবাই ভাববে যে, আমার বাগানটিই পৃথিবীর সেরা বাগান।"



এ কথা শুনে পাখিটি রাগে ফুঁসে উঠল এবং সেখান থেকে উড়ে পালাল। তবে শীঘ্রই তার রাগ পড়ে গেল এবং সে আবার তার অনুসন্ধান শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর সে রঙের এক অপূর্ব সমাহার দেখতে পেল—কতই না সুন্দর সব রঙ! পাখিটি আরও কাছে এগিয়ে গেল এবং দেখল, একজন লোক কাপড়ের ওপর নকশা করছে।



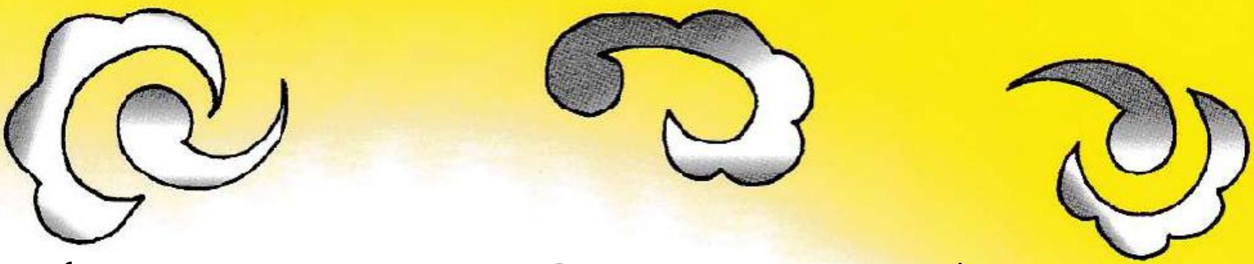
পাখিটি ভাবল, "এই লোকটি সৌন্দর্যের খুব কদর করে। আমি ফুলটি তাকেই দেব।" সে নিচে নেমে এল এবং লোকটির কাছে বসল।

পাখিটিকে দেখে লোকটি ভীষণ আনন্দিত হল। সে বলল, "আহা! তোমার কাছে কী চমৎকার একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও। আমার নকশার কাজে ঠিক ওই বিশেষ নকশাটিরই অভাব ছিল। আমি যদি এটি আমার কাজে জুড়ে দিই, তবে আমার এই নকশাটিই হবে পৃথিবীর সেরা। আমি এই কাপড়টি রাজাকে উপহার দেব এবং তখন সবাই আমার নাম জানতে পারবে!"



পাখিটি আবার রেগে গেল এবং সে সেখান থেকে উড়ে পালাল। এরপর নিচের দিকে তাকাতেই সে এক ঝাঁক পায়রা দেখতে পেল। একজন মহিলা পায়রাগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন। পাখিটি ভাবল, "দেখে মনে হচ্ছে এই মহিলা পাখিদের খুব ভালোবাসেন। আমি ফুলটি তাঁকেই দেব।"

তাই সে নিচে নেমে এল এবং ক্ষুধার্ত পায়রাগুলোর কাছে বসল। মহিলা পাখিটিকে দেখতে পেলেন এবং সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আরে! তোমার কাছে তো খুব সুন্দর একটি ফুল রয়েছে! দয়া করে এটি আমাকে দাও। আমি এটি দেবতাদের চরণে নিবেদন করব, আর তাতেই আমার সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" পাখিটি আবার রেগে উড়ে চলে গেল।



হঠাৎই সে দেখতে পেল, একটি ছোট মেয়ে একা হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথার ওপর ছিল এক কলসি জল। পাখিটি দ্রুত নিচে নেমে এল এবং মেয়েটির কাঁধে এসে বসল। এরপর সে সেই সুন্দর ফুলটি মেয়েটির চুলে গুঁজে দিল।

পাখিটিকে দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। ফুলটিকে তার চুলের মধ্যে পেয়ে সে আরও বেশি অবাক হল।



পাখিটি তাকে বলল, "এটি তোমার জন্য! তোমার সেই প্রচেষ্টার জন্য, যা এই ফুলটির মতনই সুন্দর।"

সুস্মিতা ব্যানার্জি

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

আমার নাম কী?

এক উষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, 'ই' নামের একটি মাছি একটি মাঠে ভনভন করে উড়ছিল। হঠাৎই সে তার নিজের নাম ভুলে গেল! মাছিটি উড়ে একটি বাছুরের কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, "গোলগাল বাছুর! আমার নাম কী?"

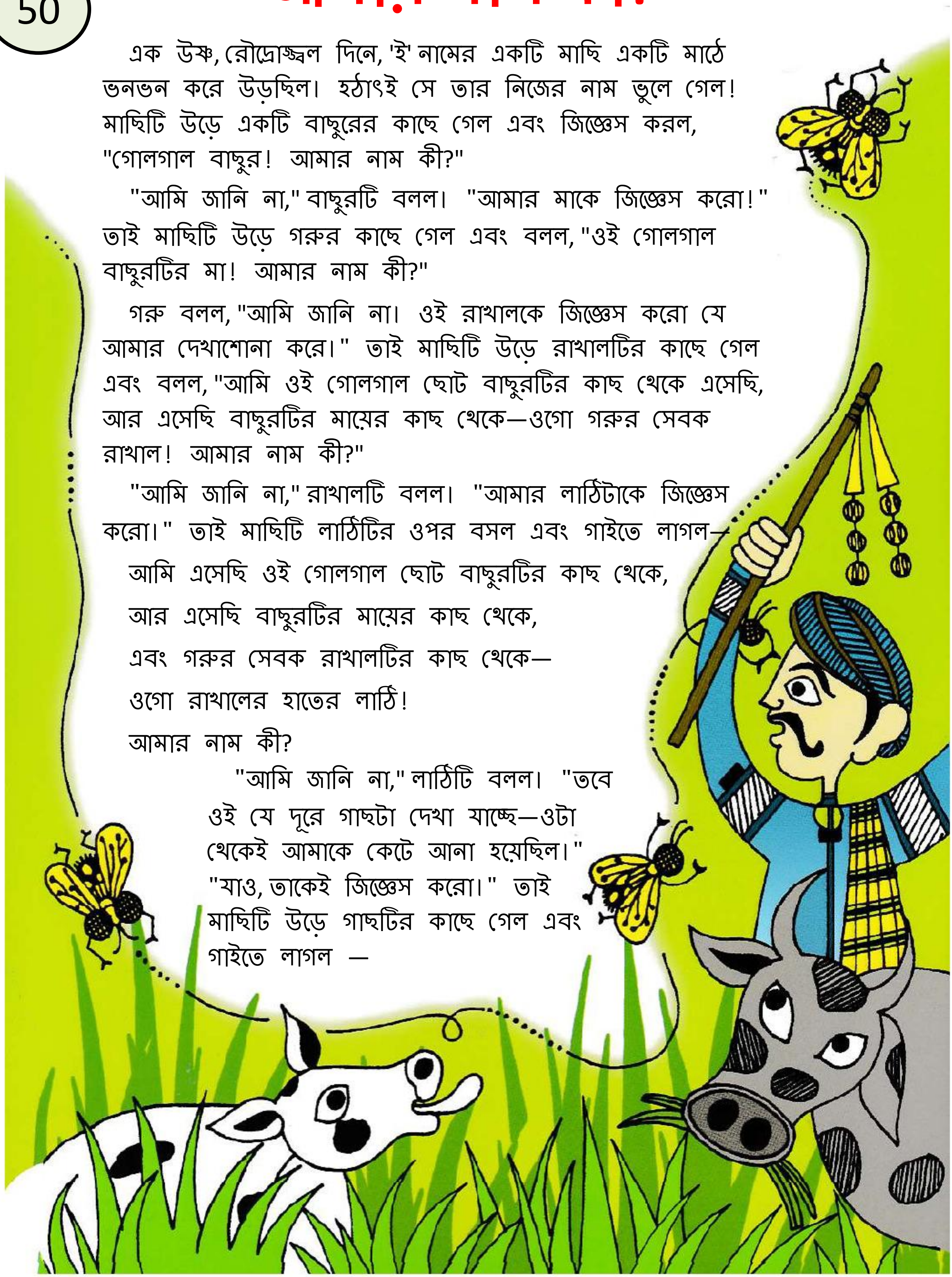
"আমি জানি না," বাছুরটি বলল। "আমার মাকে জিজ্ঞেস করো!" তাই মাছিটি উড়ে গরুর কাছে গেল এবং বলল, "ওই গোলগাল বাছুরটির মা! আমার নাম কী?"

গরু বলল, "আমি জানি না। ওই রাখালকে জিজ্ঞেস করো যে আমার দেখাশোনা করে।" তাই মাছিটি উড়ে রাখালটির কাছে গেল এবং বলল, "আমি ওই গোলগাল ছোট বাছুরটির কাছ থেকে এসেছি, আর এসেছি বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে—ওগো গরুর সেবক রাখাল! আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," রাখালটি বলল। "আমার লাঠিটাকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি লাঠিটির ওপর বসল এবং গাইতে লাগল—

আমি এসেছি ওই গোলগাল ছোট বাছুরটির কাছ থেকে,
আর এসেছি বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে,
এবং গরুর সেবক রাখালটির কাছ থেকে—
ওগো রাখালের হাতের লাঠি!
আমার নাম কী?

"আমি জানি না," লাঠিটি বলল। "তবে ওই যে দূরে গাছটা দেখা যাচ্ছে—ওটা থেকেই আমাকে কেটে আনা হয়েছিল।" "যাও, তাকেই জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে গাছটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —





"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো গাছ, যে দিয়েছে লাঠিটি!

আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," গাছটি বলল। "আমার ডালে বসে থাকা বকটিকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে বকটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো বক, যে বসে আছ গাছটির ডালে!

আমার নাম কী?"

"আমি জানি না," বকটি বলল। "যে পুকুরে আমি বাস করি, তাকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে পুকুরটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো পুকুর, যেখানে বকটি বাস করে!

আমার নাম কী?"

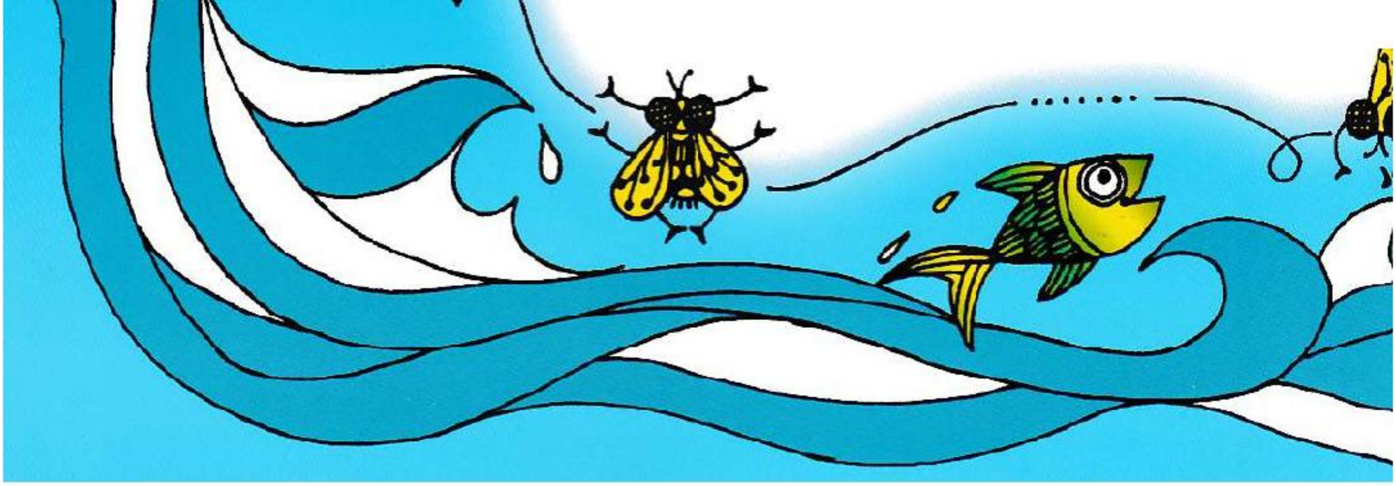
"এই বড় মাছটিকে জিজ্ঞেস করো," পুকুরটি বলল। তাই মাছিটি উড়ে মাছটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

"আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ, যে সাঁতরাচ্ছ পুকুরের জলে!

আমার নাম কী?"

"আমি কী করে জানব?" মাছটি বলল। "জেলেকে জিজ্ঞেস করো।" তাই মাছিটি উড়ে জেলের কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —



আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ-ধরা জেলে!

আমার নাম কী?

"আমার মাছ-রাখার পাত্রটিকে জিজ্ঞেস করো," জেলেটি বলল। তাই মাছিটি উড়ে গিয়ে সেই মাছ-রাখার পাত্রটির কাছে পৌঁছাল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাছ-রাখার পাত্র!

আমার নাম কী?

"দুঃখিত!" মাছ-রাখার পাত্রটি বলল। "যাও, সেই কুমোরকে জিজ্ঞেস করো যে আমাকে তৈরি করেছে।" তাই মাছিটি উড়ে চলল, যতক্ষণ না সে কুমোরের চালাঘরে পৌঁছাল; সেখানে গিয়ে সে গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো কুমোর, যে পাত্র তৈরি করে!

আমার নাম কী?

"আমি জানি না," কুমোরটি বলল। "সেই মাটিকে জিজ্ঞেস করো যা আমি ব্যবহার করি।" তাই মাছিটি উড়ে নিচে নেমে মাটির কাছে গেল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো মাটি, যা কুমোর ব্যবহার করে!

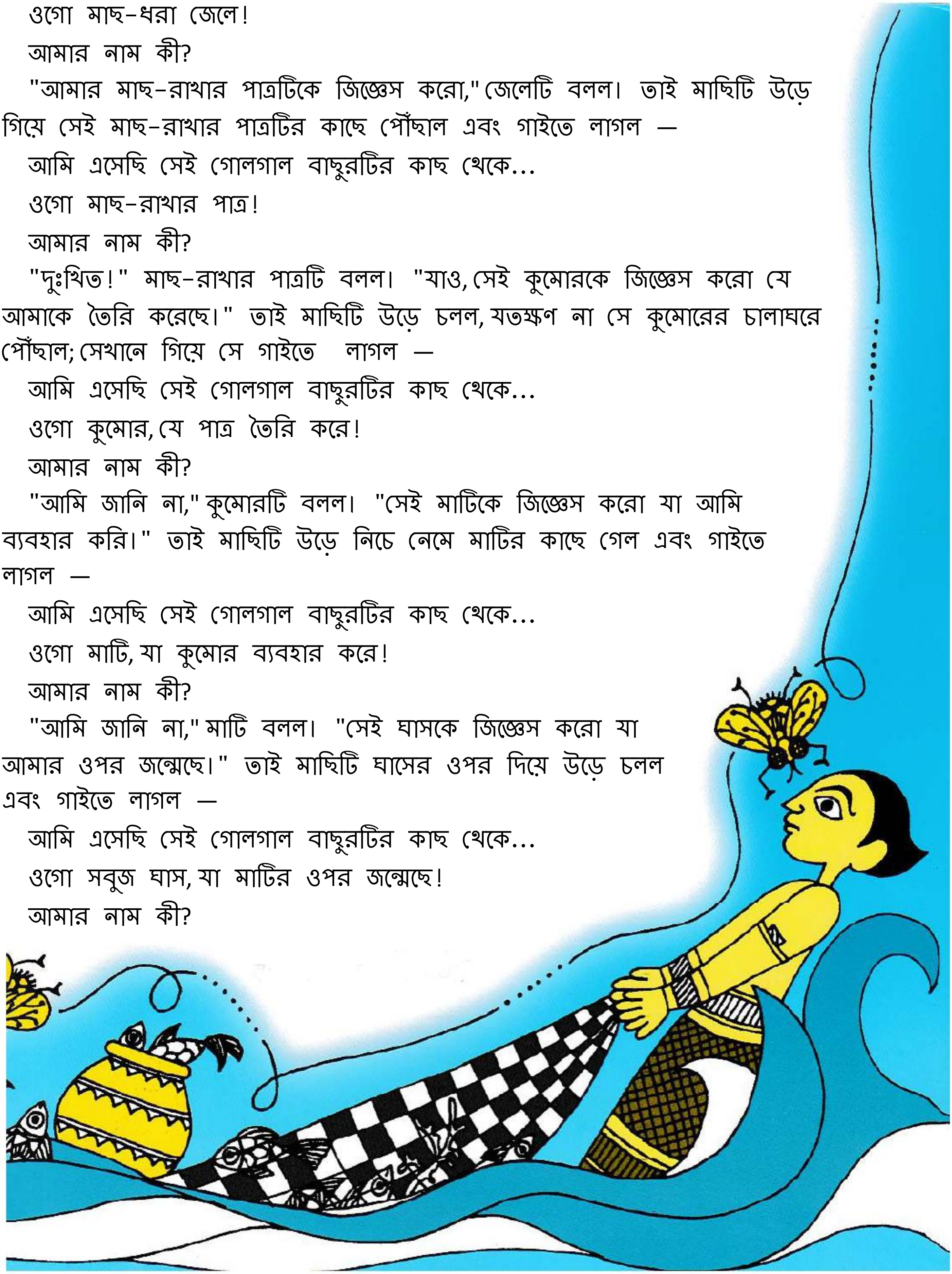
আমার নাম কী?

"আমি জানি না," মাটি বলল। "সেই ঘাসকে জিজ্ঞেস করো যা আমার ওপর জন্মেছে।" তাই মাছিটি ঘাসের ওপর দিয়ে উড়ে চলল এবং গাইতে লাগল —

আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে...

ওগো সবুজ ঘাস, যা মাটির ওপর জন্মেছে!

আমার নাম কী?



"আমি জানি না!" ঘাসটি বলল। "সেই ঘোড়াটিকে জিজ্ঞেস করো যে আমাকে খাচ্ছে।" তাই মাছিটি উড়ে গিয়ে ঘোড়াটির কাছে পৌঁছাল এবং গাইতে লাগল —



আমি এসেছি সেই গোলগাল বাছুরটির কাছ থেকে

এবং সেই বাছুরটির মায়ের কাছ থেকে
এবং সেই রাখালের কাছ থেকে যে গরু চরায়
এবং সেই লাঠিটির কাছ থেকে যা রাখালের
হাতে ছিল
এবং সেই গাছটির কাছ থেকে যা থেকে লাঠিটি
পাওয়া গিয়েছিল
এবং সেই বকটির কাছ থেকে যা গাছটিতে বসে ছিল
এবং সেই পুকুরটির কাছ থেকে যেখানে বকটি থাকে
এবং সেই মাছটির কাছ থেকে যা পুকুরে সাঁতার কাটে
এবং সেই জেলের কাছ থেকে যে মাছ ধরে
এবং সেই পাত্রটির কাছ থেকে যেখানে মাছ রাখা হয়
এবং সেই কুমোরের কাছ থেকে যে পাত্র তৈরি করে
এবং সেই মাটির কাছ থেকে যা কুমোর ব্যবহার করে
এবং সেই সবুজ ঘাসটির কাছ থেকে যা মাটির ওপর
জন্মেছে—
ওগো ঘোড়া, যে ঘাস খাচ্ছ!
আমার নাম কী?

ঘোড়াটি "ই–ই–ই" করে ডাক ছাড়ল এবং বলল, "উড়ে যাও, উড়ে যাও, উড়ে যাও!" "ওটাই তো আমার নাম!" বলল মাছিটি। আর তারপর সে আনন্দে গান গাইতে গাইতে উড়ে গেল—"ই, ই, ই!"

তামিলনাড়ুর একটি লোককথা
(তামিল ভাষায় 'মাছি'-র অর্থ হলো 'ই'।)

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy



বানর-নেতা ও রাক্ষস

একদা একদল বানর নতুন বাসস্থানের খোঁজে এক দূরবর্তী অরণ্যের দিকে যাত্রা করল। বানর-নেতা তাদের বলল, "এই অরণ্যের পুকুরগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার ভেতরে এক ভয়ংকর রাক্ষস বাস করে! আমাকে আগে না জিজ্ঞেস করে কেউ যেন কোনো পুকুরের জল পান করার চেষ্টা না করে!"

নেতা সেই এলাকার সমস্ত পুকুর পরিদর্শন করল। যখন সে নিশ্চিত হল যে পুকুরগুলো নিরাপদ, তখন সে দলটিকে সেখান থেকে জল পান করার অনুমতি দিল। বানরদল তাদের নতুন বাসস্থানে স্থিত হল।

একদিন তারা অরণ্যের এক নতুন অংশে গিয়ে পৌঁছাল। পথটা ছিল বেশ দীর্ঘ। একটি ছোট বানর ছানা বলল, "মা, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে!"





এক মুহূর্ত না ভেবেই তার মা উত্তর দিল, "ওই দেখো! আমি একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছি। চলো, ওখান থেকেই কিছুটা জল পান করি।"

"থামো! পুকুরের কাছে যেও না!" অন্য একটি বানর বলে উঠল। "তোমরা কি আমাদের নেতার সতর্কবাণীর কথা ভুলে গেছ?"

বানর-নেতা তাদের কাছে এগিয়ে এল। "তোমরা কি জল চাও? তবে একটু অপেক্ষা করো, আমি আগে পুকুরটি পরীক্ষা করে দেখি।"

সে পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল এবং খুব কাছ থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করল। "আহা!" সে বলে উঠল। "সব পায়ের ছাপই জলের দিকে গেছে। কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পায়ের ছাপ নেই। নিশ্চয়ই এটি সেই পুকুর, যেখানে রাক্ষসটি বাস করে!"

সে সব বানরকে ডেকে জড়ো করল। "শোনো সবাই," সে বলল। "এই পুকুরটি বিপজ্জনক। কেউ যেন এর ধারে-কাছেও না যায়।"

নেতার কথা শেষ হতে না হতেই পুকুরের ভেতর থেকে এক বীভৎস অট্টহাসি ভেসে এল: "হাহাহাহাহাহা!" জল ফুঁড়ে এক রাক্ষস উঠে এল। "যে-ই এই পুকুরের কাছে আসবে, আমি তাকেই গিলে খেয়ে ফেলব," সে হুমকি দিল।

" যদি আমরা পুকুরের মধ্যে নামি, তবেই তো তুমি আমাদের গিলে খেতে পারবে । আর আমাদের মধ্যে কেউই তেমন বোকামি করবে না," বানর-নেতা শান্তভাবে উত্তর দিল।

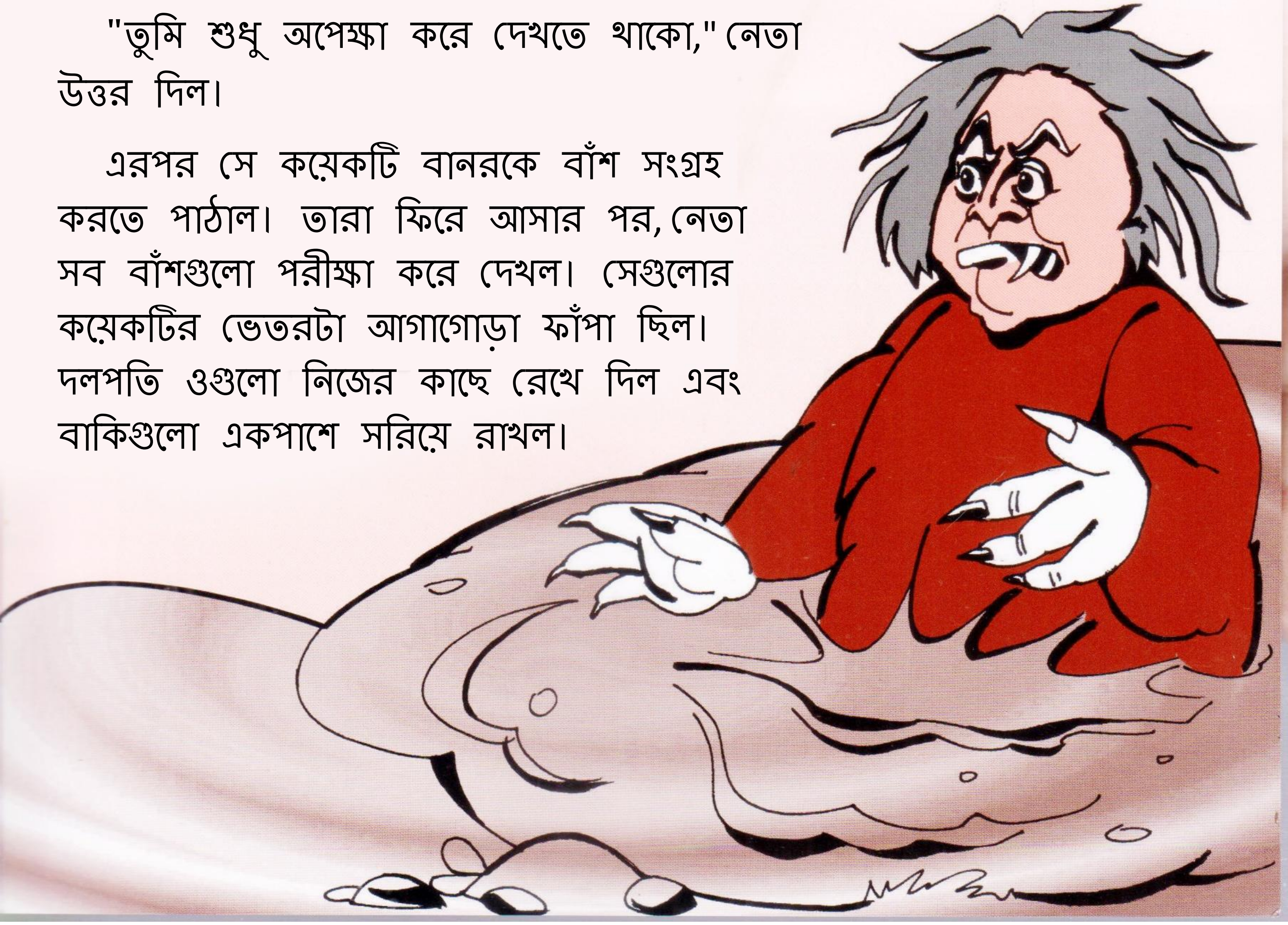
"তাহলে তো তোরা সবাই মারা যাবি! নাকি জল পান না করেও তোরা বেঁচে থাকতে পারবি?" রাক্ষসটি বিদ্রূপ করে বলল।

বানর-নেতা বলল, "একদমই না! আমরা তোমার পুকুরের জলই পান করব।"

"সেটা কীভাবে করবি?" রাক্ষসটি জানতে চাইল।

"তুমি শুধু অপেক্ষা করে দেখতে থাকো," নেতা উত্তর দিল।

এরপর সে কয়েকটি বানরকে বাঁশ সংগ্রহ করতে পাঠাল। তারা ফিরে আসার পর, নেতা সব বাঁশগুলো পরীক্ষা করে দেখল। সেগুলোর কয়েকটির ভেতরটা আগাগোড়া ফাঁপা ছিল। দলপতি ওগুলো নিজের কাছে রেখে দিল এবং বাকিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল।

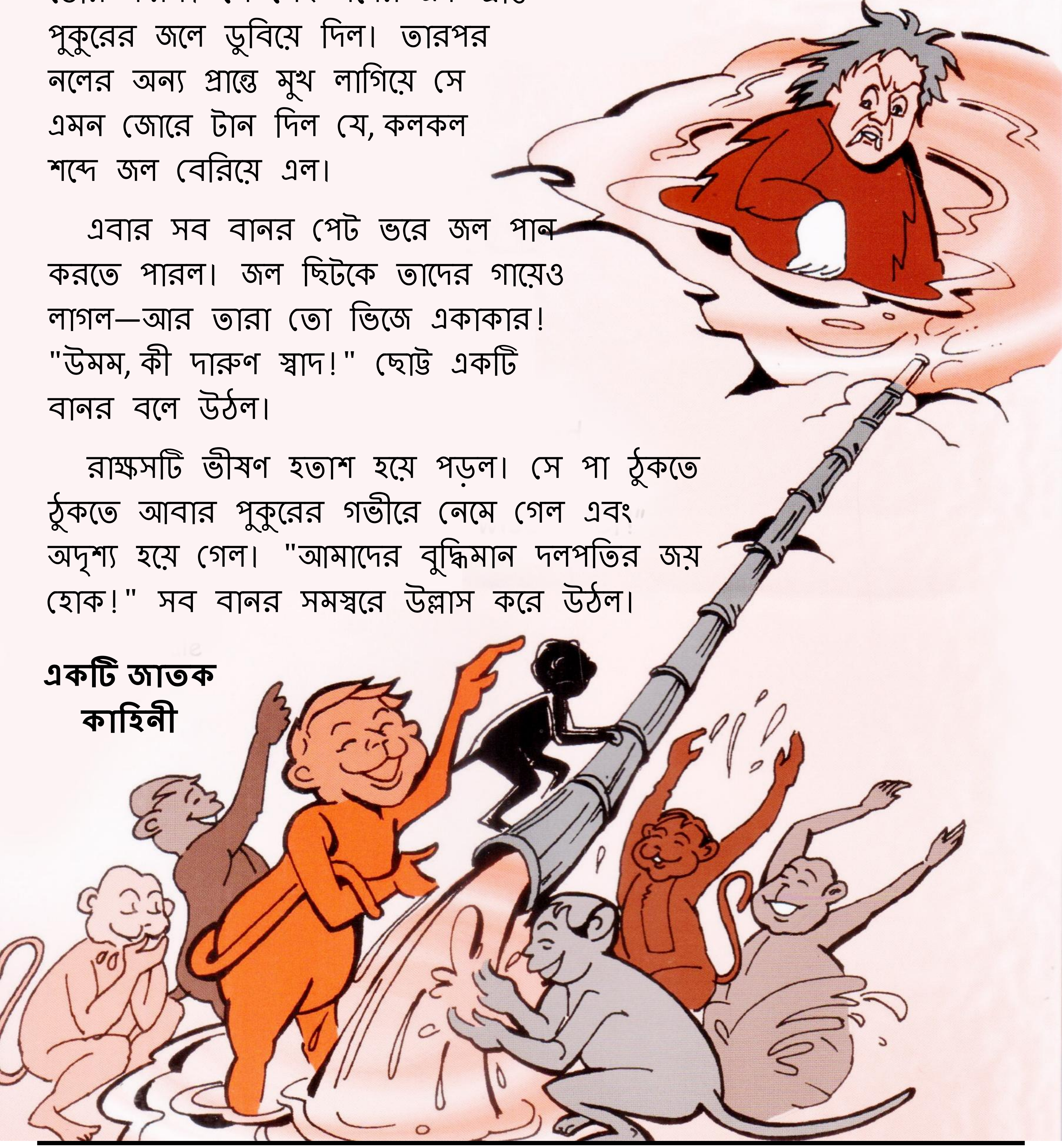


এরপর, সেই ফাঁপা বাঁশগুলো সব একজায়গায় করে, সে একটির ভেতর দিয়ে আরেকটি ঢুকিয়ে একটি লম্বা নল তৈরি করল। সে সেই নলের এক প্রান্ত পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর নলের অন্য প্রান্তে মুখ লাগিয়ে সে এমন জোরে টান দিল যে, কলকল শব্দে জল বেরিয়ে এল।

এবার সব বানর পেট ভরে জল পান করতে পারল। জল ছিটকে তাদের গায়েও লাগল—আর তারা তো ভিজে একাকার! "উমম, কী দারুণ স্বাদ!" ছোট্ট একটি বানর বলে উঠল।

রাক্ষসটি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। সে পা ঠুকতে ঠুকতে আবার পুকুরের গভীরে নেমে গেল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। "আমাদের বুদ্ধিমান দলপতির জয় হোক!" সব বানর সমস্বরে উল্লাস করে উঠল।

একটি জাতক কাহিনী



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhare

Artist Uma Krishnaswamy

মেরি খুশি

দীপা যখন ঘরে ঢুকল, তখন মেরি হাতে একটি কাগজ উঁচিয়ে ধরে ছিল। "ওহ, এটা তো একটা ছবি!" দীপা বলে উঠল। "আমি কি দেখতে পারি?"

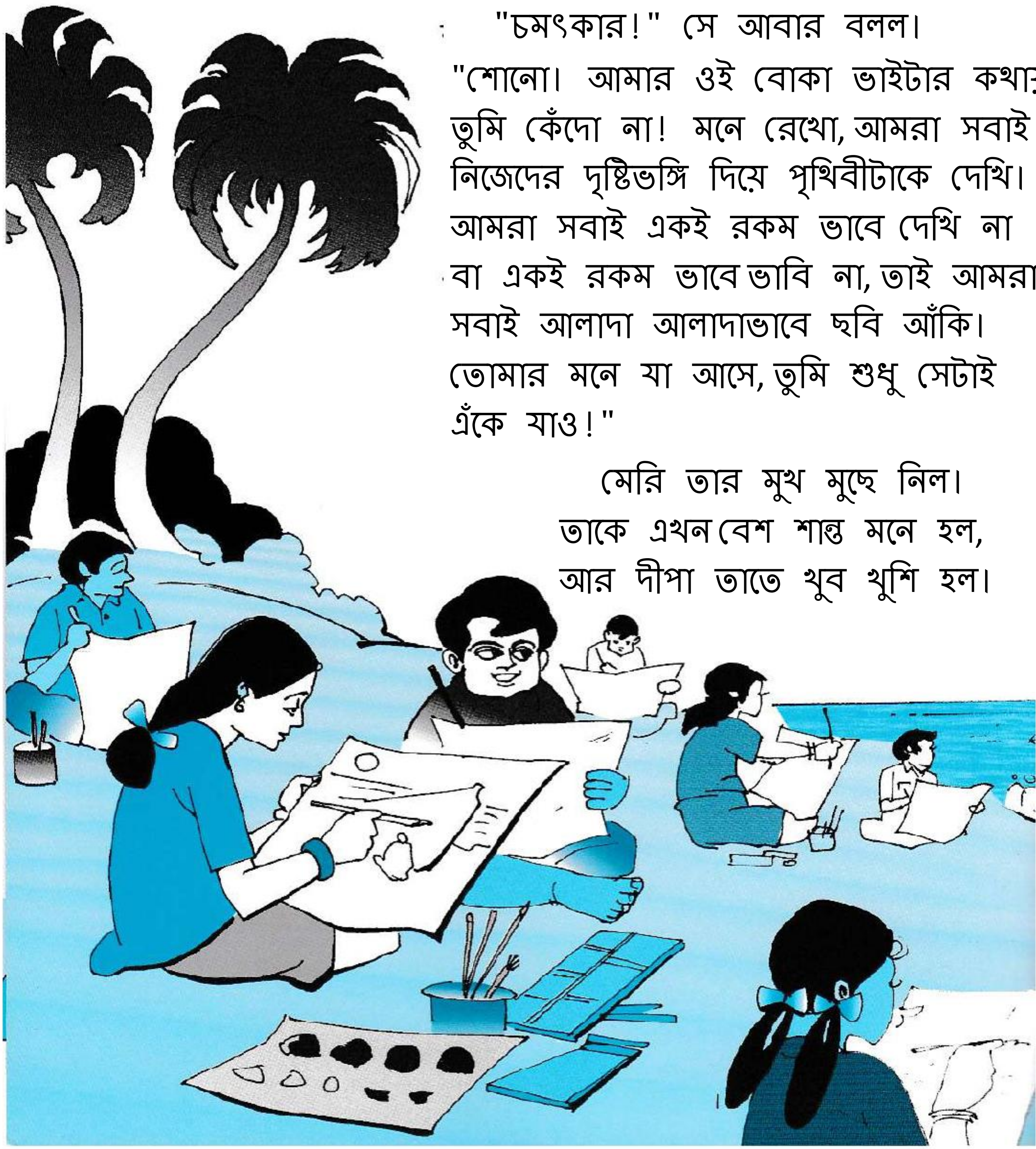
এরপর সে তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। মেরির চোখ জলে ছলছল করছিল! দীপা তো অবাক। "কেঁদো না!" সে বলল। "কী হয়েছে?"

"আমি তোমার বাগানে বসে ছবি আঁকছিলাম," মেরি ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল। "রঘু সেখানে এল আর আমার ছবিটা দেখল। সে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল, দীপা!"



"ওহ, মেরি!" দীপা বলল। মেরি তার চোখের জল আটকে রাখার চেষ্টা করল। "ও বলল আমার ছবিটা একদমই ভালো হয়নি!" মেরি বলতে থাকল। "আমি আর কখনোই, ছবি আঁকব না! কক্ষনো না!"

"কিন্তু এটা তো চমৎকার হয়েছে!" দীপা বলল। খুব যত্ন করে সে মেরির হাত থেকে আঁকা ছবিটি নিল। সে খুব কাছ থেকে ছবিটি খুঁটিয়ে দেখল।



"চমৎকার!" সে আবার বলল। "শোনো। আমার ওই বোকা ভাইটার কথায় তুমি কেঁদো না! মনে রেখো, আমরা সবাই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখি। আমরা সবাই একই রকম ভাবে দেখি না বা একই রকম ভাবে ভাবি না, তাই আমরা সবাই আলাদা আলাদাভাবে ছবি আঁকি। তোমার মনে যা আসে, তুমি শুধু সেটাই এঁকে যাও!"

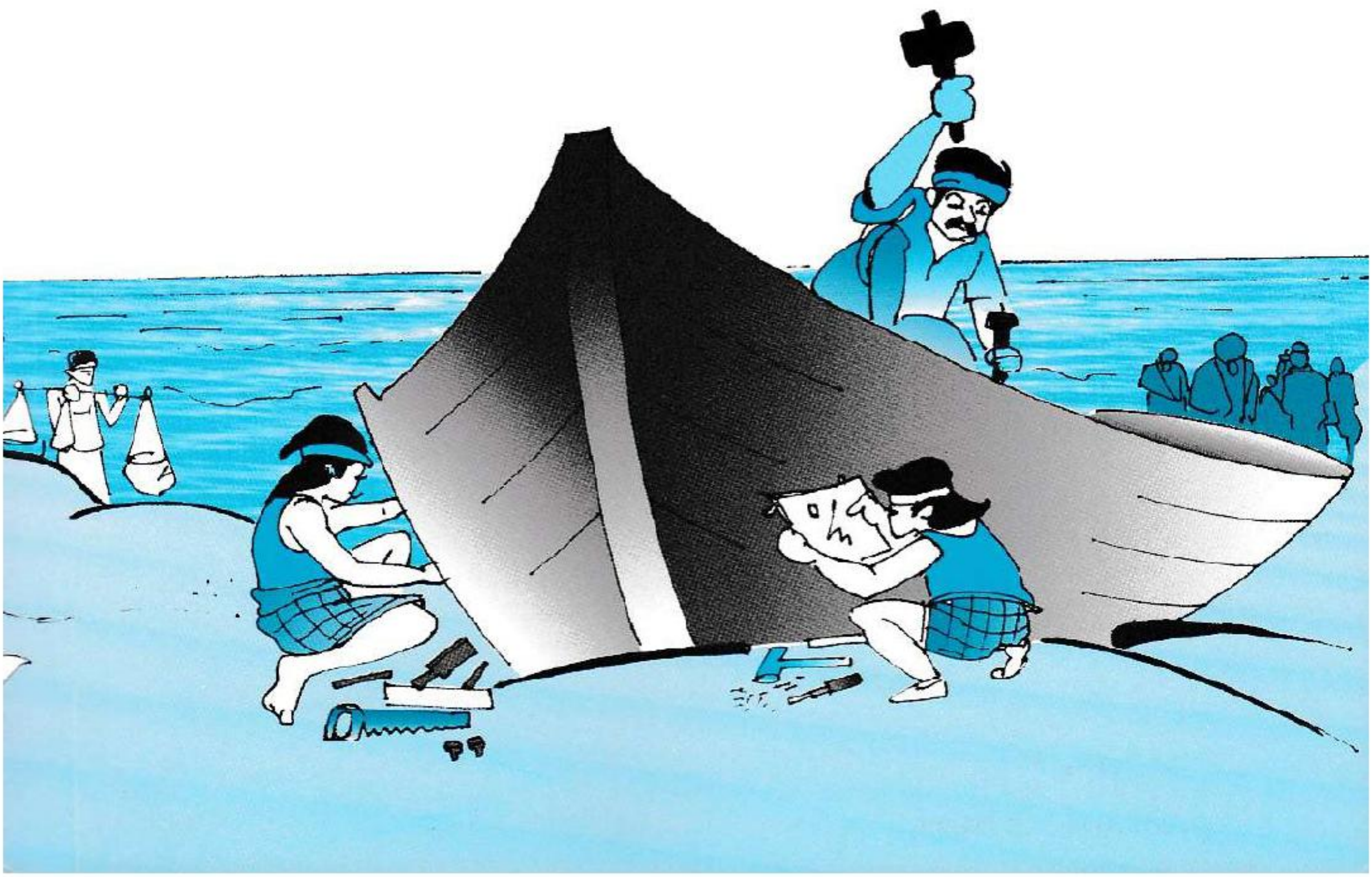
মেরি তার মুখ মুছে নিল। তাকে এখন বেশ শান্ত মনে হল, আর দীপা তাতে খুব খুশি হল।

পরের সপ্তাহে, দীপার আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। মেরি আর দীপা তাদের সাথে সমুদ্রসৈকতে একটি দিন কাটাতে গেল। দীপা সাথে করে পেন্সিল, কাগজ, রং আর তুলি নিয়ে গেল।

তাদের চারপাশেই সমুদ্রসৈকতটি নানা রকম কর্মকাণ্ডে সরগরম হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন জেলে তাদের নৌকা মেরামত করছিল। অন্যরা তাদের ধরা মাছ তীরে নিয়ে আসছিল। মেরি, দীপা এবং তার পরিবারের সবাই এতে দারুণ আনন্দ পেল! সবাই ছবি আঁকার সরঞ্জাম তুলে নিল এবং নিজের নিজের ছবি আঁকতে বসে গেল।

কেবল মেরি একটু ইতস্তত করল। "আমি তো ছবি আঁকতে জানি না!" সে বলল। কিছুক্ষণ সে অন্যদের ছবি আঁকা দেখল। কিন্তু শীঘ্রই সে ও ছবি আঁকায় মগ্ন হয়ে গেল।

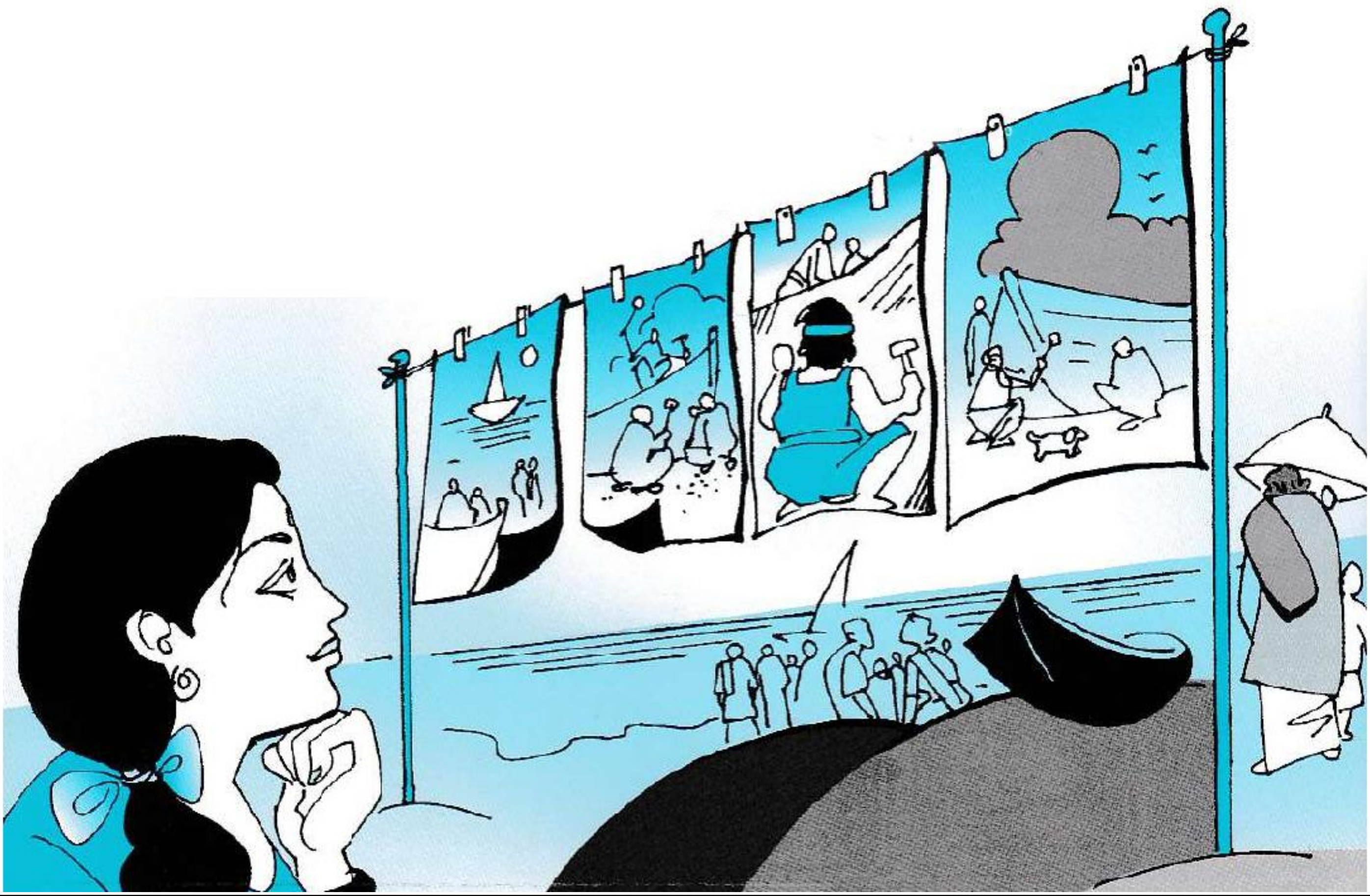
অবশেষে সবার ছবি আঁকা শেষ হল। ছবিগুলো শুকানোর জন্য টাঙিয়ে রাখা হল। আঁকা ছবিগুলো সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলো দেখল। কী আশ্চর্য!



তাদের সামনে ঠিক একই দৃশ্য ফুটে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিটি মানুষ সেই দৃশ্যটিকে নিজেদের মতন করে এঁকেছিল ও রাঙিয়েছিল। মেরির মনে পড়ে গেল দীপার কথাগুলো। "আমরা সবাই একই দৃষ্টিতে দেখি না, কিংবা একই ভাবে ভাবি না—আর আমরা সবাই একই ভাবে ছবিও আঁকি না!"

"দীপা ঠিকই বলেছে!" সে বলল। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সে তার আঁকা ছবিটি হাতে তুলে নিল। এরপর সে সেই ছবিটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প বলতে শুরু করল। দীপা এবং বাকি সবাই তো অবাক! "তুমি যে কী চমৎকার গল্প বলতে পারো, মেরি!" তারা তাকে বলল। সেই দিনটি ছিল মেরির জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন।

সেই ঘটনার পর থেকে, মেরি সব কিছু সে ভাবেই আঁকে যে ভাবে সে তার নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পায়। অন্যরা কী বলবে তা নিয়ে সে আর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করে না। তার আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে এবং সে তার কাজ বেশ উপভোগ করে। আর ছবি আঁকা শেষ করার পর, সে সেই ছবিগুলোকে ঘিরে একের পর এক চমৎকার সব গল্প শোনায়!



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi **Bengali** Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi **Artist** Uma Krishnaswamy

পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!

একদিন একটি ছোট খরগোশ একটি তালগাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল।

কাছেই, একটি উঁচু বেলগাছ থেকে একটি বেল নিচে খসে পড়ল। বেলটি তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝনঝন শব্দ করতে করতে মাটিতে এসে পড়ল। মাটিতে থাকা একটি পাথরের সাথে বেলের শক্ত খোসাটির ধাক্কা লাগতেই 'ঠক' করে একটি শব্দ হলো।

শব্দ শুনে খরগোশটি ধড়মড় করে জেগে উঠল। "ওহ, সর্বনাশ!" সে মনে মনে ভাবল। "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!" এই ভেবে সে দৌড়াতে শুরু করল।

একে একে অন্য খরগোশগুলোও তার পিছু নিল। তাদের কেউই জানত না তারা কেন দৌড়াচ্ছে!

একটি হরিণ তাদের ছুটে আসতে দেখল। "তোমরা সবাই দৌড়াচ্ছ কেন?" সে জিজ্ঞেস করল। "তোমাদের পেছনে কি কেউ তাড়া করেছে?" ছোট খরগোশটি উত্তর দিল, "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! দৌড়াও! দৌড়াও!" তাই হরিণটিও দৌড়াতে শুরু করল।



রাস্তার পাশে একটি ভালুক দাঁড়িয়ে ছিল। "হরিণ, তুমি এভাবে দৌড়াচ্ছ কেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

"তোমারও দৌড়ানো উচিত! পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!" হরিণটি বলল। সে ভালুকটিকে পাশ কাটিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল এবং দৌড়াতে থাকল।

এবার ভালুকটিও দৌড়াতে শুরু করল। একটি শিয়াল তাকে ডেকে বলল, "ভালুক ভাই! কী হয়েছে? তুমি দৌড়াচ্ছ কেন?"

"পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! নিজেকে বাঁচাও!" ভালুকটি পেছন থেকে চিৎকার করে বলল।

আরও অনেক প্রাণী তাদের সাথে যোগ দিল। শিয়ালের পর এল ষাঁড়। তারপর এল শূকর, গণ্ডার, হাতি এবং বাঘ।



সিংহ তাদের ছুটে আসতে দেখে ভাবল, 'এ কী কাণ্ড? বাঘ আর হরিণ, ভালুক আর শূকর, শিয়াল আর খরগোশ—সবাই মিলে একসাথে দৌড়াচ্ছে?'

"থামো!" সে গর্জন করে বলল। "তোমরা সবাই দৌড়াচ্ছ কেন?"



বাঘের নিঃশ্বাসে তখনো এতটুকু জোর বাকি ছিল যে সে উত্তর দিতে পারল, "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! দৌড়াও! দৌড়াও!"

"ফেটে যাচ্ছে? পৃথিবী?" সিংহ মনে মনে ভাবল। "আমি এটা বিশ্বাস করি না। এই প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিছু একটা এদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে... আমাকে অবশ্যই এটা থামাতে হবে!"



এরপর সে গর্জন করে উঠল। একবার নয়, দুবার নয়—বরং তিনবার:
"গোওওওম! গোওওওম গোওওওম!"

অবশেষে ছুটে চলা পশুদের সেই ভিড়টি থেমে গেল। সিংহ তাদের জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কে বলল যে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে?"

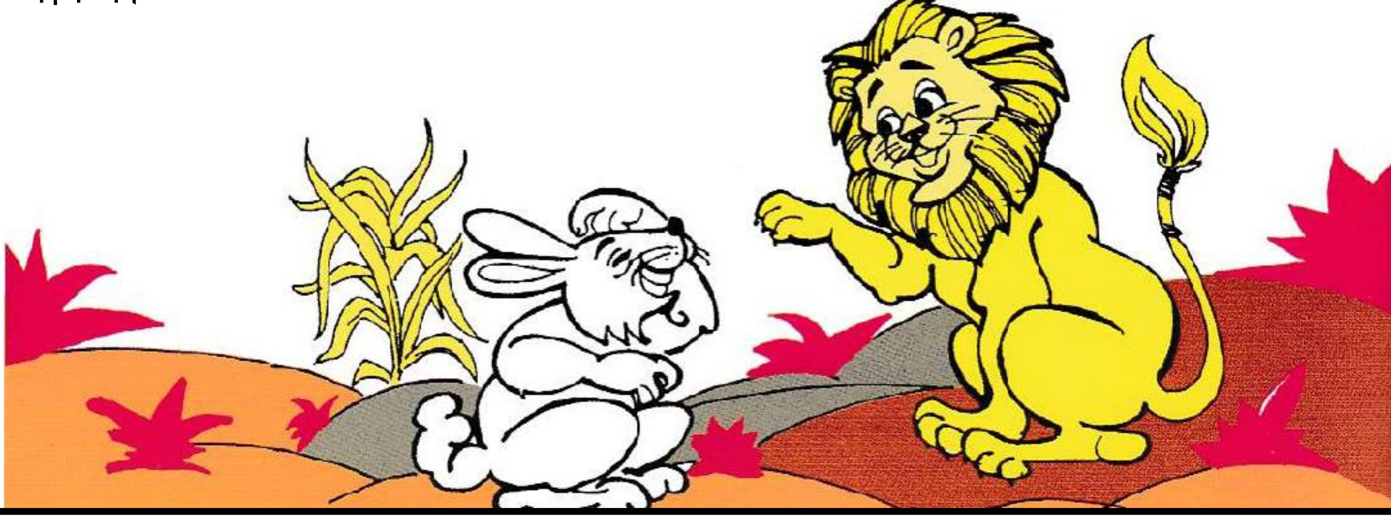
বাঘটি এগিয়ে এল। সে বলল, "হাতি আমাকে বলেছে।" সিংহ হাতিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কে বলল যে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে?" হাতি বলল, "গণ্ডার আমাকে বলেছে।"

এরপর গণ্ডার, শূকর, ষাঁড়, শেয়াল, ভালুক এবং হরিণ—সবাই একে অপরের নাম বলল। এবার খরগোশের পালা এল। সে বলল, "হ্যাঁ! আমি নিজেই শুনেছি পৃথিবী ফেটে যাওয়ার শব্দ!"

সিংহ জিজ্ঞেস করল, "এটা কোথায় হয়েছিল? আমাকে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও যেখানে তুমি ওই শব্দ শুনেছ।" খরগোশ পথ দেখিয়ে তালগাছটির কাছে নিয়ে গেল। আর সেখানে সবার চোখের সামনেই পড়ে ছিল সেই বেলফলটি, যা নিচে পড়ে ফেটে গিয়েছিল।

ঠিক তখনই তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝনঝন শব্দ করে আরেকটি বেলফল মাটিতে এসে পড়ল। 'ঠক' শব্দ করে সেটিও ফেটে গেল।

সিংহ হেসে বলল, "এই শব্দটাই খরগোশ শুনেছিল।" খরগোশও তার সাথে হেসে উঠল। এরপর বাকি সব পশুরাও হাসিতে যোগ দিল। তারা একে অপরকে বলল, "মজাটা তো আমাদের নিয়েই হল!" তারা হাসতেই থাকল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

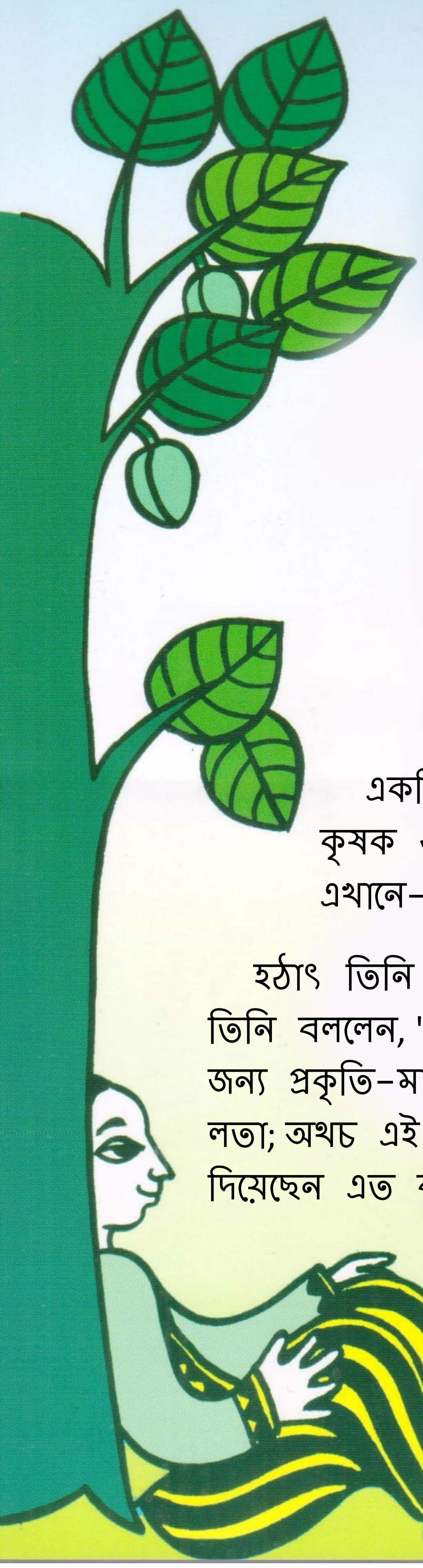
Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

54 প্রকৃতির বিস্ময়

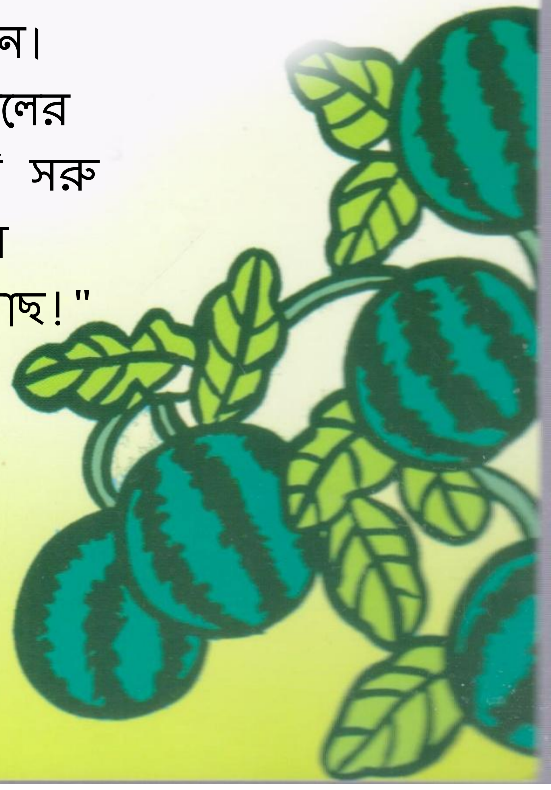
সেটি ছিল একটি চমৎকার দিন। মাঠের ওপরের বাতাস যেন চকমক করছিল । কৃষক তার কাস্তেটি নামিয়ে রাখলেন এবং একটি বাদাম গাছের ছায়ায় বসলেন। তিনি পরম তৃপ্তিতে চারপাশের সবুজে ঘেরা সজীব গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বাহ, তরমুজের ক্ষেতটা তো দারুণ হয়েছে!" তিনি মনে মনে বললেন। "ওই পাকা ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। আর দু-একদিনের মধ্যেই ওগুলো এত বড় হয়ে যাবে যে, বয়ে নিয়ে যাওয়াটাই মুশকিল হয়ে পড়বে!"



একটি কাঠবিড়ালি কিচিরমিচির করে তার দিকে ডাকল। কৃষক ওপরে বাদাম গাছের ডালপালার দিকে তাকালেন। এখানে-সেখানে তিনি ঝুলন্ত ফলগুলো দেখতে পেলেন।

হঠাৎ তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "তরমুজের মতো বিশাল ফলের জন্য প্রকৃতি-মাতা দিয়েছেন কেবল একটি সরু লতা; অথচ এই ছোট্ট বাদামের জন্য তিনি দিয়েছেন এত বড় আর মজবুত একটি গাছ!"



কথাটির ওপর জোর দিতে তিনি গাছের গুঁড়িতে একটি চাপড় দিলেন।—হঠাৎ, ওপর থেকে একটি বাদাম সোজা তার মাথার ওপর এসে পড়ল!

কৃষক তো হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর তিনি বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, "আহ! বাদাম গাছের ফলগুলো যদি তরমুজের আকারের হতো, তবে তো আজ আমার জীবনই শেষ হয়ে যেত! কী অলৌকিকভাবেই না আমি বেঁচে গেলাম!"

তিনি গাছটির নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন এবং প্রকৃতির এই রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

ইরানের একটি লোককথা



পথিক ও ডাব

মার্কোস এক গোছা ডাব নিয়ে কৃষকদের বাজারে যাচ্ছিলেন। তিনি বেশ তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলেন। গলিতে একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর ঘোড়াটি থামালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "বাজারে পৌঁছাতে আমার আর কতক্ষণ সময় লাগবে?"

ছেলেটি গভীর চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে ঘোড়ার পিঠে স্তূপ করে রাখা ডাবগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, "আপনি যদি খুব দ্রুত যান, তবে আপনার পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যাবে। আর আপনি যদি ধীরে-সুস্থে যান, তবে শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে যাবেন।"

ছেলেটির কথা শুনে মার্কোস তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। "এই ছেলেটা বেচারা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে!" তিনি মনে মনে ভাবলেন। ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে দ্রুত পায়ে হাঁটিয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। আর ঠিক তখনই ঘটল সেই বিপত্তি! ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাবগুলো ছিটকে নিচে মাটিতে পড়তে শুরু করল!



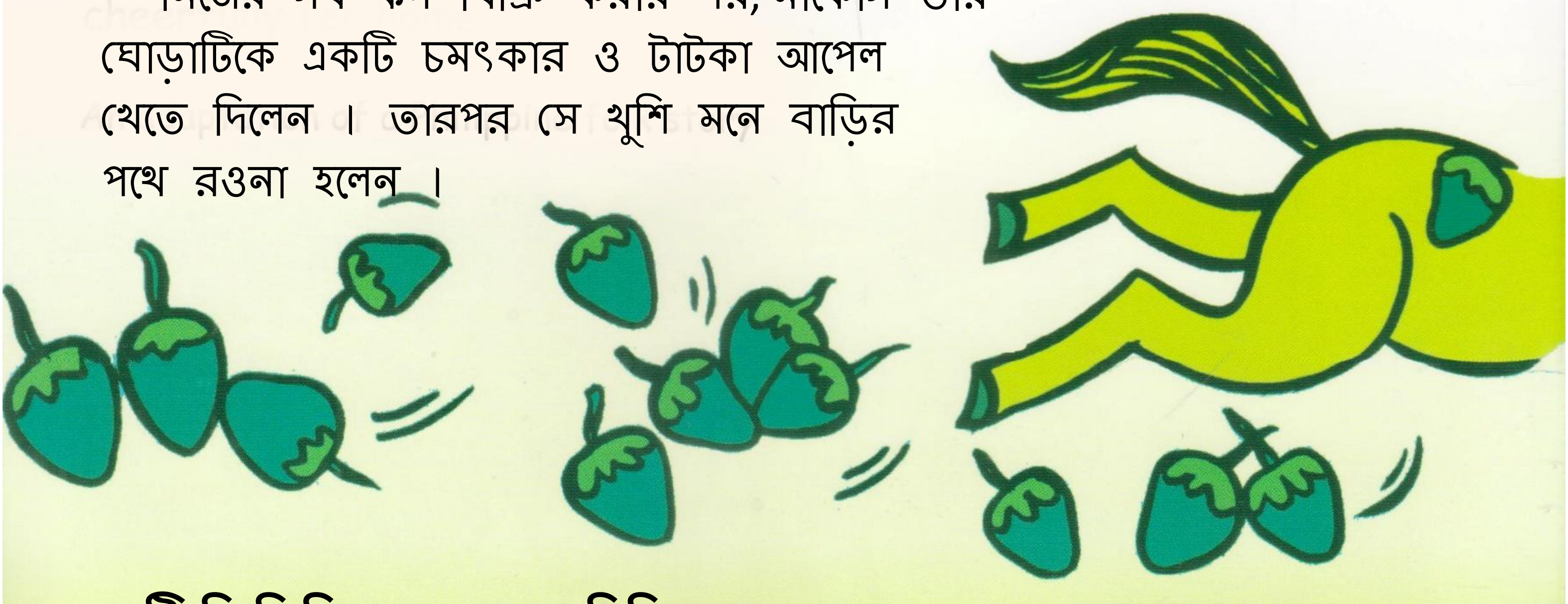
বেচারা মার্কোস ঘোড়াটি থামালেন এবং নিচে পড়ে যাওয়া ফলগুলি কুড়িয়ে আনার জন্য ছুটে গেলেন। দ্রুত সেগুলো আবার বেঁধে নিয়ে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। ওহ! আবার বেশ কিছু ডাব ছিটকে নিচে পড়ে গেল! সেগুলো গড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মার্কোস আবার ঘোড়াটি থামালেন। তিনি আবার নিচে পড়ে যাওয়া ফলগুলি কুড়িয়ে নিলেন ও আবার সেগুলিকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিলেন। এবার তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন এবং ঘোড়াটিকে চলতে বাধ্য করার জন্য তার দড়ি ধরে সজোরে টান দিলেন । কিন্তু ঘোড়াটি হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল আর তার পিঠ থেকে সবকটি ডাব নিচে ফেলে দিল!

মার্কোসের তখন কেঁদেই ফেলার মতো অবস্থা। কিন্তু তা না করে, তিনি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন এবং সেই ছেলেটির বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলেন । তারপর তিনি বলে উঠলেন , "আমি বুঝতে পেরেছি!"

সবকটি ডাব ঘোড়ার পিঠে খুব শক্ত করে বেঁধে নিয়ে, তিনি এবার ধীরেসুস্থে ও অত্যন্ত যত্নসহকারে ঘোড়াটিকে পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন । আর সত্যিই, বাজার বন্ধ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি সেখানে পৌঁছে গেলেন ।

নিজের সব ফল বিক্রি করার পর, মার্কোস তার ঘোড়াটিকে একটি চমৎকার ও টাটকা আপেল খেতে দিলেন । তারপর সে খুশি মনে বাড়ির পথে রওনা হলেন ।



একটি ফিলিপিনো লোককাহিনির রূপান্তর

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

55

নেভারস্পেন্ড এবং নেভারলেন্ড

নদীর ধারের এক গ্রামে দুই প্রতিবেশী বাস করত, যারা সবসময় ঝগড়া করত। তবে তা কোনো সম্পত্তি, টাকা-পয়সা বা এমন কিছুর জন্য নয়। না! তারা একে অপরের চেয়ে এতটাই আলাদা স্বভাবের ছিল যে, তাদের পক্ষে সহজে মিলেমিশে থাকা সম্ভব ছিল না।

এক প্রতিবেশী অন্য কাউকে সাহায্য করার জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে চাইত না। আর অন্য প্রতিবেশী তো নিজেকে সাহায্য করার জন্যও একটি পয়সা খরচ করতে চাইত না । সে বরং জিনিসপত্র ধার করতেই বেশি পছন্দ করত।

গ্রামবাসীরা তাদের দুটি ডাকনাম দিয়েছিল। তারা প্রথম প্রতিবেশীকে ডাকত 'নেভারলেন্ড' (Neverlend)—অর্থাৎ যে কখনো ধার দেয় না—আর দ্বিতীয়জনকে ডাকত 'নেভারস্পেন্ড' (Neverspend)—অর্থাৎ যে কখনো খরচ করে না।

একদিন বৃষ্টির দিনে, নেভারলেন্ড যখন বাড়ি ফিরছিল, ঠিক তখনই নেভারস্পেন্ড বাইরে যাচ্ছিল। নেভারস্পেন্ড বলল, "ভাই, তোমার ছাতাটা আমাকে একটু ধার দেবে? আমার নিজের কোনো ছাতা নেই।"





কিন্তু নেভারলেন্ড বলল, "আমি যদি তোমাকে আমার ছাতাটা ধার দিই, তবে তুমি নিজের জন্য আর কখনোই ছাতা কিনবে না। তুমি ছাতা ধার করেই কাটিয়ে দেবে—যতদিন না তুমি এতটাই বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ো যে, ঘর থেকে বের হওয়ারই আর ক্ষমতা থাকবে না!"

তবুও নেভারস্পেন্ড কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়ল। সে বৃষ্টিতে ভিজে চপচপে হয়ে গেল। কিন্তু একটি ছাতাও কিনল না!

আরেকবার, তাদের দুজনের ডাকঘরের সামনে দেখা হল। নেভারস্পেন্ড একটি চিঠি লিখতে চাইছিল। সে নেভারলেন্ডের কাছে একটি কলম চাইল। কিন্তু সেই নেভারলেন্ড—আপনি কি অনুমান করতে পারেন সে কী বলল?

"প্রিয় প্রতিবেশী, আমি যদি তোমাকে এভাবেই জিনিসপত্র ধার দিতে থাকি, তবে তোমার স্বভাব কখনোই পাল্টাবে না! বাড়ি যাও এবং নিজের একটি কলম নিয়ে এসো!"

নেভারস্পেন্ড তখন অন্য একজনের কাছ থেকে একটি কলম ধার করে নিল। "কী ভীষণ কিপটে ওই নেভারলেন্ডটা!" সে মনে মনে বলল। "একদিন আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেবই!"

খুব শীঘ্রই তার সেই সুযোগ এসে গেল। তারা দুজন পাশের গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছিল। নদীর ওপরের সেতুটি পার হওয়ার সময়, নেভারলেন্ড পড়ে গেল। সে সোজা নদীর জলের মধ্যে ছিটকে পড়ল!

"বাঁচাও! বাঁচাও!" সে চিৎকার করে উঠল। "আমি সাঁতার জানি না!"

আর সেই নেভারস্পেন্ড! সে বলল: "প্রিয় নেভারলেন্ড! আমি যদি তোমাকে এখন উদ্ধার করি, তবে তুমি আর কখনোই সাঁতার শেখার চেষ্টা করবে না! তোমার নিজের ভালোর জন্যই আমি তোমাকে উদ্ধার করতে অস্বীকার করছি!"

আর এভাবেই তার প্রতিবেশীকে জলের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নেভারস্পেন্ড সেখান থেকে হেঁটে চলে গেল!



নেভারস্পেন্ডের কথাগুলো নেভারলেন্ডের হৃদয়ে গিয়ে বিঁধল। সে যেন নিজের কন্ঠস্বরই সেই কথাগুলোর মধ্যে শুনতে পেল। তখন সে নেভারস্পেন্ডের কাছে ক্ষমা চাইল। "আমাকে ক্ষমা করো!" সে আর্তনাদ করে উঠল। "আমি তোমাকে বড্ড বেশি জ্ঞান দিয়েছি। আমি আর কখনোই এমনটা করব না! দয়া করে আমাকে ডুবে মরতে দিও না!"

মুহূর্তের মধ্যেই, 'নেভারস্পেন্ড' (Neverspend) জলে ঝাঁপ দিল। সে তার প্রতিবেশীকে ধরে নদীর তীরে টেনে তুলল। সে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল এবং পরার জন্য পরিষ্কার পোশাক দিল। সে তার জন্য চা বানিয়ে আনল। এরপর সে নিজেও পরিষ্কার পোশাক পরে নিল। সূর্যের নিরাময়কারী কিরণ গায়ে মাখার জন্য তারা দুজনে একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল।

অচিরেই সেই দুই প্রতিবেশী একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া হতোও, তবে তা ছিল কেবলই খুনসুটি। ধীরে ধীরে তারা উভয়েই পরিবর্তিত হতে শুরু করল। এবং একদিন, গ্রামের অন্য বাসিন্দারা তাদের আসল নাম ধরে ডাকতে শুরু করল – মুরুগান এবং কান্ধন ।

তামিলনাড়ুর একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

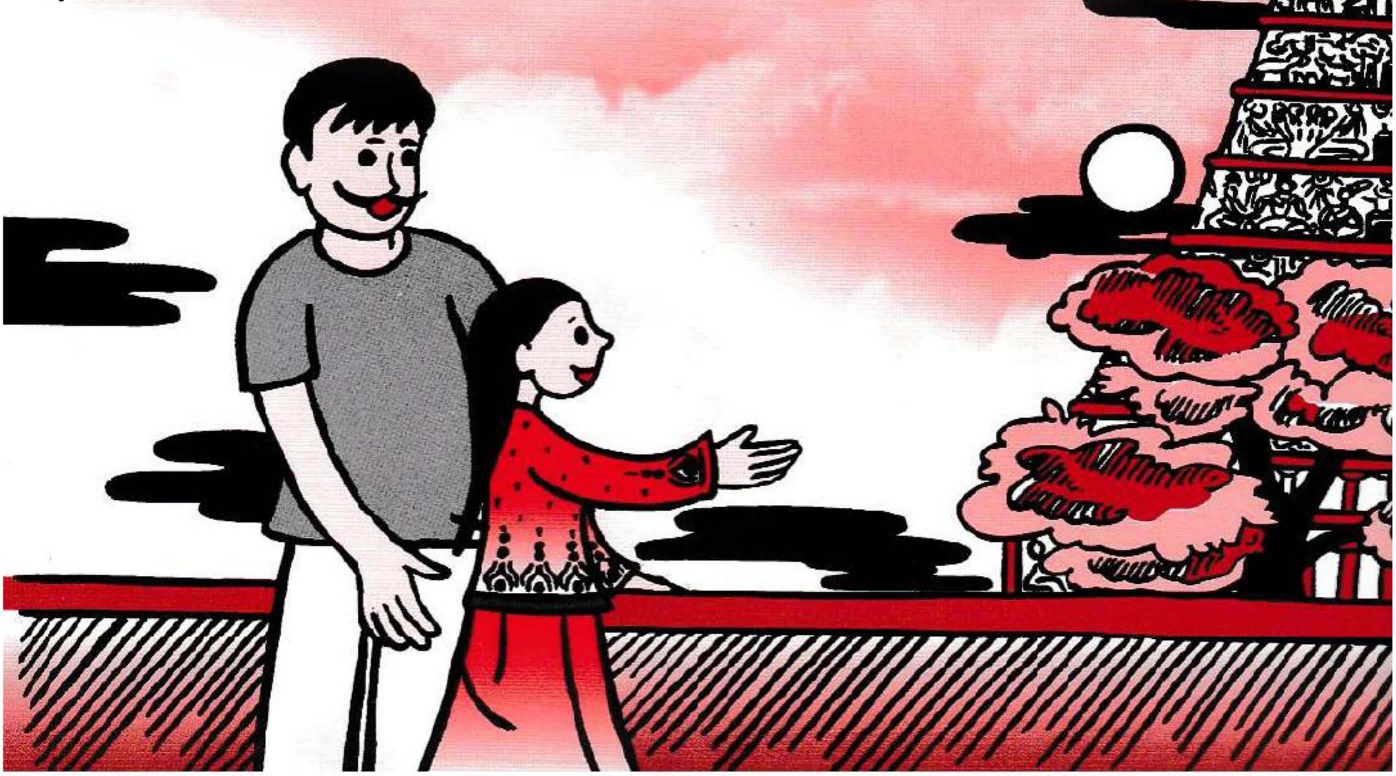
নিখোঁজ চাঁদ

ছোট্ট মেয়েটির চোখে জল জমে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"এত মন খারাপ কোরো না, কান্নাম্মা!" তার বাবা আলতো স্বরে বললেন। "তোমার জন্মদিনের আগেই আমি ফিরে আসব!" কিন্তু কান্নাম্মা ঘুরে তাকাল না।

"ওই দেখো! মন্দিরের গোপুরমের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে!" তিনি বললেন। "দেখো তো আজ রাতে চাঁদটা কত সুন্দর গোল হয়ে আছে। শীঘ্রই এটি তার এই সুন্দর গোল আকৃতি হারিয়ে ফেলবে। এটি ক্রমশ ছোট হতে শুরু করবে। অবশেষে এটি একটি সরু বাঁকা ফালির মতো হয়ে যাবে। তারপর একসময় এটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

কথাটা বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করল! কান্নাম্মা ঘুরে তাকাল, আর চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তার চোখের জল চিকচিক করে উঠল। ওহ, চাঁদটা কী অপূর্ব সুন্দর! তার বাবা মেয়ের মনের অবস্থার এই পরিবর্তনটি দ্রুতই বুঝতে পারলেন এবং বললেন, "চাঁদ আবার বড় হতে শুরু করবে—ধীরে ধীরে—যতক্ষণ না এটি তার সেই সুন্দর গোল আকৃতিটি ফিরে পায়! আর ঠিক তখনই তোমার জন্মদিন এসে উপস্থিত হবে!"



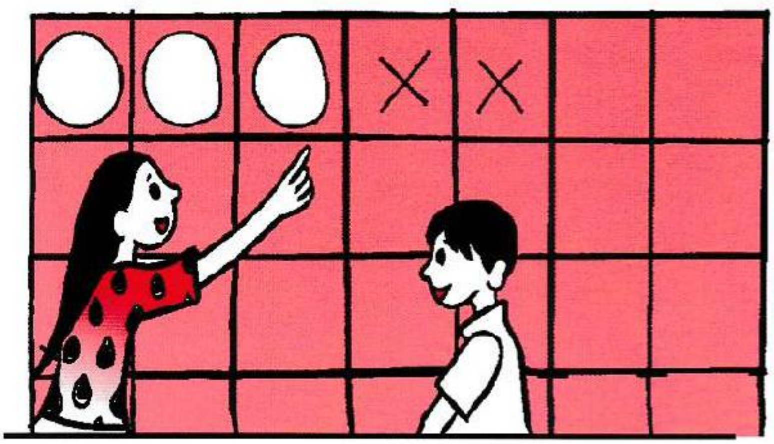
তার বাবা তাকে হাসানোর চেষ্টা করে বললেন,"তুমি কি জানো যে মানুষ ক্যালেন্ডার তৈরির জন্য চাঁদের আকৃতিকে কাজে লাগায়? আসলে, ইংরেজি 'month' (মাস) শব্দটি এসেছে 'moon' (চাঁদ) শব্দটি থেকেই! হুম... হয়তো আমাদের এখন থেকে 'moonth' (মুনথ) বলা শুরু করা উচিত।"

কান্নাম্মা হেসে উঠল! "আমি যখন বাইরে থাকব, তখন তুমি একটা 'চাঁদের ক্যালেন্ডার' তৈরি কর না!" তার বাবা বললেন । "তোমাকে যা করতে হবে তা হলো এই: দেয়ালের ওপর একটি ছক এঁকে নাও। এটি দেখতে অনেকটা ক্যালেন্ডারের একটি পাতার মতোই হবে। ছকটির প্রথম ঘরটিতে চাঁদের একটি ছবি আঁকো—ঠিক যেমনটি আজ রাতে দেখা যাচ্ছে—একেবারে গোল এবং নিখুঁত।

"প্রতি রাতে চাঁদের আকৃতিটি ভালো করে দেখবে । আগামীকাল রাতে এর আকৃতিটি কিছুটা ভিন্ন দেখাবে। সেই নতুন আকৃতিটি ছকের দ্বিতীয় ঘরটিতে এঁকে ফেলবে। প্রতি রাতেই চাঁদের একটি নতুন আকৃতি তৈরি হবে। এভাবে নতুন নতুন আকৃতি দিয়ে ছকের ঘরগুলো পূরণ করতে থাকবে।" "তোমার ক্যালেন্ডার শেষ হওয়ার অনেক আগেই আমি ফিরে আসব!" তিনি কথা দিলেন ।

ট্রেন এসে থামল। কান্নাম্মার বাবা ট্রেনে উঠলেন। ওই দেখো! কান্নাম্মা খুশিমনে হাত নাড়ছে। তার বাবাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

কান্নাম্মার নতুন প্রকল্পটি ছিল বেশ শক্ত। সবার আগে তো একটা ছক আঁকতে হবে! পাশের বাড়ির ছেলে থাম্বি তাকে সাহায্য করার জন্য খুব উৎসুক ছিল। দুজনে মিলে সেই ছকটি এঁকে ফেলল।



কান্নাম্মা অধীর আগ্রহে রাতের আঁধার নামার অপেক্ষা করতে লাগল এবং মন্দিরের গোপুরমের ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে, দীর্ঘ অপেক্ষার পর, দেখা মিলল তার, সেই চাঁদের!

কিন্তু এক মিনিট দাঁড়াও! চাঁদটা তো এখনো গোলই দেখাচ্ছিল! কান্নাম্মা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল । সে আবার ওপরের দিকে তাকাল। ওহ! বাবা ঠিকই বলেছিলেন! চাঁদটা আর পুরোপুরি গোল নেই—অন্তত এখন আর নেই!

কান্নাম্মা তার খড়ির টুকরোটি হাতে নিল এবং ছবিটা আঁকার জন্য দেয়ালের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু চাঁদের কোন দিকটা পুরোপুরি গোল ছিল না? সে তো সেটা ভুলেই গেছে। সে আবার ফিরে গেল, চাঁদটা আরেকবার দেখার জন্য। আহা, এবার সে বুঝতে পেরেছে! সে সেই পুরোপুরি গোল না হওয়া চাঁদের প্রথম ছবিটি আঁকল।

পরের সন্ধ্যায় সে তার এই প্রকল্পের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ঠিক তখনই থাম্বি ছুটে এল। "চাঁদটা তো আরও ছোট হয়ে গেছে!" "এসো, দেখে যাও!" সে চেঁচিয়ে বলল। হ্যাঁ, চাঁদ সত্যিই ছোট হয়ে গেছে! কান্নাম্মা খুব যত্ন করে চাঁদের দ্বিতীয় ছবিটি আঁকল।

তৃতীয় রাতে সে গোপুরমের ওপর চাঁদকে দেখতে পেল না। সে বেশ অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আবার ঘরের ভেতরে ফিরে গেল। ঠিক ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে আরেকবার বাইরে এল—আর তখনই সেটিকে দেখতে পেল; আগের রাতের চেয়ে এটি আরও কিছুটা ছোট হয়ে গেছে!

হুম। এ এক রহস্যময় চাঁদ! কান্নাম্মা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সেই—পুরোপুরি গোল নয় এমন—চাঁদের তৃতীয় ছবিটি আঁকল। চাঁদের ক্যালেন্ডারটি ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠছিল!

চতুর্থ ও পঞ্চম রাতে বৃষ্টি হল। মন খারাপ করে ক্যালেন্ডারের ছকের দুটি ঘর খালিই রেখে দিতে হল। ষষ্ঠ রাতে আকাশ পরিষ্কার ছিল । কান্নাম্মা যখন বাইরে এল, তখন আকাশে শত শত—না, হাজার হাজার—তারা মিটমিট করে জ্বলছিল। কিন্তু চাঁদ সেখানে ছিল না! সে বারবার বাইরে গিয়ে চাঁদ আছে কি না তা পরীক্ষা করতে লাগল। চাঁদ নেই, চাঁদ নেই, কোথাও চাঁদ নেই!

তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। কান্নাম্মা আর চোখের পাতা খোলা রাখতে পারছিল না। সেই রাতে সে স্বপ্ন দেখল যে, এক রাক্ষস চাঁদটিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল। চাঁদটা তবে কোথায় গেল?

আগামীকাল কি সেটি আবার ফিরে আসবে?

ফিরে এল না! এমনকি তার পরের রাতেও নয়! হয়তো চাঁদটা সত্যিই চুরি হয়ে গেছে! থাম্বি বলল, "যে-ই চাঁদটা চুরি করে থাকুক না কেন, সে নিশ্চয়ই সেটি ফেরত দিয়ে যাবে। চাঁদ এতো বড় যে তাকে বয়ে বেড়ানোটা বড্ড কঠিন কাজ!"

কী বোকা ছেলে! কান্নাম্মা মনে মনে হাসল। সেই রাতেও সে জেগে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। চাঁদের দেখা মিলল না! যখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন সে তার মায়ের কন্ঠস্বর শুনতে পেল। "আগামীকাল বাবা বাড়ি ফিরবেন।" সে স্বপ্ন দেখল যে, তার বাবা একটি জাদুর তলোয়ার ঘুরিয়ে রাক্ষসের হাত থেকে চাঁদটিকে উদ্ধার করছেন!

পরদিন সকালে কান্নাম্মা ঘুমজড়ানো চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস তার ঘুম পুরোপুরি তাড়িয়ে দিল; সে আকাশের দিকে তাকাল। "মা!" সে চেঁচিয়ে উঠল। "চাঁদ ফিরে এসেছে!" "চাঁদ ফিরে এসেছে!" কান্নাম্মার মা দেখতে দরজার কাছে এলেন। " সে এতই অলস যে, একেবারে ভোরবেলা এসে হাজির হয়েছে!" তিনি বললেন। দুজনেই হেসে উঠলেন। চাঁদটা এখন কেবল একটা অর্ধবৃত্তাকার রূপ ধারণ করেছে! আর সেটা মন্দিরের চূড়ার ওপর নয়, বরং ঠিক তাদের মাথার ওপরেই অবস্থান করছে।

কিছুটা দূরে কান্নাম্মা দেখতে পেল, তার বাবা বাড়ি ফিরছেন। জীবনটা যেন এখন পরিপূর্ণ। বাবা ফিরে এসেছেন। চাঁদকে খুঁজে পাওয়া গেছে। দেয়াল-ক্যালেন্ডারটি অপেক্ষায় আছে। কান্নাম্মার মনটা নানা ছবি আর প্রশ্নে ভরে উঠল। এখন থেকে সে খুব ভোরেই সেই 'অলস' চাঁদটাকে খুঁজতে বেরোবে

নিরুপমা রাঘবন



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

ডুম ডুম, ঢোল!

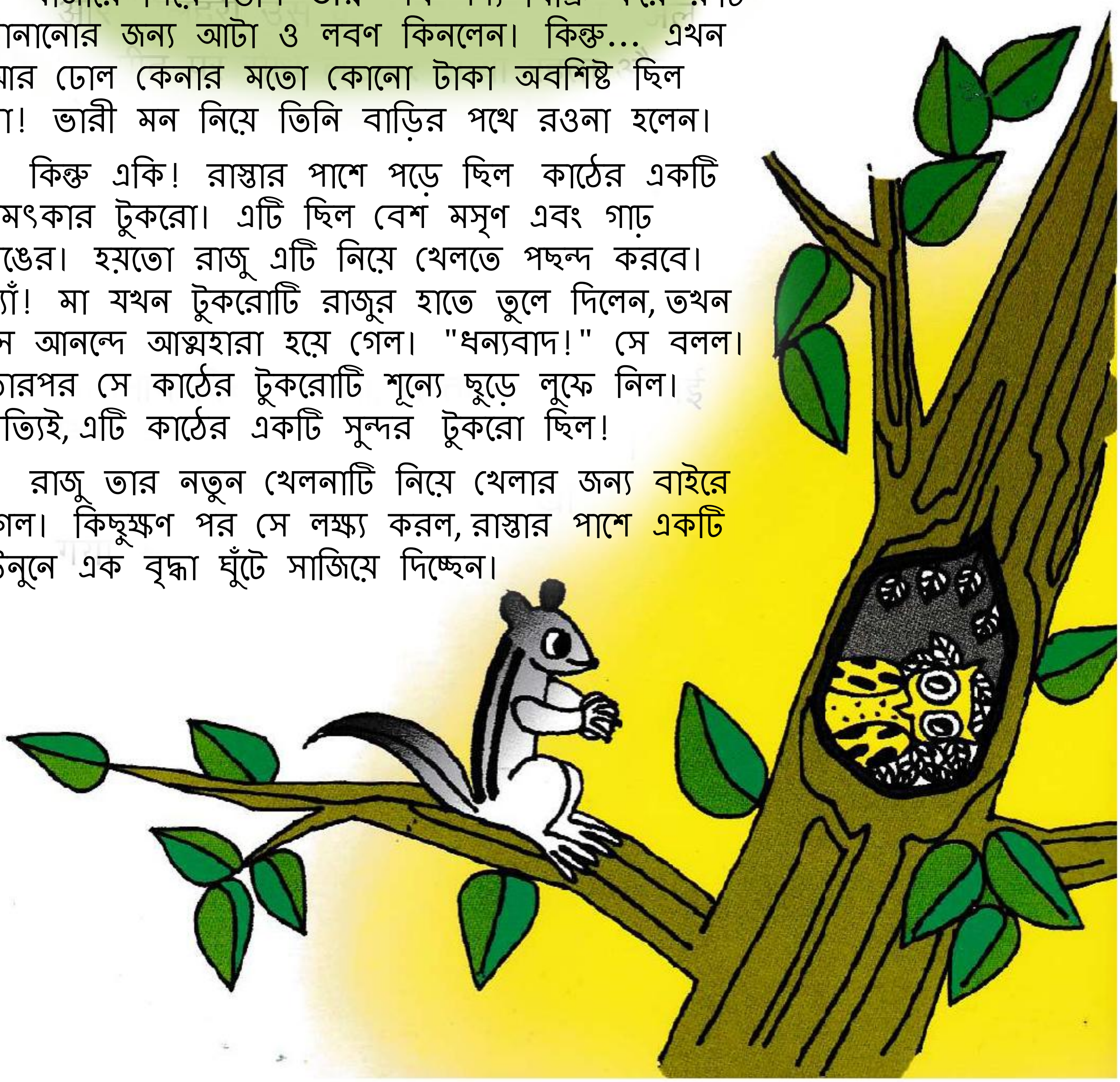
ডুম ডুম, ডুম ডুম... রাজু বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সেই শব্দের দিকে দৌড়ে গেল। ওই তো! মোড় ঘুরে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে আসছিল এক রঙিন শোভাযাত্রা!

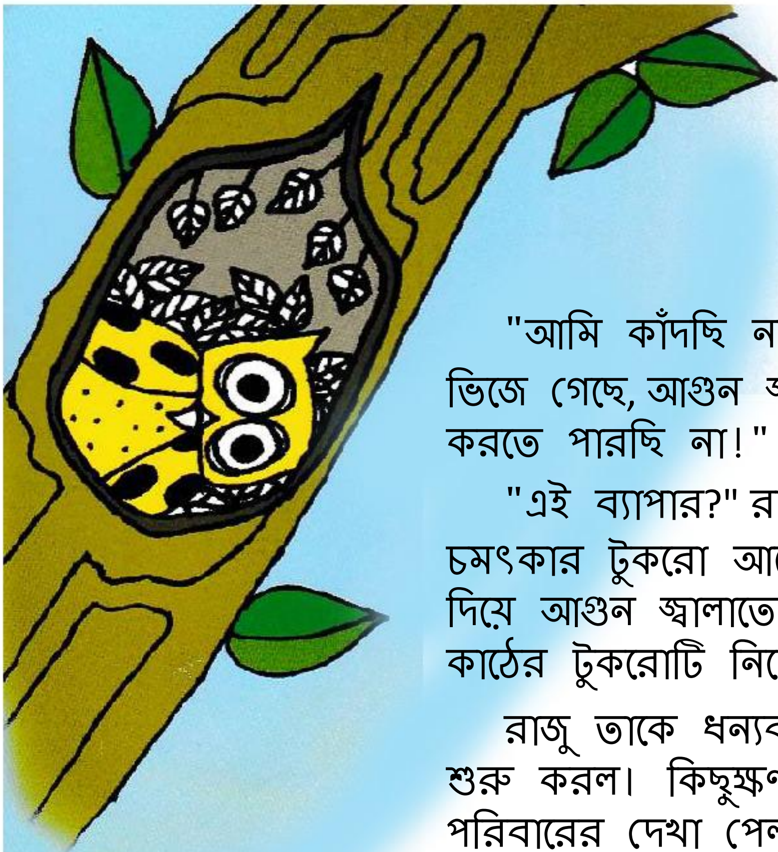
রাজু দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল এবং ঘরের ভেতরে ঢুকল। "মা! মা!" সে ডেকে উঠল। "দয়া করে আমাকে একটা ঢোল কিনে দাও!" তার মা ঠিক তখনই বাজারের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন। "আমি চেষ্টা করব রাজু," তিনি বললেন।

বাজারে গিয়ে তিনি **তাঁর** সব পণ্য বিক্রি করে রুটি বানানোর জন্য আটা ও লবণ কিনলেন। কিন্তু... এখন আর ঢোল কেনার মতো কোনো টাকা অবশিষ্ট ছিল না! ভারী মন নিয়ে তিনি বাড়ির পথে রওনা হলেন।

কিন্তু একি! রাস্তার পাশে পড়ে ছিল কাঠের একটি চমৎকার টুকরো। এটি ছিল বেশ মসৃণ এবং গাঢ় রঙের। হয়তো রাজু এটি নিয়ে খেলতে পছন্দ করবে। হ্যাঁ! মা যখন টুকরোটি রাজুর হাতে তুলে দিলেন, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। "ধন্যবাদ!" সে বলল। তারপর সে কাঠের টুকরোটি শূন্যে ছুড়ে লুফে নিল। সত্যিই, এটি কাঠের একটি সুন্দর টুকরো ছিল!

রাজু তার নতুন খেলনাটি নিয়ে খেলার জন্য বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করল, রাস্তার পাশে একটি উনুনে এক বৃদ্ধা ঘুঁটে সাজিয়ে দিচ্ছেন।





উনুনের ভেতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছিল। আগুন কিছুতেই জ্বলছিল না! রাজু বৃদ্ধার চোখে জল দেখতে পেল। "দিদিমা!" সে ডেকে উঠল। "আপনি কাঁদছেন কেন?"

"আমি কাঁদছি না তো!" বৃদ্ধা বললেন। "এই ঘুঁটেগুলো ভিজে গেছে, আগুন জ্বলছে না, আর তাই আমি রান্নাও করতে পারছি না!"

"এই ব্যাপার?" রাজু বলল। "আমার কাছে কাঠের একটি চমৎকার টুকরো আছে। দয়া করে এটি নিন! আপনি এটি দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারবেন।" বৃদ্ধা তো মহাখুশি! তিনি কাঠের টুকরোটি নিলেন এবং রাজুকে একটি রুটি দিলেন।

রাজু তাকে ধন্যবাদ জানাল এবং রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সে এক কুমোর এবং তার পরিবারের দেখা পেল। কুমোরের শিশুটি কাঁদছিল।

"তোমার বাচ্চাটি কাঁদছে কেন?" রাজু জানতে চাইল। "ও ক্ষুধার্ত!" কুমোর উত্তর দিল। "আমার কাছে একটি রুটি আছে!" রাজু বলল। "এটা নাও!" সে শিশুটিকে উদ্দেশ্য করে বলল। কুমোরের স্ত্রী রাজুকে বললেন, "তুমি খুব ভালো ছেলে! এই নাও তোমার জন্য একটি মাটির পাত্র।" তিনি রাজুকে আশীর্বাদ করলেন।

রাজু তার মাটির পাত্রটি হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে এক ধোপা ও তার স্ত্রীকে দেখতে পেল।





ধোপাটি বলছিল, "আমাদের শেষ হাঁড়িটাও ভেঙে গেল! জল ফোটানোর মতো আর কোনো হাঁড়ি আমাদের কাছে নেই। এখন আমরা কাপড়চোপড় ধোব কী করে?"

"চিন্তা কোরো না!" রাজু বলল। "এই হাঁড়িটা নাও!" ধোপাটি তাকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। সে রাজুকে একটি নরম উলের জামা উপহার দিল।

জামাটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার! রাজু সেটি পরে নিল। নিজেকে খুব সুদর্শন মনে করতে করতে সে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে একটি সেতুর কাছে এসে পৌঁছাল।

সেতুর ছায়ায় একটি লোক বসে ছিল, যে শীতে থরথর করে কাঁপছিল। তার গায়ে কোনো জামা ছিল না! রাজু অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে নিজের উলের জামাটি খুলে লোকটিকে দিয়ে দিল।

"তুমি তো দেখছি খুব বড় মনের মানুষ!" লোকটি বলল। "আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই... এই নাও!" সে রাজুর হাতে একটি দড়ির এক প্রান্ত তুলে দিল। "আমার ঘোড়াটা তুমিই নিয়ে নাও!" সে বলল।





নতুন ঘোড়াটিকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সময় রাজুর সাথে একটি বরযাত্রী দলের দেখা হল। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল এবং তাদের বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। একটি ছোট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, তারা কেন এভাবে অপেক্ষা করছে। "ঘোড়া ছাড়া আমরা বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা শুরুই করতে পারছি না!" তার মা তাকে বুঝিয়ে বললেন।



"আমার ঘোড়াটাই তোমরা নাও!" রাজু বলল। ওহ, তাদের সবার মুখে কী অপূর্ব হাসিই না ফুটে উঠল! বর রাজুকে ধন্যবাদ জানাল এবং বলল, "দয়া করে তোমাকে কিছু উপহার দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে!"

রাজু মনে একটি আকাঙ্খা নিয়ে শোভাযাত্রার বাদ্যকরদের দলের দিকে তাকাল। তারা তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি একপাশে নামিয়ে রেখেছিল। বাজানোর অপেক্ষায় পড়ে থাকা যন্ত্রগুলি যেন আমন্ত্রণ করছিল! "আপনার বাদ্যকরদের বলবেন আমাকে একটা ঢোল দিতে?" রাজু জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই!" বর সানন্দে রাজি হলো। সে বাদ্যকরদের দিকে ঘুরে একটি ঢোল চাইল। মুহূর্তের মধ্যেই একটি ঢোল রাজুর হাতে এসে পৌঁছাল! আর তারপর 'ডুম ডুম, ডুম ডুম, ডুম' শব্দ তুলতে তুলতে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল!

উত্তর ভারতের একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

ওটা কার লেজ?

এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, একটি ছোট বানর গাছ থেকে নিচে লাফিয়ে নামল এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎই সে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। মাটিতে একেবারে একা পড়ে ছিল শুধু একটি লেজ!

"এই লেজটা কার?" বানরটি সজোরে জিজ্ঞেস করল। "আমার উচিত এর মালিককে খুঁজে বের করা!" সে লেজটি তুলে নিল এবং বনের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কাছেরই একটি পুকুর থেকে একটি মাছ ভেসে উঠল। "এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল।

"না, এটা আমার নয়!" মাছটি বলল।

"আমার লেজ ছাড়া কি আমি এভাবে সাঁতার কাটতে পারতাম?" এই বলে সে দ্রুতবেগে সাঁতরে চলে গেল—জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সে তার লেজটি আগে পিছে নাড়াতে লাগল।





"তাহলে এই লেজটা কার?" ছোট বানরটি মনে মনে ভাবল। উত্তর হিসেবে একটি শব্দ ভেসে এল: "টুক! টুক! টুক!" ওহ! ওটা ছিল একটি কাঠঠোকরা পাখি। সে পোকা ধরার জন্য গাছে ঠোকর দিচ্ছিল!

"এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল।

"এই তো আমার লেজ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?" কাঠঠোকরাটি বলল। "এটা ছাড়া, আমি কি এভাবে গাছের ডালে বসে থাকতে পারতাম?" সে গাছের কাণ্ডের ওপর নিজের শক্ত লেজ দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে উপরে-নিচে ও ডানে-বামে লাফাতে লাগল, আর গাছের ছালের ভেতর পোকা খুঁজতে লাগল।

হঠাৎই একটি কাঠবিড়ালি গাছ থেকে নিচে নেমে এল। সে ছোট বানরটির কাছেই নামল এবং একটি বাদাম কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছুটে গেল।

"এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল। "না!" কাঠবিড়ালিটি বলল। "এই যে আমার সুন্দর লেজ! এর লম্বা লোমগুলো চারপাশ জুড়ে খাড়া হয়ে থাকে—এর সাহায্যে আমি গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াতে পারি এবং নিচে মাটিতে নেমে আসতে পারি!"

ছোট বানরটি গাছের মগডালের দিকে তাকাল। তার খুব ইচ্ছে হল গাছে চড়ে খেলতে! কিন্তু এই লেজটির আসল মালিকের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই ছোট বানরটি আরও কিছুটা পথ এগিয়ে চলল।

"দেখে-শুনে পথ চলো!" একটি কন্ঠস্বর ভেসে এল। ছোট বানরটি নিচের দিকে তাকাল।



ওহ, সর্বনাশ! ওটা ছিল একটি রাগী বিচ্ছু!

"আমাকে ক্ষমা করবেন," ছোট বানরটি বলল। "এই লেজটা কি আপনার?"

"তুমি তো আমার লেজটা বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ, তাই না?" বিচ্ছুটি উত্তর দিল। আর এই বলে সে তার লেজটি ঠিক ছোট বানরটির দিকে তাক করে ধরল! "আমি যদি তোমাকে হুল ফোটাই, তবে তুমি মারা যাবে!" সে সতর্ক করে দিল। "পালাও এখান থেকে!" "পালিয়ে যাও!"

ছোট্ট বানরটি তাই করল।

দৌড়ে যাওয়ার পথে, একটি মা খরগোশ তার ছানাদের নিয়ে বানরটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা সবাই লাফ দিয়ে তাদের গর্তে ঢুকে পড়ল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

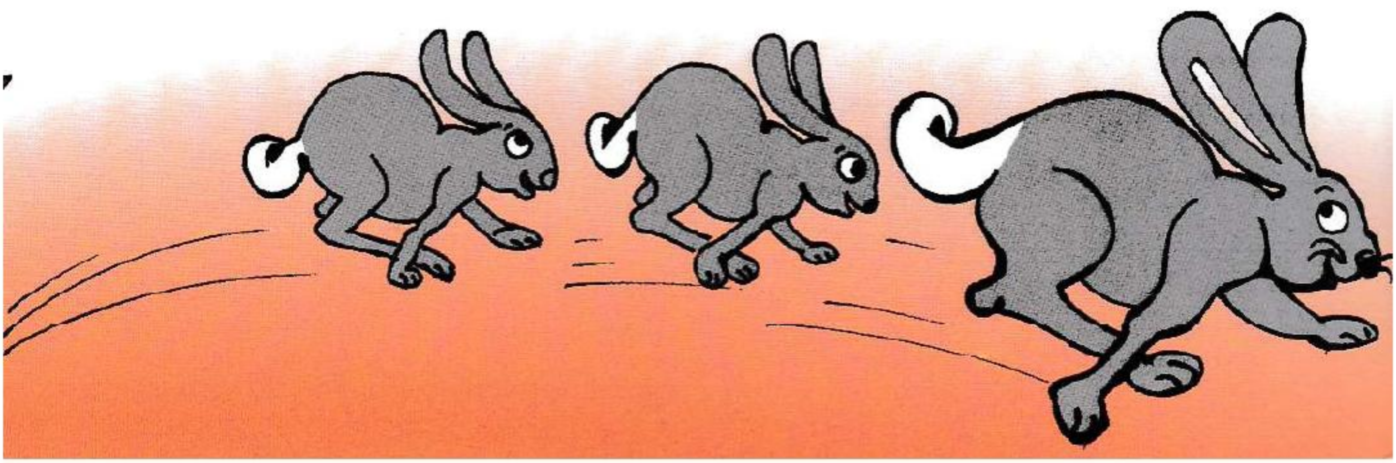
"মা খরগোশ!" ছোট্ট বানরটি নিচ থেকে ডেকে বলল। "তুমি কি তোমার লেজ খুঁজছ?"

মা খরগোশটি গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। "এই তো আমার লেজ। দেখো, আমি কীভাবে এটাকে মোচড়াই!" সে বলল।

"ওহ!" ছোট্ট বানরটি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল। "তোমার লোমগুলো বাদামী আর ধূসর রঙের, কিন্তু তোমার লেজটা সাদা। এটা কী দারুণ ছোট আর নরম-তুলতুলে!"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই!" খরগোশটি বলল। "আমি যখন দৌড়াই, তখন লেজটা এপাশ-ওপাশ নাড়াতে থাকি। এতে আমার শত্রুদের মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়—আর আমি পালিয়ে বাঁচি!"

"কী কাজের একটা লেজ!" ছোট্ট বানরটি মনে মনে ভাবল।



ঠিক তখনই নতুন কেউ সেখানে এল। সেটি ছিল একটি লেজহীন টিকটিকি! ছোট্ট বানরটি দৌড়ে তার কাছে গেল। "আমি তোমার লেজ খুঁজে পেয়েছি! এই যে সেটা!"

"ওটা আমারই লেজ ছিল," টিকটিকিটি বলল। "কিন্তু এখন ওটার আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তোমার ওটার প্রয়োজন নেই?" ছোট্ট বানরটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। "সেটা কীভাবে সম্ভব? লেজ ছাড়া মাছ সাঁতার কাটতে পারে না, কাঠঠোকরা গাছের গুঁড়ির ওপর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না, কাঠবিড়ালি লাফ দিয়ে মাটিতে নামতে পারে না, বিচ্ছু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, খরগোশ তার শিকারিদের হাত থেকে পালাতে পারে না—আর আমি? আমি তো গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে চলাফেরা করতেই পারি না ! সবারই তো একটা লেজ প্রয়োজন!"

"আমারও প্রয়োজন," টিকটিকিটি বলল। "কিন্তু গতকাল একটা সাপ আমাকে ধরে ফেলেছিল; তাই আমাকে বাধ্য হয়েই লেজটা খসিয়ে ফেলতে হয়েছিল। লেজটা যখন মাটিতে পড়ে মোচড়াচ্ছিল, সাপটা তখনই সেটাকে গিলে খেয়ে ফেলল। আর এভাবেই আমি পালিয়ে বাঁচলাম!"

"এটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" ছোট্ট বানরটি বলল। "কিন্তু তুমি কেন ওটা ফেরত পেতে চাইছ না?"

"দেখো!" টিকটিকিটি বলল। "আমার শরীরে এখনই একটা নতুন লেজ গজাতে শুরু করেছে!"

"ওহ!" ছোট্ট বানরটি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল। "সব প্রাণীর লেজের মধ্যে তোমার লেজটাই সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর!"



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

59

উৎসব প্রাঙ্গণে

সেদিন আমাদের ক্লাসে বেশ হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল! ছুটির ঘন্টা বাজার পর, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম। "আম্মা! আম্মা!" আমি ডাক দিলাম। "আগামী সপ্তাহে একটা স্কাউট ক্যাম্প হবে। আমি কি সেখানে যেতে পারি?"

"আমাকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ভাবে বল তো," মা বললেন।

"আসলে," আমি বললাম, "এটা শহরের ভেতরেই অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক বার্ষিক উৎসব চলাকালীন। গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে আসবে। আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের পথ দেখিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার।"

"শুনতে তো দারুণ লাগছে, মনি," মা বললেন। "কিন্তু তুমি তো এর আগে কখনো বাড়ির বাইরে রাত কাটাওনি। আমার যে কী ভীষণ চিন্তা হবে!"

"কমলা, রহিম এবং আরও অনেকেই তো যাচ্ছে," আমি মাকে আশ্বস্ত করে বললাম। "আম্মা, আমাকেও কি যেতে দেবে?"



"আচ্ছা, যদি ওরাও যায়..." মা তার কথা শেষ করার আগেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম "ধন্যবাদ, আম্মা!" আমি মনপ্রাণ দিয়ে বললাম।

যাত্রার দিন আমরা সবাই স্কুলের মাঠে সমবেত হলাম। আমরা আমাদের ভারী ব্যাগগুলো বাসে তুলে নিলাম। হাত নেড়ে বিদায় জানানো আর শুভকামনার মধ্যে দিয়ে আমরা স্কুলের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বড় রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। শহর পর্যন্ত পুরোটা পথ আমরা গান গাইতে গাইতে গেলাম।

যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু চারপাশের দৃশ্য দেখে আমরা তো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম! খাবারের আর হস্তশিল্পের দোকানগুলোর চারপাশে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। আমি এর আগে কখনো একসঙ্গে এত মানুষ দেখিনি, কিংবা এত ব্যস্ততাও দেখিনি।

বাস থেকে নামার পরই আমাদের একটি বিশাল খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে আমাদের তাঁবুগুলো খাটানোর অপেক্ষায় ছিল। এরপর পরদিন যার যা দায়িত্ব, তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হলো।

কমলা ভীষণ উচ্ছ্বসিত ছিল। তাকে চিকিৎসা কর্মীদের সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রহিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশদের সহায়তা করার। এ কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম; কারণ স্কুলে সে ছিল আমাদের সেরা ফুটবলার। কেবল তাকে দেখলেই দুর্বৃত্তরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেত ।

আমার নিজের দায়িত্বটি নিয়েও আমি বেশ খুশি ছিলাম। আমার কাজ ছিল নতুন দর্শনার্থীদের পথঘাট চিনিয়ে দেওয়া। আমি বরাবরই মানুষের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের কথা শুনতে পছন্দ করি ; আর এখন আমি সেই সুযোগটিই দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারব।



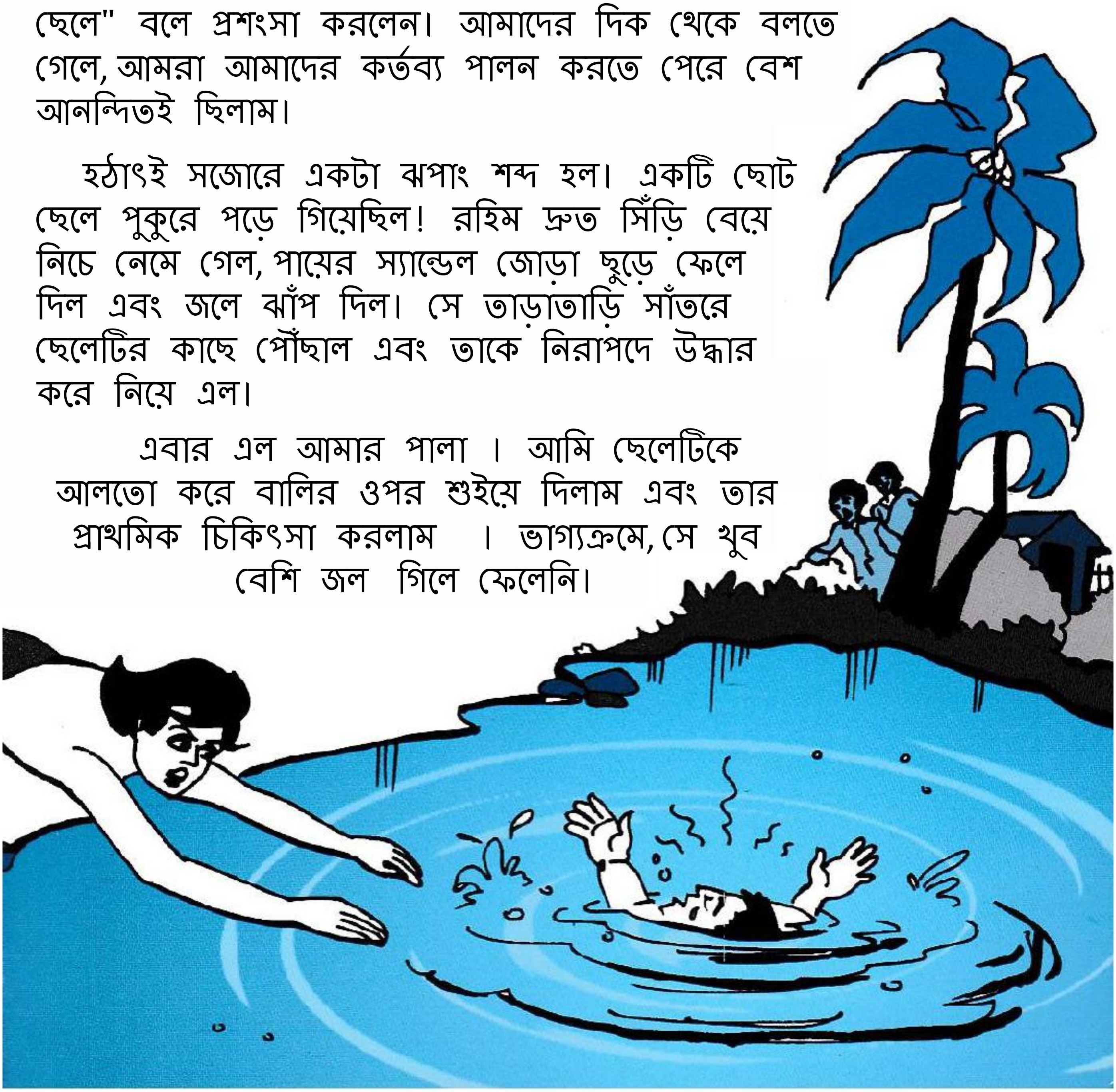
পরের দিনটি দেখতে দেখতেই কেটে গেল, অথচ সেই দিনটির স্মৃতিগুলো আজও আমার মনে অমলিন হয়ে আছে! আমরা সবাই খুব কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম এবং নতুন অনেক কিছু শিখেছিলাম। আমাদের যখন তাঁবুতে ফেরত পাঠানো হল, তখন আমরা সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম ।

একসাথে হেঁটে ফেরার পথে, রহিম আর আমি একে অপরকে আমাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনালাম। বরাবরের মতোই, রহিমের কাছে শোনানোর মতো একটা মজার গল্প ছিল। ঠিক যখন সে তার গল্প শেষ করল, আমরা দুজনেই লক্ষ্য করলাম মন্দিরের সিঁড়ির কাছে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাথে একটি ভারী ব্যাগ ছিল। স্বভাবতই, আমরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছুটে গেলাম।

রহিম তাঁর ব্যাগটি তুলে নিল, আর আমি তাঁর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করলাম। সিঁড়ির উপরে পৌঁছে তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং আমাদের "ভালো ছেলে" বলে প্রশংসা করলেন। আমাদের দিক থেকে বলতে গেলে, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পেরে বেশ আনন্দিতই ছিলাম।

হঠাৎই সজোরে একটা ঝপাং শব্দ হল। একটি ছোট ছেলে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল! রহিম দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল, পায়ের স্যান্ডেল জোড়া ছুড়ে ফেলে দিল এবং জলে ঝাঁপ দিল। সে তাড়াতাড়ি সাঁতরে ছেলেটির কাছে পৌঁছাল এবং তাকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

এবার এল আমার পালা । আমি ছেলেটিকে আলতো করে বালির ওপর শুইয়ে দিলাম এবং তার প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম । ভাগ্যক্রমে, সে খুব বেশি জল গিলে ফেলেনি।



ইতিমধ্যে সেখানে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। লোকজন ছেলেটিকে দেখার জন্য গাদাগাদি করে এগিয়ে আসছিল। রহিম তাদের পেছনে সরে যেতে বলল। "ছেলেটির বাতাস দরকার!" সে বেশ জোরেই বলল। "দয়া করে একটু দূরে সরে দাঁড়ান!" এবার ছেলেটির বাবা-মা ভিড় ঠেলে সামনে আসতে পারলেন। তাঁরা দৌড়ে ছেলেটির কাছে গেলেন। তার বাবা তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং সজোরে জড়িয়ে ধরলেন।

শহরের হাসপাতালটি কাছেই ছিল। রহিম আর আমি সেই পরিবারটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম। ডাক্তার যখন ছেলেটিকে পরীক্ষা করছিলেন, আমরা তখন দুশ্চিন্তা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে, তিনি মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "তোমরা ছেলেরা দারুণ কাজ করেছ! তোমরা ঠিক সময়েই ছেলেটিকে জল থেকে তুলে এনেছ। তোমাদের দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসাই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে!" ছেলেটির বাবা-মা ছলছলে চোখে আমাদের ধন্যবাদ জানালেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমরা কমলার দেখা পেলাম। সে কাউকে একটি হুইলচেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আমাদের দেখতে পেল এবং হাত নেড়ে আমাদের অপেক্ষা করতে ইশারা করল। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের সাথে এসে যোগ দিল এবং আমরা সবাই মিলে একসাথে হেঁটে চললাম।



আমরা সবাই কত কিছুই না করেছি এবং দেখেছি! আর আমরা আমাদের স্কাউটিং দক্ষতা কাজে লাগিয়েছি! আমাদের প্রত্যেকের কাছেই শোনানোর মতো অনেক গল্প জমা হয়েছিল।

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম এবং গল্পগুজব করলাম।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

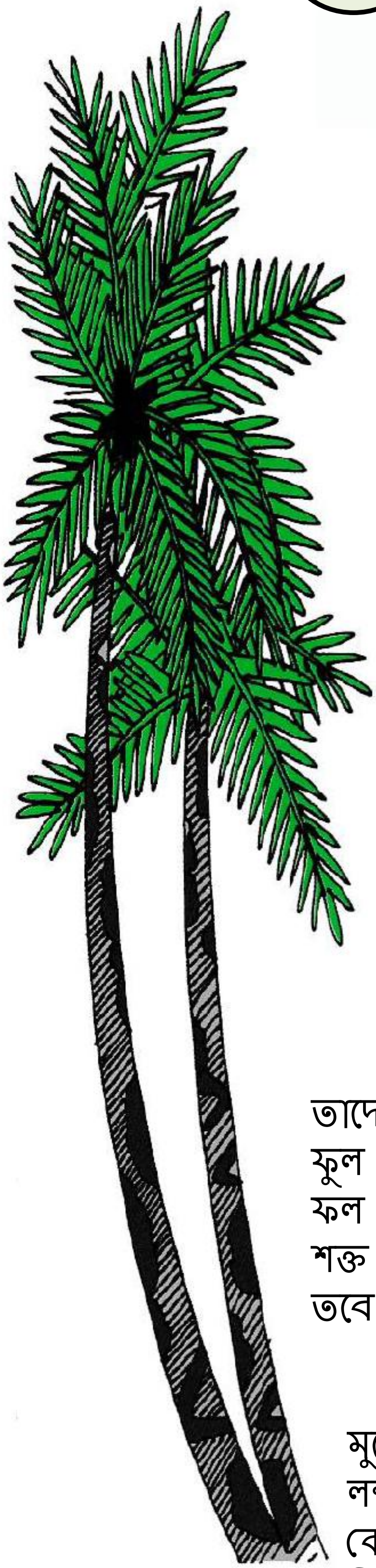
P. Saraswati V. Vijayakanthi

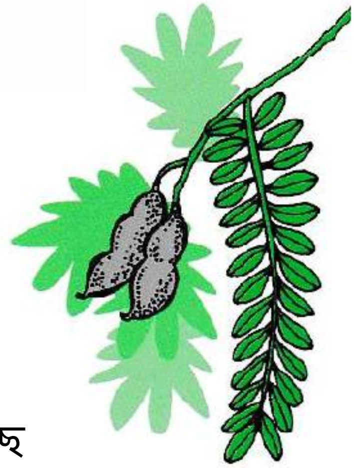
Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

60 আমরা কারা?





গাছ একটি
কিন্তু তার স্তম্ভ অনেক

আমি একটি ছোট কাঁটাযুক্ত গাছ
চকচকে হলুদ গোল ফলে আবৃত
আমার পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজ ও সুগন্ধি
আমার ফলগুলো টক রসে পূর্ণ
যা তোমরা জল, চিনি ও লবণ মিশিয়ে পান করো

একটি লম্বা গাছ, যার পাতাগুলো চওড়া ও পাখার মতো
যার ফল নরম, শাঁসালো, খেতে মিষ্টি
এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের
যার ভেতরে থাকে গোলমরিচের মতো কালো বীজ

তাদের পাতা আছে—কিন্তু কোনো ডালপালা নেই
ফুল আছে—কিন্তু কোনো সুগন্ধ নেই
ফল আছে—কিন্তু রোপণের জন্য কোনো বীজ নেই
শক্ত কাণ্ড আছে—কিন্তু নির্মাণের উপযোগী কাঠ নেই
তবে তাদের বংশধর বা চারাগাছ আছে প্রচুর!

মুক্তোর মতো সাদা ফুলগুলো গুচ্ছ হয়ে ফোটে
লম্বা ও সরু সবুজ সবজিগুলো ঝুলে থাকে
কোমল সবুজ পাতাগুলো রান্নায় ব্যবহৃত হয়
কিন্তু এই গাছে খাওয়ার উপযোগী কোনো পাকা ফল নেই!

মাঝারি থেকে ছোট আকারের একটি গাছ
যার ফলগুলো ফ্যাকাশে সবুজ ও টক,
ফলের গায়ে খাঁজ কাটা এবং তা খণ্ড বা কোয়ায় বিভক্ত,
এগুলো ভিটামিন 'সি'-এর ভাণ্ডার



আমি বেশ লম্বা, আর আমার বিশাল পাতাগুলো একসময় লাল হয়ে যায়
আমার বীজটি দেখতে চোখের আকৃতির মতো
এর বাইরের শক্ত খোসাটি ভাঙা বেশ কঠিন
তবে এটি খেলে সুস্বাস্থ্য লাভ হয়

আগুনের মতন টকটকে লাল রঙের ফুল
সরু ডালগুলো শত শত কাঁটায় আবৃত
ক্যাপসুলের মতো দেখতে ফলগুলো একসময় ফেটে যায়
আর ভেতর থেকে ছোট ছোট প্যারাশুটের মতো বীজগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়
যা গাছের চারপাশে বিছিয়ে তৈরি করে তুষারের মতো সাদা এক গালিচা



এর হৃদয় আকৃতির পাতাগুলোর নিচে
রয়েছে এক শীতল ও স্নিগ্ধ ছায়া

আমি শহর ও গ্রাম—উভয় স্থানেই বেড়ে উঠি
আমি সবাইকে ছায়া দান করি
আমার ফুলগুলো লাল রঙের
আমি দেখতে অত্যন্ত মনোরম ও রূপসী!

এর বিশাল, পাখার মতো পাতাগুলো মর্মরধ্বনি তোলে—
কী কোলাহল ই না তারা সৃষ্টি করে!
এর কাণ্ডটি সোজা এবং শাখাবিহীন!
কালো, আঁশযুক্ত ফলটি কেটে ফেলো—
আর এর বড়, মিষ্টি ও রসালো বীজগুলোর স্বাদ নাও।

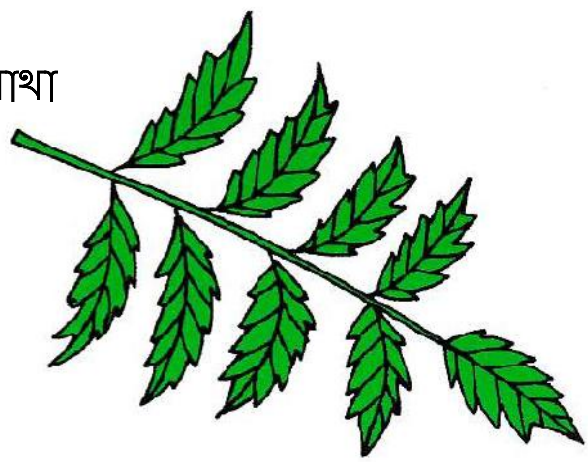


কাঁচা ফলগুলো হয় সবুজ রঙের;
পাকা ফলগুলো হয় প্রবালের মতন লাল।
ফলটি উপভোগ করো, আর শক্ত বীজটি ফেলে দাও—
তবে এর কাঁটাযুক্ত ডালপালা থেকে সাবধান!

লম্বা গাছগুলি সূর্যের পানে মাথা তুলে দাঁড়ায়,
তাদের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
এর সরু, ধূসর পাতাগুলো পিষে গায়ে মেখে নাও—
দেখবে, তোমার মাথাব্যথা নিমিষেই উধাও হয়ে গেছে।

বালুকাময় উপকূলীয় অঞ্চলে আমাকে দেখতে পাবে।
আমার পাতাগুলো হয় পাতলা ও আঁশযুক্ত।
আমার ডালপালাগুলো দেখতে অনেকটা ঘোড়ার লেজের মতো।
আমার ফলগুলো হয় কাঁটাযুক্ত গোলকের মতো—
দেখতে ভারী সুন্দর—কিন্তু কেউ তা খায় না!

সোজা ও বলিষ্ঠ হয়ে এটি আকাশের পানে মাথা
তুলে দাঁড়ায়।
ভূগর্ভের গভীর জল—
তাই হল এর পানীয়।
আমাদের জন্য এটি জল বহন করে আনে—
মাথার ওপর কলসিতে ভরে।



এর টক-মিষ্টি ফল আমাদের রান্নায় স্বাদ যোগায়।
নির্মলভাবে তারা আমাদের পথের ওপর তাদের বিশাল ছায়া বিছিয়ে দেয়।
তারা মনোরম কুঞ্জবনেও দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে—
তাদের বাদামী রঙের শুঁটিগুলো লোভনীয়ভাবে ঝুলে থাকে।

আমার গভীর শিকড় আমাকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখে।
আমার গাঢ় ও শক্ত পাতাগুলো আমাকে শীতল রাখে।
আমার ভারী বোঝা আমি বহন করি মোটা ডালের ওপর—
যা কাটলে আঠালো দুধের মতো রস বেরিয়ে আসে।
আমার ফল হাজার হাজার মানুষের আহার যোগায়।

এর কচি পাতাগুলো দেখতে বড়ই কোমল।
এরপরই ফোটে ছোট ছোট সাদা ফুলের থোকা।
তারপর আসে কাঁচা সবুজ ফল—লবণ দিয়ে খেলে যা ভারি সুস্বাদু লাগে।
সবশেষে আসে অতুলনীয় পাকা ফলগুলো—
এরাই তো ফলের রাজা!



এ গাছের ছাল হল তেঁতো ।
এর পাতাও তেঁতো
এর সমগ্র সত্তাই তেঁতো!
এটি জীবাণু ও রোগবালাই দূরে সরিয়ে রাখে।

তালগাছ, আমগাছ, কাঠবাদাম গাছ, আমলকী গাছ, নিমগাছ,
শিমুল গাছ, ঝাউগাছ, কলাগাছ, নারিকেল গাছ, কুলগাছ,
তেঁতুল গাছ, গুলমোহর গাছ, পেঁপে গাছ, অশ্বত্থ গাছ, কাঁঠাল
গাছ, ইউক্যালিপটাস গাছ, বটগাছ, সজনে গাছ, লেবু গাছ।

© Katha Jharna 2008
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

61

বীরবলের দেরি হল কেন?

একদিন আকবর অপেক্ষা করছিলেন কখন তাঁর মন্ত্রী বীরবল প্রাসাদে আসবেন । বীরবলের আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, আর এতে আকবর বেশ রেগে গেলেন। বীরবল যখন এলেন, আকবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এত দেরি হল কেন?"

"হে মহারাজ!" বীরবল বললেন। "আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমার ছেলে কাঁদতে শুরু করল। তাকে শান্ত করার জন্য আমি কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছিলাম। সেই কারণেই আমার দেরি হয়েছে।"

"তুমি কি ঠাট্টা করছ?" আকবর বললেন। " একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করতে কি সত্যিই এত বেশি সময় লাগে?" "সত্যিই তাই লাগে, মহারাজ!" বীরবল বললেন। "একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।"

"কঠিন? আমি তো খুব সহজেই একটা শিশুর কান্না থামিয়ে দিতে পারি!" আকবর সগর্বে বলে উঠলেন।



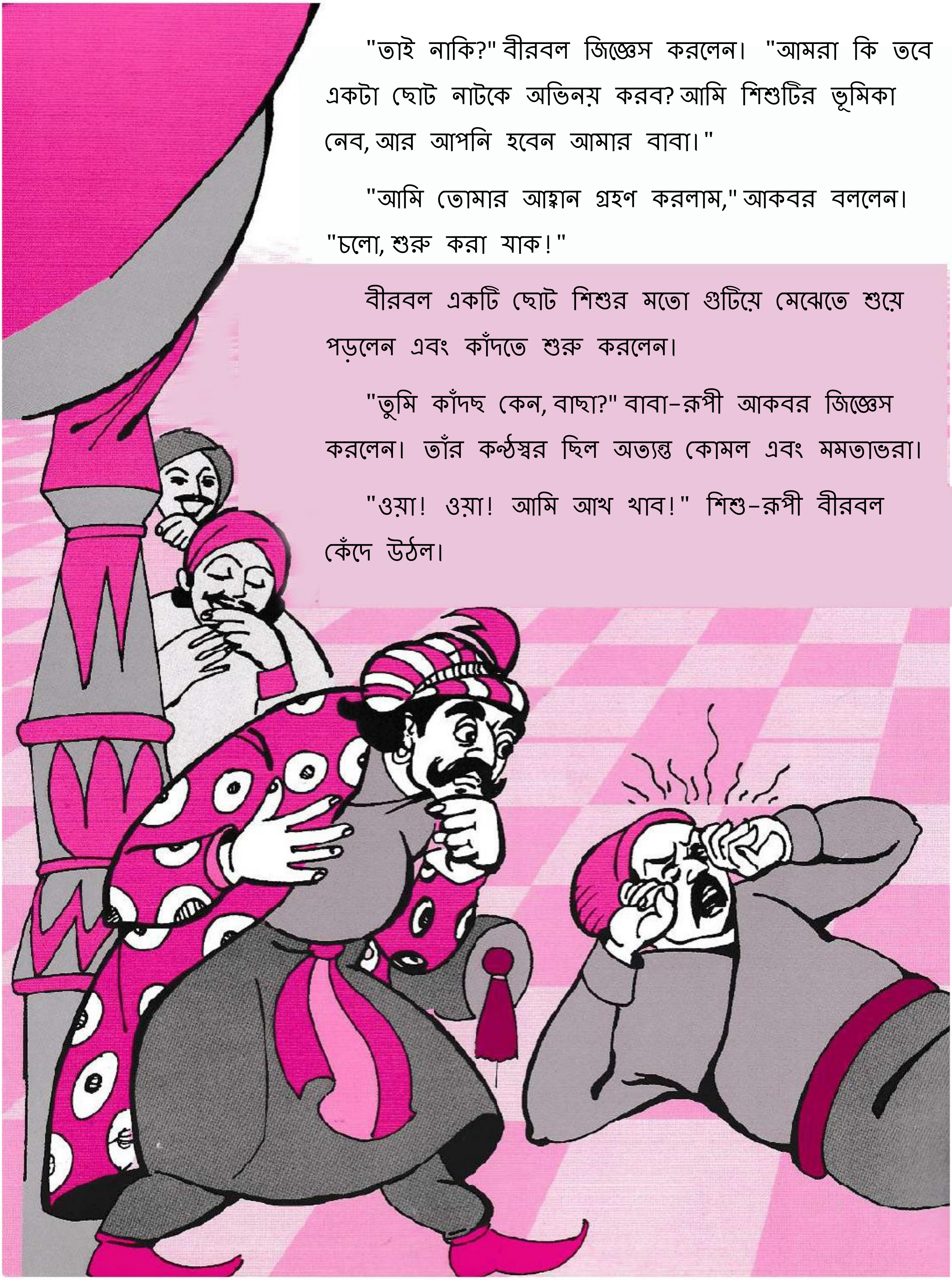
"তাই নাকি?" বীরবল জিজ্ঞেস করলেন। "আমরা কি তবে একটা ছোট নাটকে অভিনয় করব? আমি শিশুটির ভূমিকা নেব, আর আপনি হবেন আমার বাবা।"

"আমি তোমার আহ্বান গ্রহণ করলাম," আকবর বললেন। "চলো, শুরু করা যাক!"

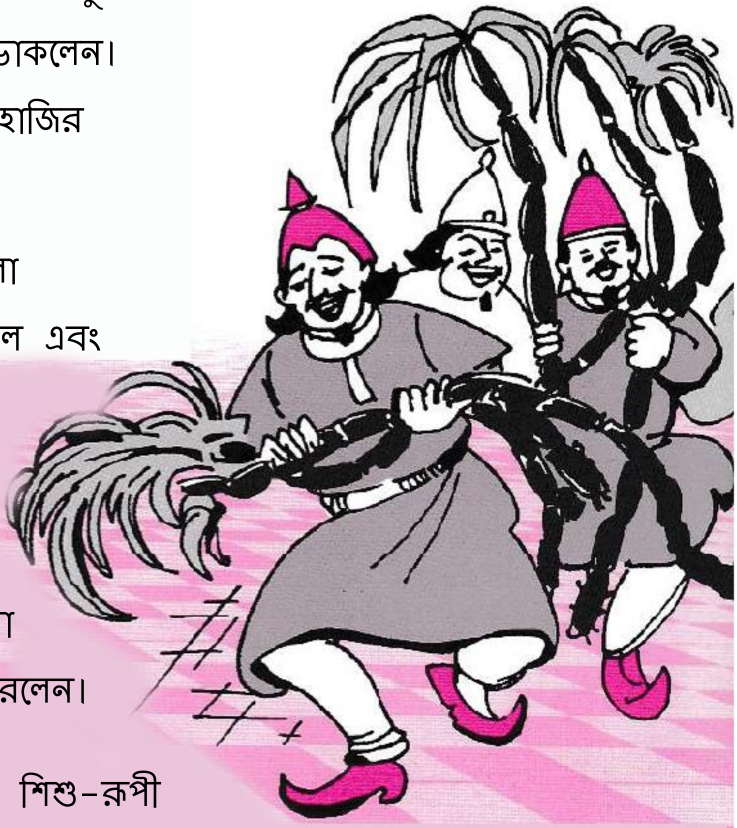
বীরবল একটি ছোট শিশুর মতো গুটিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন।

"তুমি কাঁদছ কেন, বাছা?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কন্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত কোমল এবং মমতাভরা।

"ওয়া! ওয়া! আমি আখ খাব!" শিশু-রূপী বীরবল কেঁদে উঠল।



"কেঁদো না!" বাবা-রূপী আকবর বললেন। "তুমি অবশ্যই আখ পাবে!" তিনি তাঁর ভৃত্যদের ডাকলেন। এক মিনিটের মধ্যেই তারা কিছু আখ নিয়ে হাজির হল।



শিশু-রূপী বীরবল যখন আখের ছড়াগুলো দেখতে পেল, তখন সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল এবং মেঝেতে আছাড় মারতে লাগল। তার কান্নার তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। "ওয়া! ওয়া!" সেই শব্দ ছিল অসহনীয়!

"এই তো আখ এনেছি, বাছা। তুমি এখনো কাঁদছ কেন?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আখের ছোট ছোট টুকরো চাই!" শিশু-রূপী বীরবল চিৎকার করে কাঁদল। "ওয়া, ওয়া!"

"এইটুকুই তো?" বাবা-রূপী আকবর জিজ্ঞেস করলেন। "আমি এখনই এগুলো কাটিয়ে টুকরো করে দিচ্ছি!"

আকবরের ভৃত্যরা আখগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফেলল। তারা সেগুলো শিশুটির সামনে এগিয়ে দিল। কিন্তু শিশু-রূপী বীরবল আখের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এদিক-সেদিক ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে মেঝেতে সজোরে হাত-পা আছাড় মারতে লাগল। সে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করল। "ওয়া! ওয়া! ওয়া!"



বাবা-রূপী আকবর তখন হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কাঁদছ কেন? তুমি তো সেই আখের টুকরোগুলোই পেয়েছ, যা তুমি চেয়েছিলে!"

"ওই টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগিয়ে দাও!" শিশু বীরবল চিৎকার করে উঠল। "আমি আখের একটা আস্ত ছড়া চাই!"

এ পর্যায়ে এসে আকবর ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। "আমি কীভাবে আখের টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগাব? ছোট ছোট টুকরো দিয়ে আখের একটা আস্ত ছড়া তৈরি করা তো সম্ভব নয়!"

আর এভাবেই বীরবলের দাবির সত্যতা তাঁর কাছে উন্মোচিত হল। তিনি বললেন, "তুমিই ঠিক বলেছ, বন্ধু! একটা শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করা মোটেও সহজ কাজ নয়।"

বীরবল হাসলেন। নিজের পোশাক থেকে ধুলো ঝেড়ে তিনি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "আজ সকালে আমার ছেলেও ঠিক এমনই আচরণ করছিল। আমি তো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না কী করব! সত্যি বলতে, আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, তখনও সে কাঁদছিল।"

আকবর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। "এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যাও এবং তোমার সন্তানের খোঁজ নাও!" তিনি বললেন।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

62 নন্দরিয়ার আত্মত্যাগ



চোখ বন্ধ কর। তোমার মানসপটে ভেসে উঠুক একটি দীর্ঘ, খরস্রোতা নদী। এটি গঙ্গা নদী। দেখ! নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল আমগাছ। একদল বানর সেই গাছের ফল পরম তৃপ্তিতে ভক্ষণ করছে। তারা কতই না ভাগ্যবান! এমন এক স্থানে তাদের বাস, যেখানে প্রতিটি ভোজনই ইন্দ্রিয়গুলোর জন্য এক পরম আনন্দের উৎস!

তবুও, সেই দলের সর্দার নন্দরিয়া বেশ চিন্তিত। আমগাছটির একটি ডাল নদীর ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। যদি কোনো আম জলে পড়ে যায়, তবে কী হবে?



নন্দরিয়া তার দলের সবাইকে একত্রিত করে ডাক দেয়। "দেখ, এই ডালটি কীভাবে নদীর ওপর ঝুঁকে আছে। আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ডাল থেকে একটি আমও জলে না পড়ে।

"যদি কোনো আম জলে পড়ে যায়, তবে তা হয়তো মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। মানুষ তখন সেই গাছটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, যে গাছে এমন সুস্বাদু ফল ফলে। তারা এখানে চলে আসবে, আমাদের দেখতে পাবে এবং তাড়িয়ে দেবে।"

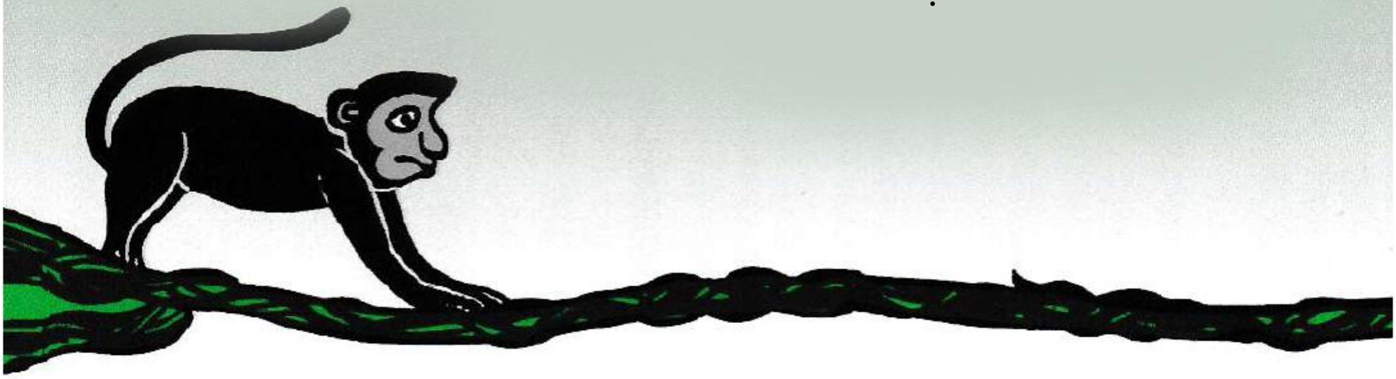




"এই ডালটির ওপর কড়া নজর রেখো! ফল পেকে ওঠার সাথে সাথেই তা পেড়ে ফেলবে!" নন্দরিয়া নির্দেশ দেয়। "কখনোই আমগুলোকে নিচে পড়তে দেবে না!"

কিন্তু একটি আম ঠিকই পড়ে যায়—সবার অলক্ষ্যে, সরাসরি নদীর জলে। স্রোতের ধাক্কায়, জলের তোড়ে বারবার ডুবতে-ভাসতে আর এদিক-সেদিক দুলতে দুলতে আমটি ভেসে চলে। কোনো না কোনোভাবে সেটি গিয়ে পৌঁছায় রাজার হাতে। "এই আমটি কোথা থেকে এল?"—আমটির স্বাদ ও গন্ধে মুগ্ধ হয়ে রাজা বিস্ময়ের সাথে ভাবেন। সেই আমগাছটি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন।

সেখানে পৌঁছে রাজা গাছটির বিশাল আকৃতি এবং তাতে ফলের প্রাচুর্য দেখে অভিভূত হয়ে যান। তবে ততক্ষণে রাত ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি সেখানেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দেন: "তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র একপাশে সরিয়ে রাখো এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। আমরা সকালে উঠে আমগুলো পেড়ে নেব।"



রাতটি ছিল ঘোর অন্ধকার। মেঘের এক পুরু চাদরে আকাশটা ঢাকা। চাঁদও অনেক আগেই অস্তাচলে পাড়ি দিয়েছে । নন্দরিয়া এবং তার দলের বানরেরা ঘুমন্ত সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় এবং গাছে উঠে পড়ে। তারা পরম তৃপ্তিতে আম ভক্ষণ করতে থাকে।

কিন্তু আম খাওয়ার আনন্দে মগ্ন হয়ে তারা নিচে ঘুমন্ত সৈন্যদলের কথা বেমালুম ভুলে যায়। তাদের নীরবতা প্রথমে ফিসফিসানিতে পরিণত হয়, আর সেই ফিসফিসানি একসময় পরিণত হয় উচ্চকণ্ঠের কলরবে। রাজার প্রহরীরা রাজাকে জাগিয়ে তোলে। "মহারাজ, গাছটি তো বানরে ভরে গেছে!" তারা রাজাকে জানায়। "এখন আমাদের কী করণীয়?"

"সৈন্যদের ঘুমাতে দাও," রাজা উত্তর দেন। "ভোরের আলো ফুটলেই আমরা বানরগুলোকে তাড়িয়ে দেব।"

দুটি বানর রাজার পরিকল্পনা আড়াল থেকে শুনে ফেলে। তারা দৌড়ে নন্দরিয়ার কাছে যায়। "বিপদ! বিপদ!" তারা সতর্ক করে দেয়।

"সৈন্যরা আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে! ওহ, এখন কী করা যায়?"

"ভেবো না," নন্দরিয়া উত্তর দেয়। "আমিই তোমাদের সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করব।" সে ঝুলে থাকা একটি লতা ছিঁড়ে নেয় এবং সেটির এক প্রান্ত আমগাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। অন্য প্রান্তটি সে নিজের কোমরে বেঁধে নেয়। এক বিশাল লাফ দিয়ে সে নদী পার হয়ে যায়।



হায়! ছিঁড়ে নেওয়া লতাটি বড্ড ছোট হয়ে গেছে। নন্দরিয়া নদীর অপর পাড়ের একটি গাছ আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সে লতাটি গাছের সাথে বাঁধতে পারে না। তাতে কী! গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলে থেকে সে নিজের শরীরকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে, যাতে লতার যেটুকু দৈর্ঘ্য কম পড়েছে, তা পূরণ হয়ে যায়। তৈরি হয়ে যায় এক জীবন্ত সেতু!

সে তার দলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে: "তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! লতাটি ধরে আমার শরীরের ওপর দিয়ে বেয়ে নিচে নেমে গাছের সাহায্যে নদীর তীরে পৌঁছাও। তাড়াতাড়ি এসো, এখনই এসো, যাতে সবাই প্রাণে বাঁচতে পারো!"

একে একে বানরগুলো নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে যায়। সবশেষে আসা বানরটি সজোরে নন্দরিয়ার পিঠের ওপর লাফিয়ে ওঠে এবং নিরাপদে পৌঁছে যায়। কিন্তু নন্দরিয়ার হাত থেকে ডাল ফস্কে যায় ! সে গাছ থেকে ছিটকে পড়ে যায়! নিচে, একদম নিচে—নদীর তীরে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে।

রাজা বানরদের এই পলায়নপর্বের পুরোটাই লক্ষ্য করছিলেন। এখন তিনি দৌড়ে নন্দরিয়ার কাছে ছুটে যান। কিন্তু নন্দরিয়াকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না। তার শরীর থেকে প্রাণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল । রাজা বললেন, "নিজের জীবনের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে তুমি তোমার প্রজাদের রক্ষা করেছ। এমন আত্মত্যাগ আমি জীবনে কখনো দেখিনি।"

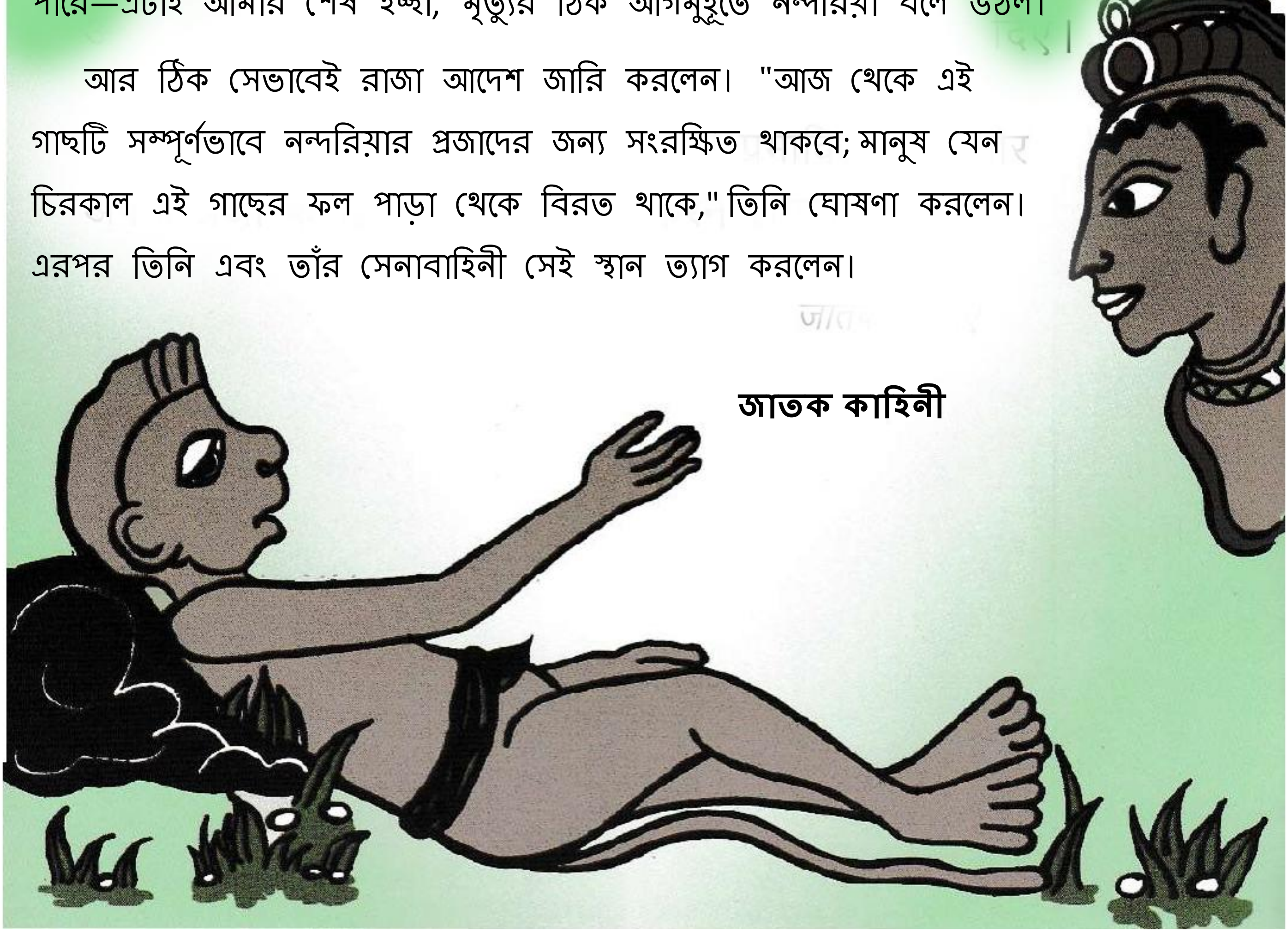
কিন্তু নন্দরিয়া উত্তর দিল, "মহারাজ, একজন রাজার কর্তব্য হল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে প্রজাদের কল্যাণকে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। আমি যা করেছি, তা কেবল আমার কর্তব্য পালন মাত্র।"

"আমি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই, হে বানররাজ," শোকাহত কণ্ঠে রাজা উত্তর দিলেন। "তোমার শেষ ইচ্ছাটি আমাকে জানাও, যাতে আমি তা পূর্ণ করতে পারি।"

"আমার প্রজারা যেন মানুষের খেয়ালখুশির অধীন না হয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে—এটাই আমার শেষ ইচ্ছা," মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে নন্দরিয়া বলে উঠল।

আর ঠিক সেভাবেই রাজা আদেশ জারি করলেন। "আজ থেকে এই গাছটি সম্পূর্ণভাবে নন্দরিয়ার প্রজাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; মানুষ যেন চিরকাল এই গাছের ফল পাড়া থেকে বিরত থাকে," তিনি ঘোষণা করলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সেনাবাহিনী সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

জাতক কাহিনী



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

তেনালি রামন ও জাদুকর



একদিন বিজয়নগরে এক জাদুকর এলেন। তিনি রাজার রাজপ্রাসাদে অনেক চমৎকার জাদুর খেলা প্রদর্শন করলেন। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা দেখল। সময় যে কীভাবে কেটে গেল, তা তারা টেরই পেল না।

জাদুকর মাটিতে একটি খালি ঝুড়ি রাখলেন। তিনি সেটিকে উল্টে দিলেন। তারপর সেটি উপরে তুলে ধরলেন। ফুস! অমনি সেখানে একটি আমের চারা গাছ দেখা গেল!

তিনি একটি টেবিলের ওপর পাখির একটি খালি খাঁচা রাখলেন। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলে দিলেন। ভেতর থেকে একটি পায়রা উড়ে বেরিয়ে এল! সবাই তুমুল করতালি দিয়ে উঠল!



জাদুকর কয়েকটি ছোট পাথর কুড়িয়ে নিলেন। জাদুর ছোঁয়ায়—চমক! সেগুলো সোনার মুদ্রায় পরিণত হলো! এরপর তিনি সজোরে চোখ বন্ধ করলেন। রাজার আঙুল থেকে একটি আংটি উড়ে এল। সেটি সোজা জাদুকরের কাছে চলে এল!

দর্শকরা জাদুর প্রদর্শনী দারুণ উপভোগ করছিল! এমনকি রাজা নিজেও জাদুকরের প্রতিভার প্রশংসা করলেন। তিনি জাদুকরকে উপহার ও পুরস্কারে ঠাসা একটি রুপার থালা প্রদান করলেন।

কিন্তু জাদুকর পুরস্কারের চেয়েও আরও বেশি কিছু চাইছিলেন। তিনি একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে বিজয়নগরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, "এখানে কি এমন কেউ আছেন, যিনি জাদুকৌশলে আমাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন? যদি কেউ থাকেন, তবে আমি আমার পাওয়া এই সমস্ত উপহার-পুরস্কার তাকেই দিয়ে দেব!" কেউ এগিয়ে এলেন না। এতই দক্ষ একজন জাদুকরকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারুরই ছিল না।

তখন জাদুকর বললেন, "যদি কেউ আমাকে হারাতে না পারে, তবে আমি যখন বিজয়নগর ত্যাগ করে চলে যাব, তখন আপনাদের সেই চতুর মন্ত্রী—তেনালি রামন—অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবেন!"

তেনালি রামনও অন্যদের মতোই জাদুকরের প্রদর্শনী উপভোগ করছিলেন। নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে তিনি চমকে উঠলেন। তিনি রাজার দিকে তাকালেন; রাজার সেই সৌম্য মুখমণ্ডলটি তখন গভীর দুশ্চিন্তার রেখায় আচ্ছন্ন। তেনালি মনে মনে ভাবলেন, "এই জাদুকরকে বুদ্ধির জোরে হারিয়ে দেওয়ার কোনো একটা উপায় আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"



এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে তিনি বললেন, "হে মহান জাদুকর! আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম! আমি এমন একটি জাদুর কৌশল প্রদর্শন করব, যার কোনো প্রতিযোগী কৌশল আপনি দেখাতে পারবেন না।"

"আমার জাদুর কৌশলটি প্রদর্শন করার পর, আপনাকেও ঠিক একই কৌশলটি প্রদর্শন করতে হবে। তবে আমি আমার কৌশলটি প্রদর্শন করব চোখ বন্ধ রেখে; আর আপনাকে সেটি করতে হবে চোখ খোলা রেখে।" "আপনি কি রাজি?"

জাদুকরটি ইতস্তত করলেন। তেনালি রামন তো ভীষণ চতুর! নিশ্চয়ই তিনি কোনো চমক দেখানোর ফন্দি আঁটছেন। আর তবুও... চোখ বন্ধ করে কোনো জাদুর কৌশল দেখানোর চেয়ে চোখ খোলা রেখে তা করা কি খুব বেশি কঠিন হতে পারে? অবশেষে তিনি বললেন, "এ তো বেশ সহজ মনে হচ্ছে! আমি রাজি!"

তেনালি রামন একটি ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দু-হাতে কিছুটা মাটি তুলে নিলেন। তারপর তিনি তাঁর চোখ দুটি শক্ত করে বন্ধ করলেন। ধীরে ও সতর্কতার সাথে, তিনি সেই মাটি তাঁর চোখের পাতার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি একটি কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ দুটি ভালো করে মুছে নিলেন। তিনি জাদুকরের দিকে ফিরলেন। "এবার আপনি চোখ খোলা রেখে এই কৌশলটি করে দেখান তো!" তিনি বললেন।



জাদুকরের মনে যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তা মুহূর্তেই নড়ে উঠল। তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তিনি তাঁর মাথা নত করলেন। তারপর তিনি বিজয়নগর ত্যাগ করলেন—আর কখনোই সেখানে ফিরে আসেননি।

"হুররে!" সমস্বরে বলে উঠল জনতা। "তেনালি রামন আবারও জয়ী হয়েছেন!"

"তুমি আমাদের সম্মান রক্ষা করেছ!" বললেন রাজা। আর তিনি তেনালি রামনকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করলেন।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

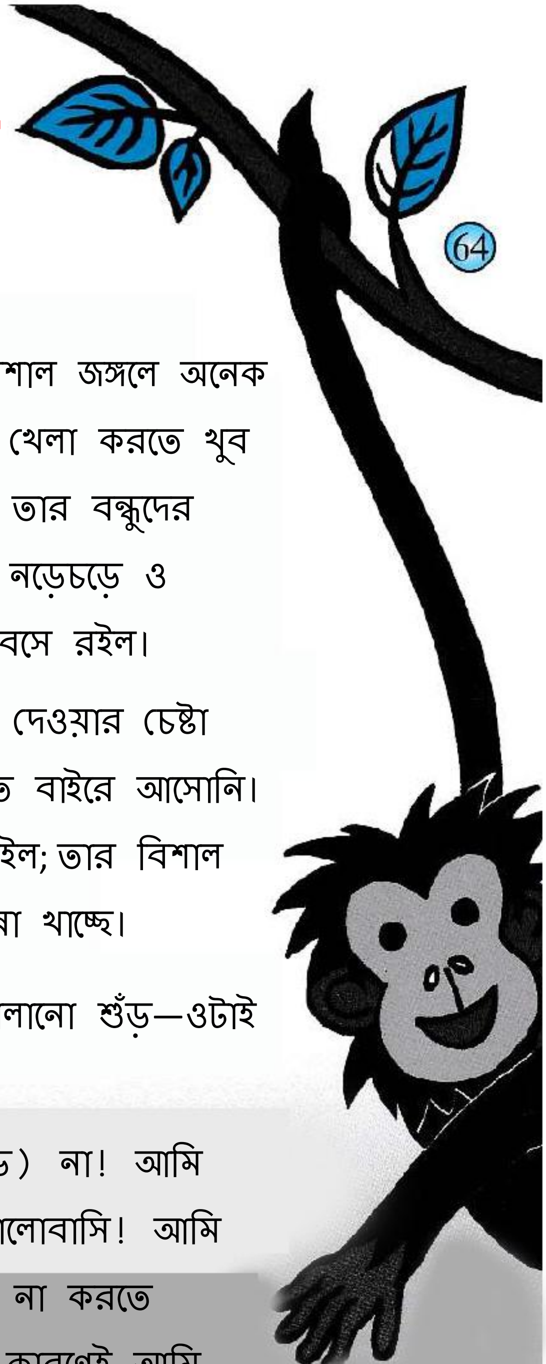
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy



আপ্পু ও তার বন্ধুরা



ছোট্ট হাতি আপ্পুর এই বিশাল জঙ্গলে অনেক বন্ধু আছে। সে তাদের সাথে খেলা করতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু আজ আপ্পু তার বন্ধুদের সাথে যোগ দিল না। সে না নড়েচড়ে ও কোনো কথা না বলে একাই বসে রইল।

আপ্পুর বন্ধুরা তাকে দেখতে এল। তারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। মাছরাঙা: হ্যালো, আপ্পু। তুমি আমাদের সাথে খেলতে বাইরে আসোনি। আমাকে কি বলবে কেন আসোনি? আপ্পু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তার বিশাল মাথাটা নিচু হয়ে আছে, আর তার শুঁড়টা মাটির সাথে ঘষা খাচ্ছে।

মাছরাঙা: আমি জানি! সেটা হলো তোমার লম্বা, ঝোলানো শুঁড়—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না?



আপ্পু: (মাথা নেড়ে) না! আমি আমার শুঁড়কে খুব ভালোবাসি! আমি ওটা দিয়ে কত কাজই না করতে পারি! আমার শুঁড়ের কারণেই আমি একজন চমৎকার কর্মী!

বাঁদর দুলতে দুলতে সেখানে এল।

বাঁদর: আমি জানি! সেটা হল তোমার ছোট্ট, পুঁচকে লেজ—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তুমি তো আমার মতো গাছে গাছে দুলতে পারো না।

আপ্পু: (পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে) আমার লেজটা ছোট হতে পারে, কিন্তু ওটা আমার কাজে লাগে! আমি তোমার মতো গাছে গাছে দুলতে চাই না!

হরিণ: আমি জানি! তোমার সমস্যা হলো তোমার মোটা পাগুলো—ওগুলোই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তোমার পাগুলো তো আমার পায়ের মতো ছিমছাম আর সরু নয়।



আপ্পু: (চোখ উল্টে) না, না! আমি আমার পাগুলোকে ভালোবাসি। ওগুলো খুব শক্তিশালী আর রাজকীয়। ওগুলো যেমন আছে, তেমনই আমি পছন্দ করি! হুম্ফ!!

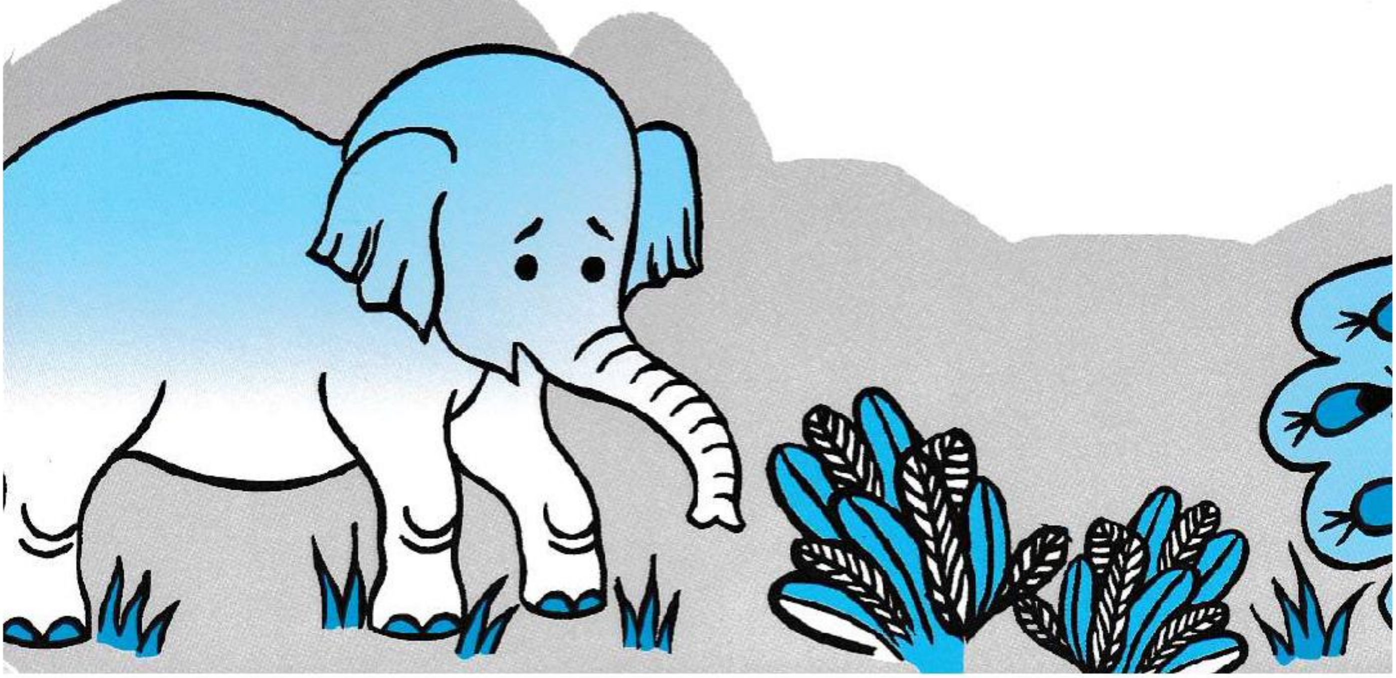
এবার ময়ূরটা উড়ে এল।

ময়ূর: আমি জানি! সেটা হলো তোমার ফ্যাকাসে ধূসর রঙ—ওটাই তোমার মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে, তাই না? তুমি হয়তো আমার সুন্দর পালকের মতো উজ্জ্বল সবুজ আর নীল রঙ পেতে চাইছ।

আপ্পু: (জোরে হেসে উঠে) একদমই না! আমি আমার এই সাদামাটা ধূসর রঙকেই ভালোবাসি।

রঙটা হয়তো ফ্যাকাসে, কিন্তু শিকারিদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে এটা আমাকে সাহায্য করে।

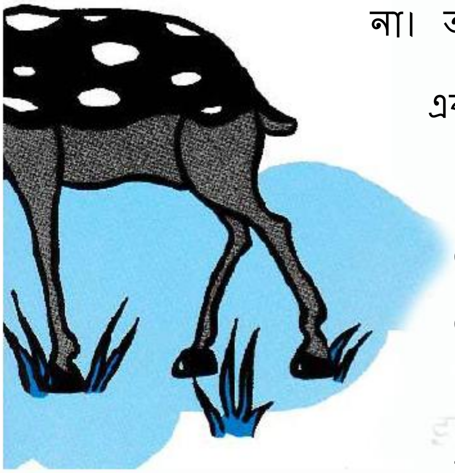
বাঁদরটা তখন লাফালাফি শুরু করে দিল।



বাঁদর: তাহলে তোমার সমস্যা যা-ই হোক না কেন, ওসব ভুলে যাও! চলো আমাদের সাথে!

আমরা এখন আখ খেতে যাচ্ছি।

আপ্পু: (মুখ গোমড়া করে) না! আমি আর কিছুই খেতে চাই না। আমি বড্ড বেশি মোটা হয়ে গেছি!



এবার অপু কাঁদতে শুরু করল।

ভালুক: এই বুঝি তোমার সমস্যা? কিন্তু তুমি তো মোটেও মোটা নও! তোমার শরীরটা তো বিশাল আর শক্তিশালী—ঠিক যেমনটা একটা হাতির হওয়া উচিত!

অপু: (হাসার চেষ্টা করতে করতে) মোটা নই? শোনো তবে। টানা তিন দিন ধরে আমি কিছুই খাইনি! এক গ্রাসও না! অথচ আমার ওজন একরত্তিও কমেনি!

হঠাৎই তারা একটা আর্তনাদ শুনতে পেল। "আমাকে বাঁচাও! কেউ একজন আমাকে সাহায্য করো!" পশুরা অপুকে ছেড়ে সেই আওয়াজের দিকে ছুটে গেল। ওই তো সেখানে! একটা শিয়াল কাঁদছে! একটা পড়ে-যাওয়া গাছের নিচে সে আটকা পড়ে আছে!

শিয়াল: আউ... আউ... উফ! লাগছে!! দয়া করে আমাকে বাঁচাও!

বাঁদর, ময়ূর আর হরিণ মিলে গাছটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তারা গাছের একটা ডালও নড়াতে পারল না!



সবাই: বেচারা শিয়াল! যেভাবেই হোক, আমাদের ওকে উদ্ধার করতেই হবে!

তারা অপুর কাছে ছুটে গেল এবং তাকে শিয়াল যেখানে আটকা পড়েছিল, সেখানে নিয়ে এল।

অপু: (নিজের শুঁড় দোলাতে দোলাতে) তোমরা সবাই সরে দাঁড়াও! এবার আমাকে চেষ্টা করতে দাও!

অপু তার শুঁড় দিয়ে নিমেষের মধ্যে গাছটাকে টেনে সরিয়ে দিল। শোঁওওও!

সবাই: হুররে! দারুণ হয়েছে! দেখলে তো অপু! একমাত্র তুমিই শিয়ালটাকে বাঁচাতে পারলে!

বাঁদর: এবার বুঝতে পারছ তো? তোমার বিশাল শরীরের কারণেই তুমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী!

অপু: (হাঁফ ছেড়ে) হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমিই সেই প্রাণী! আর এখন চলো, খেতে যাই: এত খাটাখাটনির পর আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে!

পারো আনন্দের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

আমাদের নেতা



একদা এক গভীর, অন্ধকার অরণ্য ছিল। সেখানে অনেক প্রাণী মিলেমিশে বাস করত। তাদের নেতা ছিল একটি সিংহ।

সব প্রাণীই সেই সিংহকে শ্রদ্ধা করত। যখনই তাদের কোনো সমস্যা দেখা দিত, তারা তার পরামর্শ চাইতে ছুটে আসত। সিংহটি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করত এবং প্রাণীরাও সানন্দে তার সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিত।

একদিন একদল শিকারি সেই অরণ্যে প্রবেশ করল। প্রাণীরা সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল! তারা ছুটে সিংহের কাছে গেল। "শিকারিরা আসছে! শিকারিরা আসছে!"—তারা সিংহকে জানাল।

সিংহটি তার গুহা থেকে বেরিয়ে এল এবং বলল, "তোমরা এখানেই থাকো। শান্ত হও। আমি শিকারিদের সাথে লড়াই করব এবং তাদের তাড়িয়ে দেব।"

সিংহটি দ্রুত শিকারিদের খুঁজে পেল। সে এক বিকট গর্জন করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিকারিদের কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু কয়েকজন লড়াই করার জন্য সেখানেই থেকে গেল।



তারা সিংহটিকে আহত করে ফেলল! কিন্তু সিংহটি দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। অবশেষে, সে শিকারিদের পরাজিত করল। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অরণ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সব প্রাণীই সিংহকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ছুটে এল। কিন্তু এ কী! সিংহটি যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছিল। তার পাগুলো ভেঙে গিয়েছিল! প্রাণীরা তাকে সাহায্য করে তার গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সিংহটি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য তারা অত্যন্ত উৎকন্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু সিংহের পাগুলো আর সারল না। তাই প্রাণীরা তার জন্য একটি হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করল। সিংহটি সেই চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে পুরো অরণ্য ঘুরে দেখত। প্রাণীরা প্রতিদিন তার জন্য খাবার নিয়ে আসত এবং তার সেবাযত্ন করত।

কিছুদিন পর, প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ এই কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা সিংহটির জন্য খাবার আনা বন্ধ করে দিল। এমনকি তারা তার কাছে কোনো সাহায্য বা পরামর্শ চাওয়াও বন্ধ করে দিল।



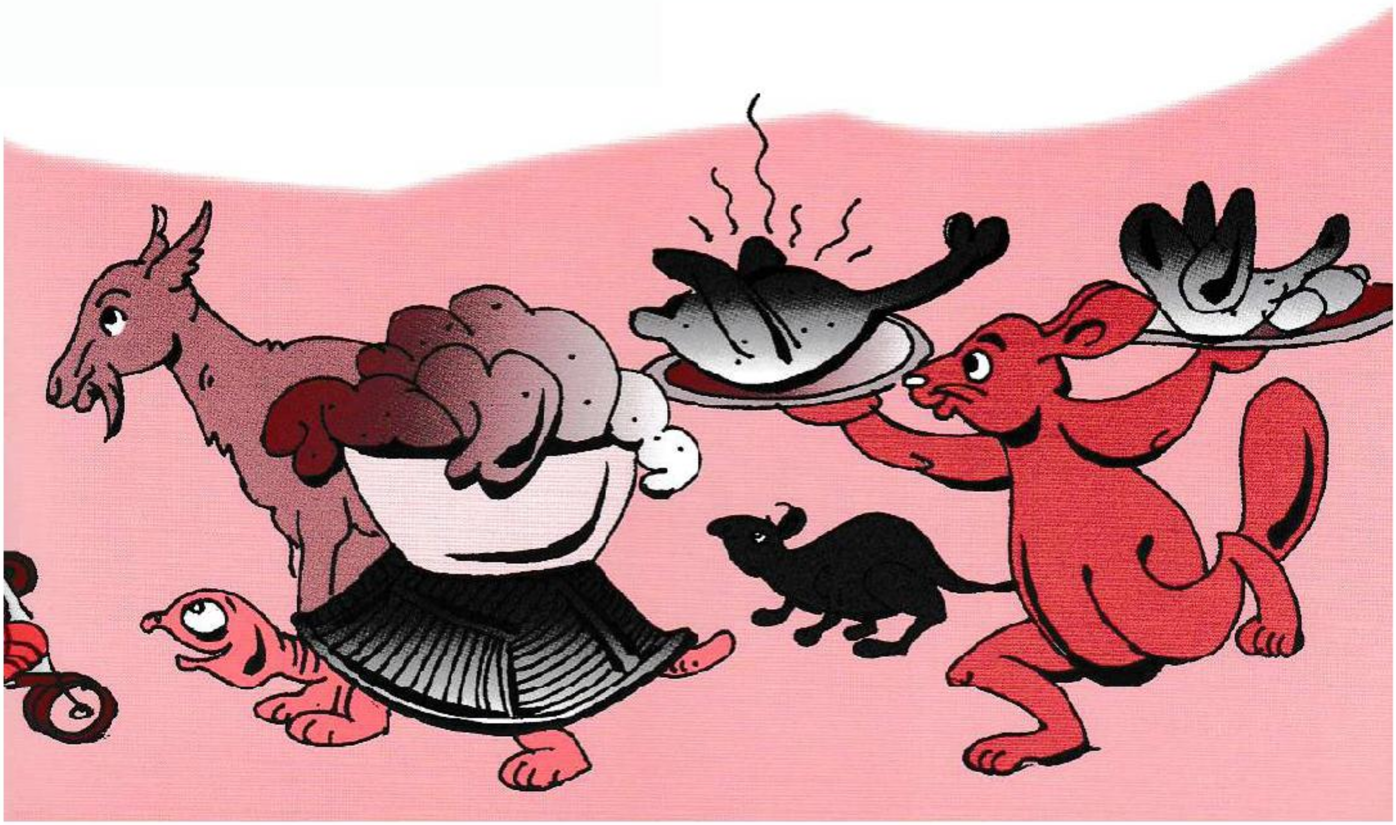
তবে অনেক প্রাণীই সিংহটির প্রতি বিশ্বস্ত রইল। আর সিংহটিও তাদের দেখার জন্য সর্বদা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে অরণ্যের খবরাখবর শুনত এবং প্রাণীরা তার কাছে যেসব সমস্যা নিয়ে আসত, সেগুলোর সমাধান করে দিত। সে তার সাধ্যমতো যে ভাবে পারত তাদের সাহায্য করত।

একদিন অরণ্যটি ভীষণ নিস্তব্ধ মনে হলো। সিংহটি সেখানে একেবারে একা বসে ছিল। কিছুক্ষণ পর সে অন্য প্রাণীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সে তার হুইলচেয়ারে চড়ে ধীরে ধীরে অরণ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

অচিরেই সে প্রাণীদের দেখা পেল। তারা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিল। এ কী! তারা সেখানে একটি সভা বা বৈঠক করছিল। সিংহটি গভীর মনোযোগ দিয়ে তাদের আলোচনা শুনতে লাগল।

একটি প্রাণী বলল, "আমাদের এখন একজন নতুন নেতা নির্বাচন করার সময় এসে গেছে!" "না, না!" অন্য একজন বলল।

"সিংহ সব সময়ই আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেয়," কেউ একজন বলল।



"কিন্তু ওর শরীরে তো আর আগের মতো শক্তি নেই!" অন্য একজন বলে উঠল। "ও কীভাবে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে?"

তখন বয়োজ্যেষ্ঠ পশুদের একজন বলল, "সিংহের শরীর হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু ওর মন এখনো শক্তিশালী । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবাদে ও বনের অলিগলি আর রীতিনীতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানে। তাই কঠিন সময়েও ও আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে।"

পশুরা কিছুক্ষণ ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবল। তারপর তারা সবাই মিলে সিংহকেই তাদের নেতা হিসেবে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

সিংহ খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের আলোচনা শুনছিল। এবার সে তার গুহায় ফিরে গেল। সে তার হুইলচেয়ারে অত্যন্ত শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেউ একজন একটি সমস্যা নিয়ে তার কাছে এল। সিংহ চটজলদি সেটির সমাধান করে দিল। এরপর দুটি খরগোশের মধ্যকার একটি বিবাদের কথা উঠল। সেটিরও খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই অন্য কেউ একজন তার জন্য খাবার নিয়ে এল।

দিনটি আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। আর বনে আবার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে এল।

বিদ্যা সাগর (চেন্নাই)-এর শিশুদের অভিনীত একটি নাটকের অবলম্বনে রচিত।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

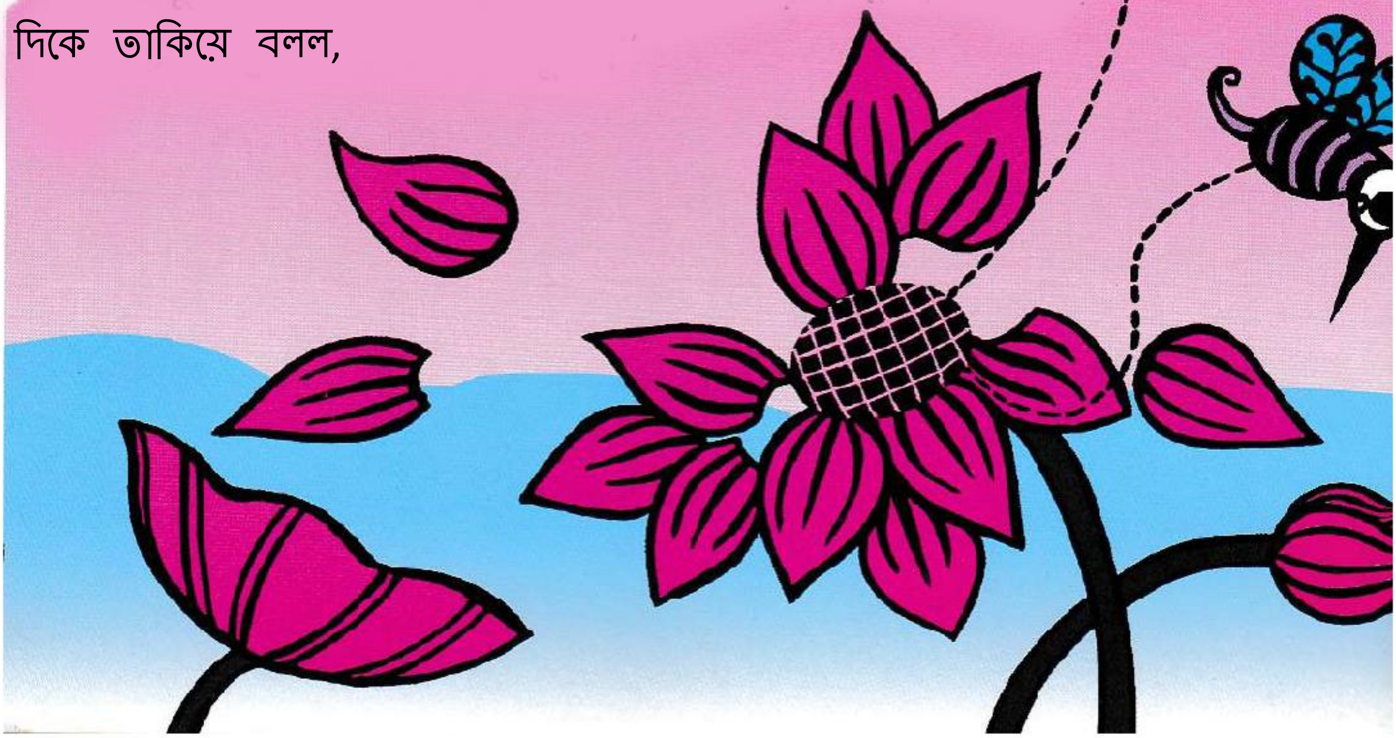
পদ্মটির রাগ কেন

"সব মৌমাছিরা কোথায় যায়? আজ আমি ওদের পিছু নেব আর খুঁজে বের করব!" কৌতূহলে গুঞ্জন করতে করতে একটি ছোট্ট মৌমাছি মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

শীঘ্রই ছোট্ট মৌমাছিটি একটি পদ্মপুকুরের কাছে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে একটি সুন্দর পদ্মফুল দেখতে পেল। সে নিচে উড়ে এল এবং 'ঝপাং' করে ফুলের ওপর বসল। পদ্মটি কেঁপে উঠল। ফুলটি থেকে একটি পাপড়ি খসে পড়ল। এতে পদ্মটি রেগে গেল। "তোমার জন্য কোনো মধু নেই!" সে বলল। "দূর হও এখান থেকে!"

"পদ্মটি আমার ওপর কেন রেগে আছে?" ছোট্ট মৌমাছিটি ভাবল। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে উড়ে পালাল।

ছোট্ট মৌমাছিটি একটি গাছের ডালে এসে বসল। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিকমিক করছিল। মৌমাছিটি সূর্যের কিরণের দিকে তাকিয়ে বলল,





"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো উজ্জ্বল ও সুন্দর সূর্যকিরণ,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"



সূর্যকিরণগুলো বলল, "চিন্তা কোরো না! আমরা পদ্মটির ওপর আলো ছড়াব আর ওকে খুশি করে দেব।" সোনালি কিরণগুলো পদ্মফুলটির ওপর নেমে এল। রোদ পোহানোর জন্য ফুলটি তার পাপড়িগুলো মেলে ধরল।



কিন্তু সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে একটুও মধু দিল না!

কী দারুণ হতাশা! ছোট্ট মৌমাছিটি কিছুক্ষণ পদ্মটির চারপাশে ঘোরাঘুরি করল। তারপর মনমরা হয়ে সেখান থেকে উড়ে গেল।

এবার পুকুরের ওপর মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। ছোট্ট মৌমাছিটি বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল এবং বলল,

"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো সুন্দর, স্নিগ্ধ বাতাস,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

বাতাস উত্তর দিল, "চিন্তা কোরো না! আমরা পদ্মটির ওপর আলতো করে বইব আর ওকে সতেজ ও শীতল করে দেব।"

তারা ফুলটির ওপর দিয়ে আলতোভাবে বয়ে গেল। পদ্মটি আনন্দে তার পাপড়িগুলো দুলিয়ে দিল। কিন্তু সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে একটুও মধু দিল না!

আহা, বেচারা ছোট্ট মৌমাছি! "পদ্মটির রাগ মেটাতে আমি কী করতে পারি?" সে ভাবতে লাগল। ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে কিছু মেঘ ভেসে এল।



মৌমাছিটি মেঘের ছায়া দেখতে পেল এবং আকাশের দিকে তাকাল। সে বলল,



"ওই সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মটি
আমাকে কোনো মধু দেবে না।
ওগো ঘনঘোর ও সুন্দর মেঘমালা,
তোমরা কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

"চিন্তা কোরো না," মেঘেরা বলল। "আমরা পদ্মটির ওপর বৃষ্টি ঝরাব আর ওকে সুন্দর করে স্নান করিয়ে দেব।" পুকুরের ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরে পড়ল। সব গাছপালা আনন্দে মেতে উঠল এবং সতেজ হয়ে উঠল। পদ্মফুলটিও বৃষ্টির ফোঁটায় স্নান করল এবং সে-ও বেশ সতেজ অনুভব করল।

কিন্তু সে সেই ছোট্ট মৌমাছিটিকে একফোঁটাও মধু দিল না!

ছোট্ট মৌমাছিটি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল! সে বিষণ্ন মনে, নিচু স্বরে গুঞ্জন করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেল, গাছের ডালে বসে একটি পেঁচা ঢুলছে।

সে পেঁচাটিকে বলল—
"ওই যে সুন্দর, অতি সুন্দর পদ্মফুলটি,
সে আমাকে একটুও মধু দেবে না।
ওগো জ্ঞানী ও সুন্দর পেঁচা,
তুমি কি তার মনটা বদলে দিতে পারো?"

পেঁচাটি ছোট্ট মৌমাছিটিকে বলল, "আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব।" ছোট্ট মৌমাছিটি উড়ে পেঁচাটির কাছে চলে এল। পেঁচাটি ছোট্ট মৌমাছিটির কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। পেঁচাটি কী বলেছিল, তা আর কেউ শুনতে পেল না—যদিও তারা শোনার জন্য কম চেষ্টা করেনি!

এবার ছোট্ট মৌমাছিটি মনে আশা নিয়ে আবার পুকুরের দিকে উড়ে চলল। অত্যন্ত আলতোভাবে গিয়ে সে পদ্মফুলটির ওপর বসল। খুব সুন্দর ও বিনয়ের সাথে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমাকে একটু মধু দেবে?"

হঠাৎ করেই পদ্মফুলটির মন থেকে সব রাগ দূর হয়ে গেল। সে ছোট্ট মৌমাছিটিকে সাদরে বরণ করে নিল। "তোমার যতটা ইচ্ছে, ততটাই নিয়ে নাও!" সে বলল।

ছোট্ট মৌমাছিটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোপন রহস্যটি শিখে ফেলেছিল!



একটি ভারতীয় লোককথা; শোভিতা পুঞ্জা-র পুনর্কথন অবলম্বনে।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi **Bengali** Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi **Artist** Uma Krishnaswamy

67 গান্ধী দাদু

সেটা ছিল ২রা অক্টোবর—গান্ধীজির জন্মদিন। আমার ছোট ভাই আর আমি তাঁকে "শুভ জন্মদিন" জানাতে এবং মালা পরাতে গিয়েছিলাম।

আশ্রমটি লোকে লোকারণ্য ছিল। সবাই খাদি সুতির পোশাক পরেছিলেন। এমনকি খাদির তৈরি টুপিও ছিল অনেকের মাথায়!

আমরা গান্ধীজির কাছে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে মালা পরিয়ে দিলাম। গান্ধীজি মৃদু হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পরের বার কি তোমরা আমার জন্য একটা খুব ভালো উপহার নিয়ে আসবে?"

"আপনি কী উপহার চান? আমাদের বলুন, দাদু!"



তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্য এমন একটি মালা নিয়ে এসো, যার সুতো তোমরা নিজেদের হাতে কেটেছ। আনবে তো?"

আমার ছোট ভাই বলল, "কিন্তু আমরা তো চরকায় সুতো কাটতে জানি না!" গান্ধীজি উত্তর দিলেন, "তোমাদের মা-বাবাকে বলো তোমাদের শিখিয়ে দিতে।"

বাড়ি ফেরার পথে আমার ছোট ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করল, " গান্ধী দাদু কেন চান যে আমরা সুতো কাটা শিখি?"

আমি আমার সাধ্যমতো গান্ধীজির ভাবনাটি তাকে বুঝিয়ে বললাম। "খাদি কাপড় বুনে গ্রামের মানুষ তাদের পরিবারের ভরণপোষণ জোগাড় করার একটা উপায় পায়। আমরা যদি বিদেশ থেকে কাপড় কিনি, তবে তাদের কাজের সুযোগ কমে যাবে। ঠিক এই কারণেই গান্ধী দাদু চান যে আমরা নিজেরা সুতো কাটি এবং খাদির পোশাক পরি।"

বাড়ি ফিরে আমরা মাকে আমাদের আশ্রমে যাওয়ার কথা জানালাম। মা গান্ধীজি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের আরও কিছু কথা বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, "গান্ধীজি ব্রিটিশ শাসনের থেকে আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন। এই সংগ্রামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো খাদি।"

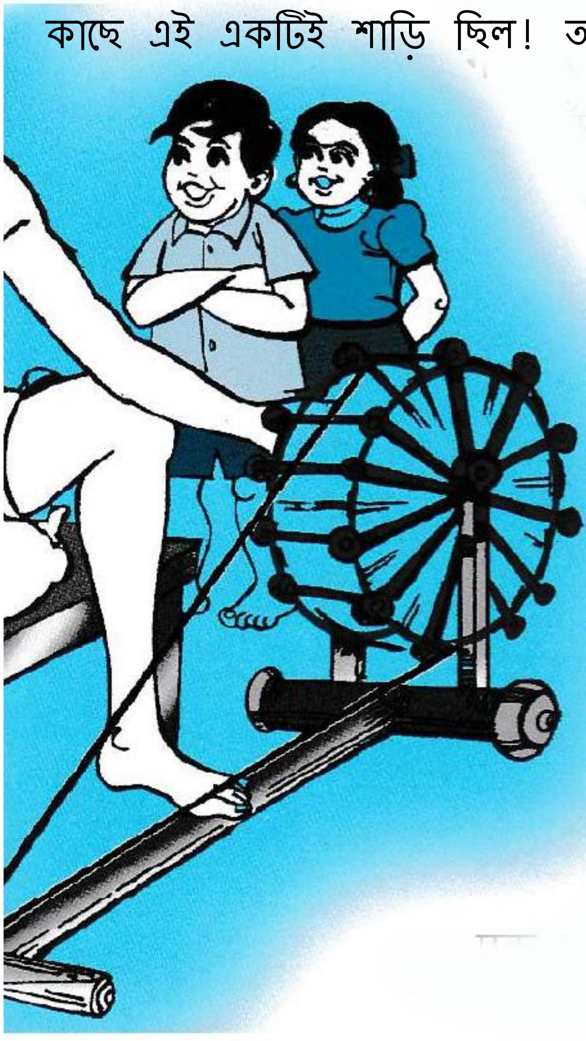
ঠিক সেই দিন থেকেই আমরা চরকা ব্যবহার করা শুরু করলাম।



গান্ধীজি প্রায়ই ট্রেনে করে যাতায়াত করতেন। তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একবার তিনি ট্রেনে করে মাদুরাই গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বহু মানুষের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদের খাদি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁদের উত্তর শুনে তিনি বেশ ব্যথিত হলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা এতটাই গরিব যে খাদি কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই। এর দাম বড্ড বেশি।"

মাদুরাইয়ে গান্ধীজি অনেক কৃষককে মাঠে কাজ করতে দেখলেন, যাঁদের পরনে ছিল কেবল একটি করে কৌপীন বা ছোট কাপড়। তাঁদের এই চরম দারিদ্র্য দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন।

একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে এক মহিলা ও তাঁর সন্তান উপস্থিত ছিলেন। মহিলাটি তাঁর শাড়ির অর্ধেক অংশ নদীতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলেন, আর বাকি অর্ধেক অংশ নিজের শরীরের চারপাশে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তার কাছে এই একটিই শাড়ি ছিল! আর সেটাও ছিল ছেঁড়া!



ওই নারীর দারিদ্র্য গান্ধীজিকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি নিজের গায়ের শালটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি নিজের কাছে থাকা সমস্ত পোশাকের কথা ভাবলেন।

"দেশে এত এত দরিদ্র মানুষ থাকতে, আমি কীভাবে নানা রকমের জামা পরতে পারি? এটা ঠিক নয়।"

তার মনের ভেতর তখন এক প্রবল আলোড়ন চলছিল। ১৯২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর, তিনি তার চিরাচরিত পোশাক ত্যাগ করলেন এবং কেবল একটি সাধারণ সাদা ধুতি পরতে শুরু করলেন।

একবার একটি ছোট ছেলে সাবরমতি আশ্রমে গান্ধীজির সাথে দেখা করতে এল। সে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, তুমি জামা পরোনি কেন? আমি কি আমার মাকে বলব তোমার জন্য একটা জামা সেলাই করে দিতে?"

গান্ধীজি মৃদু হাসলেন এবং উত্তর দিলেন, "তোমার মা আমার জন্য কটা জামা সেলাই করে দিতে পারবে?"

"তুমিই বলো দাদু, তোমার কটা জামা চাই। আমি মাকে বলব তোমার জন্য সেগুলো বানিয়ে দিতে।"

গান্ধীজি বললেন, "আমার ৪০ কোটি ভাই-বোন রয়েছে। তারা যখন জামাহীন অবস্থায় আছে, তখন আমি কীভাবে জামা পরতে পারি?"— স্নেহভরে তিনি এই প্রশ্নটি করলেন।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

জলবিন্দুর যাত্রা



একদা রোদের মধ্যে একটি মাটির পাত্র রাখা ছিল। পাত্রটির ভেতর কানায় কানায় জল পূর্ণ ছিল। জলের উপরিভাগে একটি জলবিন্দু ভেসে উঠল।

জলবিন্দুটি সূর্যের কিরণ অনুভব করল। আলোর দিকে উপরে ওঠার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। পাত্রের কিনারা ধরে নিজেকে ঠেলে ও টেনে উপরে তুলতে তুলতে, একসময় সে পাত্রের মুখ ছাড়িয়ে উপরে উঠে এল!



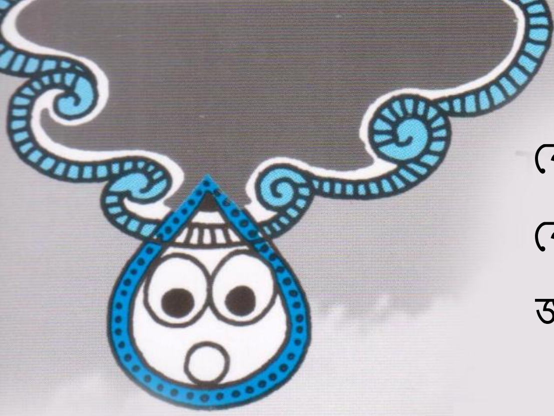
মাত্র এক মুহূর্তের জন্য জলবিন্দুটি ভয় পেল। তারপরই সে সূর্যের দিকে তাকাল! আনন্দে বিভোর হয়ে সে জলীয় বাষ্প রূপে আকাশের পানে উঠে গেল।



জলবিন্দুটি বাষ্প হয়ে উপরের দিকে ভেসে চলল এবং তারপর কিছু ধবধবে সাদা মেঘের মাঝে ঘনীভূত হয়ে জমাট বাঁধল। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল—আরও অনেক জলবিন্দু সেখানে রয়েছে। তারা সবাই একইভাবে আকাশে উঠে এসেছিল। সে তার সবচেয়ে কাছের জলবিন্দুগুলোকে জিজ্ঞেস করল, সূর্যের কাছে পৌঁছানোর উপায় কী। কিন্তু কেউই তা জানত না।

জলবিন্দুটি বেশ কয়েক দিন ধরে মেঘেদের মাঝে ঘুরে বেড়াল। সে এখানে-সেখানে ভেসে বেড়াল। একদিন সে দেখল, একটি নতুন মেঘ এগিয়ে আসছে। এই মেঘটি সাদা বা ধবধবে তুলোর মতো ছিল না। এটি ছিল বিশাল, ভারী এবং কালো রঙের। জলবিন্দুটি লাফ দিয়ে সেই নতুন মেঘটির ভেতরে চলে গেল।

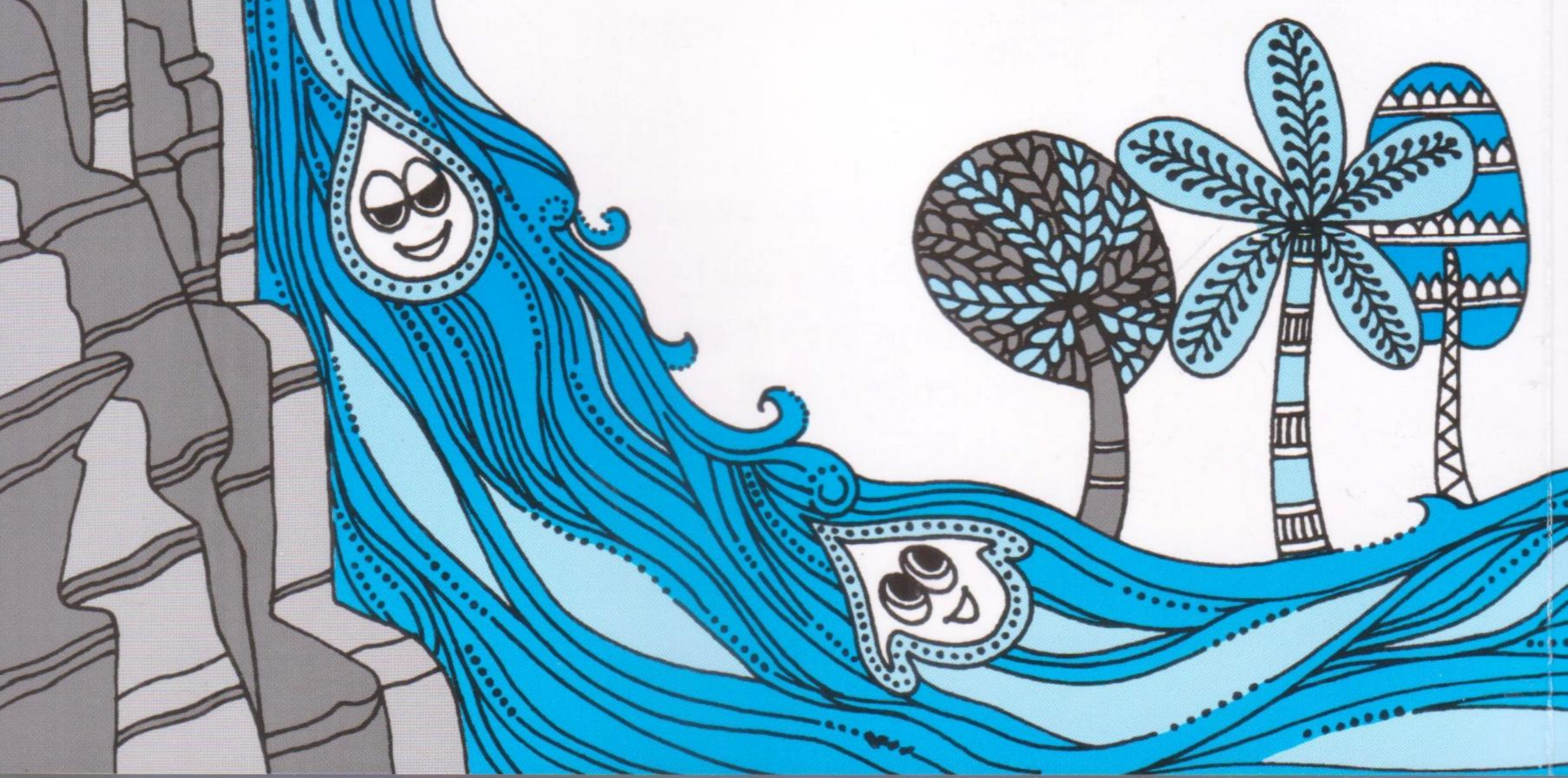




সে রাতে কালো মেঘটি খুব অস্থির হয়ে উঠল। সে কেবলই মোচড়াতে লাগল। বজ্রপাতের গর্জনে সে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জলবিন্দুটি বুঝতে পারল যে, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

হঠাৎ বেড়ে ওঠা এক দমকা বাতাস জলবিন্দুটিকে মেঘের ভেতর থেকে বাইরে উড়িয়ে দিল। সে তখন অঝোর ধারায় ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাদের ভিড়ে মিশে গেল । বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল! বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছলাৎ শব্দে একটি খরস্রোতা নদীর জলে গিয়ে পড়ল।

জলবিন্দুটি অনুভব করল—নদীর জল কখনো উপরে উঠছে, আবার কখনো নিচে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎই সে পাহাড়ের এক কিনারা থেকে নিচে ছিটকে পড়ল! নদীর ধারাটি পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে চলল। বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে সে তীব্র গতিতে ছুটে চলল। জলের সাদা ফেনা ছিটকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল! এরপর, নদীটি শান্ত ও ধীরলয়ে নিজের পথে চলতে শুরু করল।



জলবিন্দুটি তার আশেপাশের অন্যান্য জলবিন্দুদের জিজ্ঞেস করল—নদীটি কোন দিকে এগিয়ে চলেছে। "এটি সেই বিশাল নদীর সাথে মিলিত হতে ছুটে চলেছে," তারা বলল।

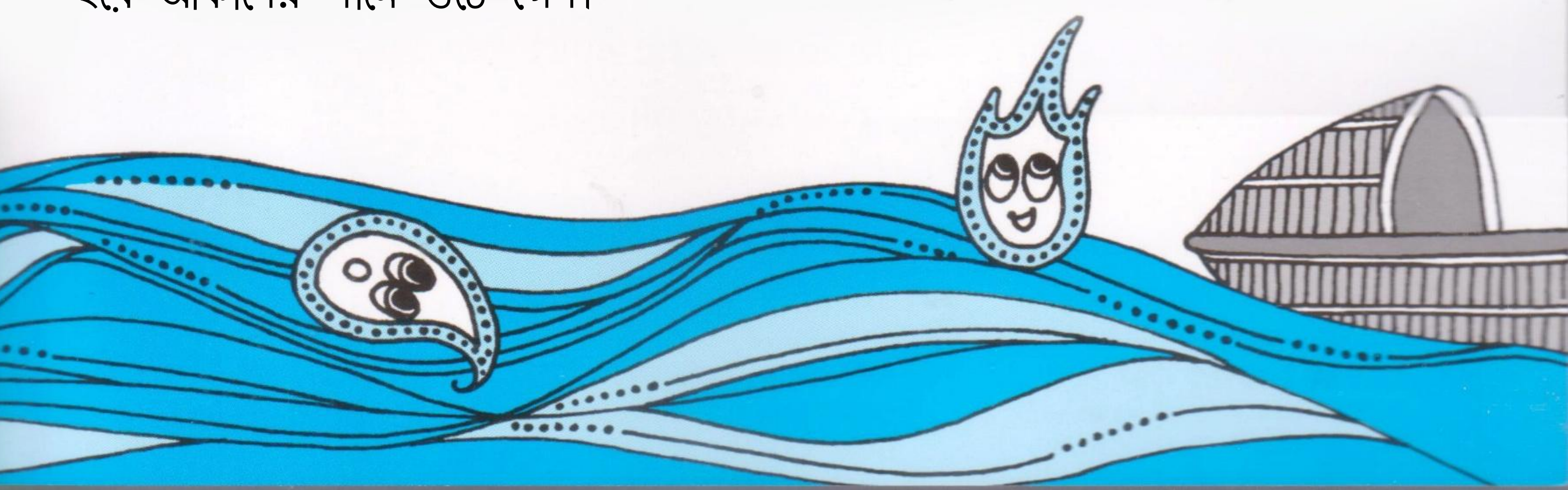
আর ঠিক সেখানেই ছিল সেই বিশাল নদীটি। নদীটি ছিল প্রশস্ত ও কানায় কানায় পূর্ণ। নদীর দুই তীর জুড়ে ঝুঁকে ছিল সারি সারি গাছ। ছায়া-ঢাকা পরিবেশের মাঝেও সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল নদীর জলকণাগুলো।

জলকণাটি পরম আনন্দে সেই দৃশ্য দেখল। জলের সেই দ্রুত প্রবাহ ও গতি সে মন ভরে উপভোগ করল। আহা, কী দারুণভাবেই না সে তার এই যাত্রা উপভোগ করছিল! তবে সে এ-ও জানত যে, তার এই যাত্রা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

এরপর নদীটি গিয়ে মিশল সাগরে। সাগরের বিশাল জলরাশি সেই ক্ষুদ্র জলকণাটিকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিল।

তরঙ্গমালার নিচ থেকে জলকণাটি আকাশের দিকে তাকাল। আহা! সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছিল পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘেরা। জলকণাটির মনে পড়ে গেল—কীভাবে সে একটি মাটির পাত্র থেকে উঠে এসে সেই সাদা মেঘেদের দলে শামিল হয়েছিল। এবার সে সূর্যের দিকে তাকাল।

হঠাৎই জলকণাটি বুঝতে পারল—তাকে এখন কী করতে হবে। সে কোনোমতে নড়াচড়া করতে করতে জলের উপরিভাগে উঠে এল। সর্বশক্তি দিয়ে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করতেই সে উষ্ণ সূর্যের আলোর স্পর্শ পেল। আবার সে জলীয় বাষ্প হয়ে আকাশের পানে উঠে গেল।





এবার সে একদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। আর যখন রাত নেমে এল, তখন সে তারাদের স্নিগ্ধ আলোয় নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

একদিন জলকণাটি নিচের দিকে—পৃথিবীর পানে তাকাল। সে দেখতে পেল সেই বিশাল সাগরকে, যেখান থেকে সে উঠে এসেছিল। সে দেখতে পেল সেই নদীটিকে এবং সেই খরস্রোতা ঝর্ণাটিকেও। তার যাত্রাপথে সে যা-কিছু পেছনে ফেলে এসেছিল—সবকিছুই এখন তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট ছোট মেঘের দল এসে জলকণাটির চারপাশে জড়ো হতে শুরু করল। জলকণাটি নিজেকে আরও ওপরের দিকে টেনে নিল এবং সেই মেঘেদেরও ছাড়িয়ে আকাশের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গেল।

এরপর সে ধীরে ধীরে কুয়াশায় পরিণত হয়ে গেল। সেই কুয়াশা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং পারিপার্শ্বিক বাতাসের সাথে একাকার হয়ে মিশে গেল।

ক্রিস্টোফার ই. জোন্স-এর "One Drop of Water" অবলম্বনে রচিত

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

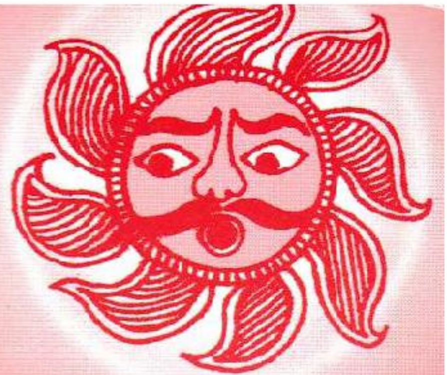
Bengali Sriparna Tamhane

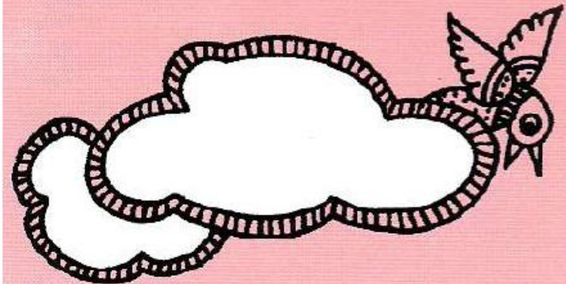
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

69

যে শিশুটি সূর্যের সাথে খেলা করত

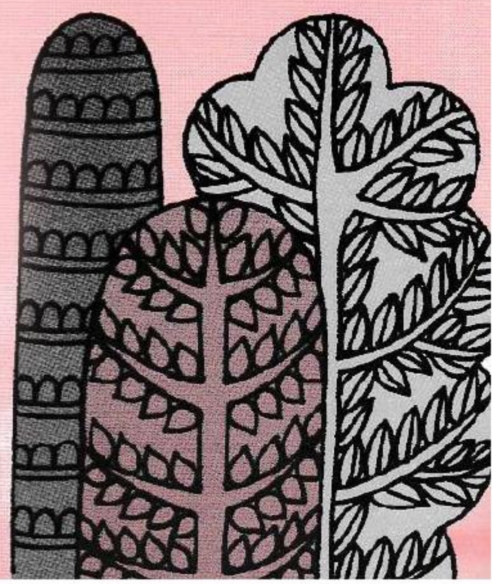








হনুমান যখন ছোট ছিল, তখন সে ছিল এক অত্যন্ত দুরন্ত বানর-শিশু। সে যেকোনো কিছুকেই খেলাতে পরিণত করত! তার মা অঞ্জনা তাকে সামলাতেই পারতেন না।



একবার হনুমান লক্ষ্য করল যে, সূর্যের একটি রশ্মি তার মুখের ওপর এসে পড়েছে। সে আকাশের দিকে তাকাল। ওই তো সূর্য! দেখতে ঠিক যেন একটি বিশাল লাল ফল। সেটাকে ধরার জন্য সে লাফ দিল- উপরে, আরও উপরে, আরও উপরে। "আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!" সে বলে উঠল।

সূর্য এতে মোটেও খুশি হলো না। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু হনুমান সারা আকাশ জুড়ে তার পিছু ধাওয়া করল। দিন গড়িয়ে রাত হল, আর রাত পেরিয়ে আবার দিন এল। সেই ধাওয়া করতেই থাকল। হনুমানের কাছে এ এক কী চমৎকার খেলা!

সূর্য বুঝতে পারল যে তার সাহায্যের প্রয়োজন। সে ইন্দ্রকে ডাকল । ইন্দ্র যখন দেখলেন কী ঘটছে, তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন । তিনি বজ্রের আঘাতে হনুমানকে ধরাশায়ী করলেন! হনুমানের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সে নিচের দিকে পড়তে শুরু করল।

হনুমানের দিব্য পিতা, পবনদেব (বায়ু), তাকে মাঝ-আকাশেই লুফে নিলেন। "তুমি কীভাবে এমন একটি ছোট শিশুকে আঘাত করতে পারলে?" তিনি ইন্দ্রের ওপর গর্জে উঠলেন।

পবনদেব—যিনি সমস্ত বাতাসের চেয়ে বেশি দ্রুতগামী—এবার গভীর শ্বাস নিলেন এবং পৃথিবী থেকে সমস্ত বাতাস শুষে নিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে সাইক্লোন, হারিকেন এবং টর্নেডো বয়ে গেল। এমনকি বিশাল পর্বতমালাও টলমল করতে শুরু করল! সমস্ত মানুষ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা আতঙ্কে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

তখন পবনদেব বললেন: "আমার পুত্রের দেহে শ্বাস ফিরিয়ে দাও, তার বিনিময়ে আমি পৃথিবীতে বাতাস ফিরিয়ে দেব।"



তিনি হনুমানকে মাটির অনেক গভীরে নিয়ে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাতাস পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল। গাছপালা, ফুল, ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, মানুষ এবং পশুপ্রাণী—সমস্ত জীবজন্তু—একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগল।

শীঘ্রই চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল; কোথাও কোনো শব্দ রইল না। বাতাস ছাড়া পৃথিবী যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল।

দেবতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। "দয়া করে ইন্দ্রকে ক্ষমা করুন," তাঁরা মিনতি করলেন এবং হনুমানের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করলেন।

তাঁরা হনুমানকে নিরাপদ রাখার জন্য কিছু বিশেষ উপহারও দিলেন:

"বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না!"

"তুমি যেখানে খুশি, সেখানেই উড়ে যেতে পারবে!""

তুমি নিজের ইচ্ছেমতো তোমার আকৃতি ও আকার পরিবর্তন করতে পারবে!"

এভাবেই দেবতারা হনুমানকে বিশেষ শক্তিসমূহ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।





কিন্তু পবনদেব এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। "আমার পুত্র কি এই বিশেষ শক্তিগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা জানতে পারবে? বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ছাড়া এই শক্তিগুলো তো একেবারেই অকেজো," তিনি দেবতাদের বললেন।

"চিন্তা করবেন না!" দেবতারা অভয় দিলেন। "হনুমান তাঁর দৈহিক শক্তির পাশাপাশি তাঁর প্রজ্ঞার জন্যও সুপ্রসিদ্ধ হবেন!"

অবশেষে বায়ু নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ, পশু ও গাছপালা —সবকিছুতেই প্রাণ ফিরে এল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

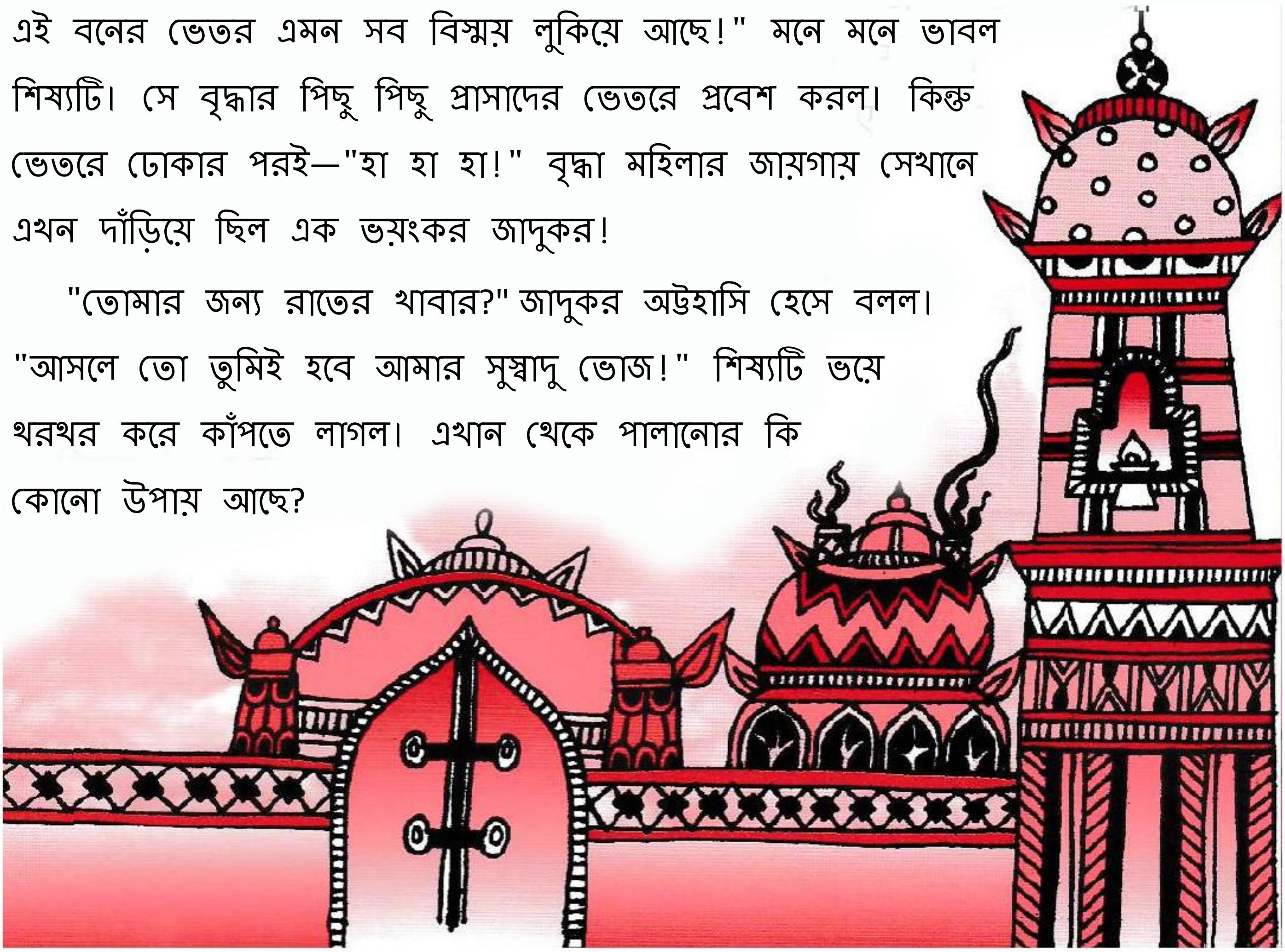
70 তিনটি পালক

একদিন এক ঋষি তাঁর শিষ্যকে বললেন, "আজ তোমাকে বনে গিয়ে ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহ করতে হবে। তোমার সাথে এই তিনটি পালক নিয়ে যাও। এগুলো তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।" এই বলে তিনি শিষ্যকে তিনটি পালক দিলেন।

শিষ্য বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহ করতে লাগল। কয়েক ঘন্টা পর সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হঠাৎ একটি কন্ঠস্বর তাকে ডেকে উঠল, "খোকা! আমার সাথে বাড়ি চলো। আমি তোমাকে চমৎকার রাতের খাবার রেঁধে খাওয়াব, তারপর তুমি যত খুশি বিশ্রাম নিতে পারবে।" কন্ঠস্বরটি ছিল এক বৃদ্ধা মহিলার। তিনি শিষ্যটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন।

সেই বৃদ্ধা শিষ্যটিকে পথ দেখিয়ে এক বিশাল প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদের চূড়াগুলো আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। "আমি তো জানতামই না যে এই বনের ভেতর এমন সব বিস্ময় লুকিয়ে আছে!" মনে মনে ভাবল শিষ্যটি। সে বৃদ্ধার পিছু পিছু প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পরই—"হা হা হা!" বৃদ্ধা মহিলার জায়গায় সেখানে এখন দাঁড়িয়ে ছিল এক ভয়ংকর জাদুকর!

"তোমার জন্য রাতের খাবার?" জাদুকর অট্টহাসি হেসে বলল। "আসলে তো তুমিই হবে আমার সুস্বাদু ভোজ!" শিষ্যটি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। এখান থেকে পালানোর কি কোনো উপায় আছে?



ঠিক তখনই তার সেই তিনটি পালকের কথা মনে পড়ল। সে একটি ফন্দি আঁটল। সে জাদুকরকে বলল, "আমাকে এখনই খেয়ে ফেলবেন না; দেখুন আমি কত নোংরা হয়ে আছি। আগে আমাকে স্নান করতে দিন। স্নান সেরে আমি যখন আপনার কাছে ফিরে আসব, তখন আমি হবো একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সুগন্ধি!"



স্নানঘরে ঢুকে শিষ্যটি একটি পালক মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল, "যখনই জাদুকর আমাকে ডাকবে, তুমি আমার হয়ে উত্তর দিও।" তারপর সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে পালাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই জাদুকর শিষ্যকে ডেকে তাড়া দিল। ভেতর থেকে উত্তর এল, "এই তো আমি চলে আসছি!" কিন্তু স্নানঘর থেকে শিষ্য আর বেরিয়ে এল না!

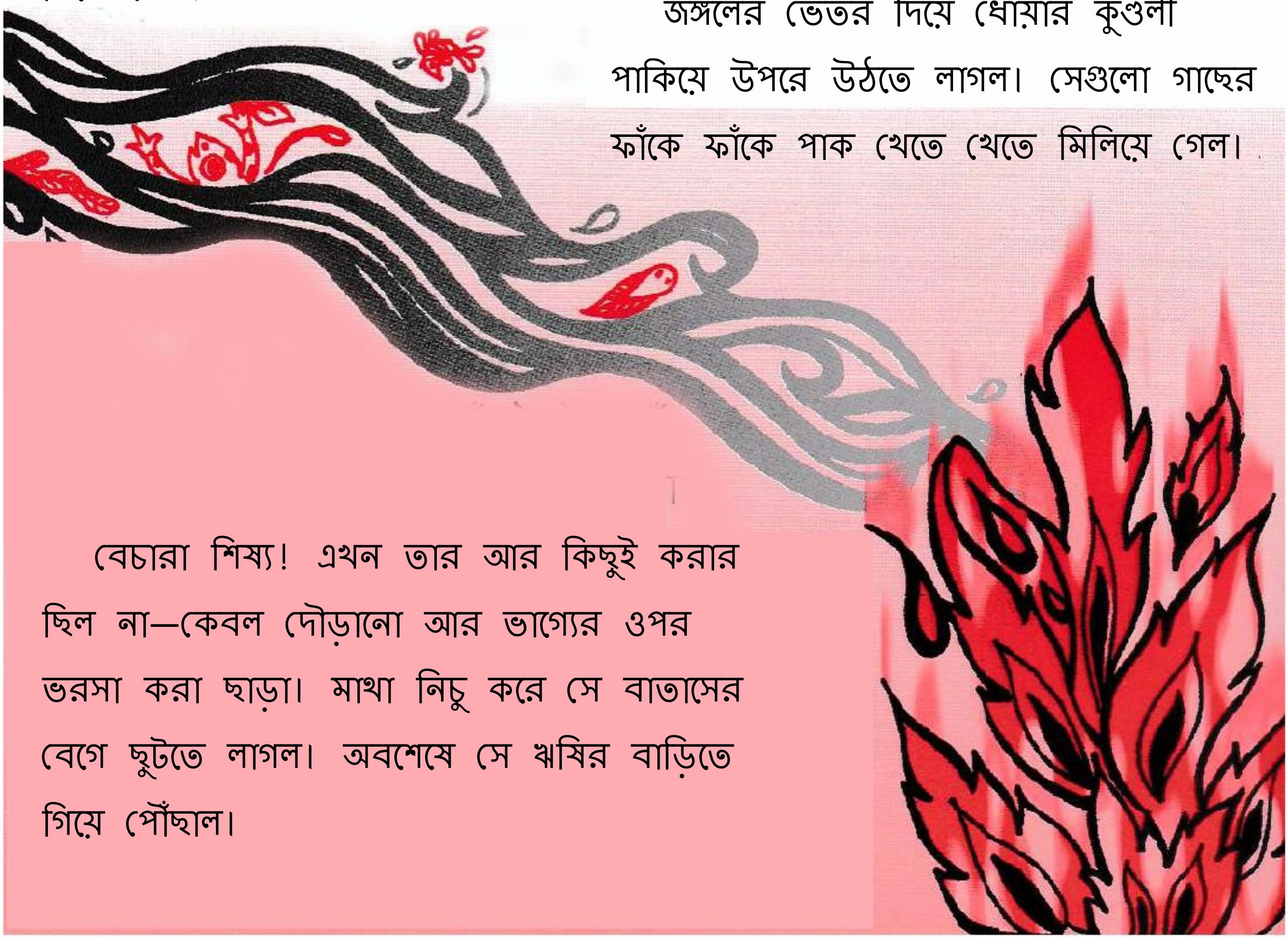
জাদুকর যখন আবার ডাকল, তখনো ভেতর থেকে সেই একই উত্তর এল। কিন্তু এবারও শিষ্যটি বেরিয়ে এল না! ক্ষুধার্ত জাদুকরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল; সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছিল না। নিজের জাদুকরী শক্তিবলে সে স্নানঘরের দরজা ভেঙে ফেলল। কিন্তু ঘরটি ছিল একদম খালি! জাদুকর ক্রোধে কাঁপতে লাগল। সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমি তোকে ধরবই!"

শিষ্যটি শুনতে পেল যে জাদুকর তার পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি আরেকটি পালক হাতে তুলে নিয়ে বলল, "আমার আর জাদুকরের মাঝখানে একটি নদী তৈরি করে দাও!" মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে একটি নদী বয়ে চলল। সেই জাদুকরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম তৈরি হল ! শিষ্যটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। " উফ, আমি বেঁচে গেছি!" সে মনে মনে ভাবল।

কিন্তু ঠিক তখনই, "গলগল" করে জলের শব্দ ভেসে এল। পেছনে ফিরে শিষ্যটি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখল! জাদুকর তার মুখটা বিশাল করে হাঁ করে আছে। সে নদীর জল পুরোটাই পান করে ফেলছে! জল কলকল শব্দে তার মুখের ভেতর ছুটে ঢুকছে।

শিষ্যটি তৃতীয় পালকটি হাতে তুলে নিল। "আমার ঠিক পেছনে একটি দাবানল সৃষ্টি করো," সে আদেশ দিল। দাউ দাউ করে এক বিশাল আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু আবার জাদুকর তার মুখটা বিশাল করে হাঁ করল। শোঁওও! সে যে জল গিলে খেয়েছিল, তার সবটুকু প্রবল বেগে বেরিয়ে এল। এক দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দের সাথে সাথে আগুন নিভে গেল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। সেগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল।



বেচারা শিষ্য! এখন তার আর কিছুই করার ছিল না—কেবল দৌড়ানো আর ভাগ্যের ওপর ভরসা করা ছাড়া। মাথা নিচু করে সে বাতাসের বেগে ছুটতে লাগল। অবশেষে সে ঋষির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল।

জাদুকর ছিল ঠিক তার পেছনেই। সে বাড়ির প্রবেশপথে এসে থামল এবং ঋষিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আপনার শিষ্যকে আমার হাতে তুলে দেবেন? নাকি তার বদলে আমি আপনাকেই খেয়ে ফেলব?"

"নিজের ক্ষমতা নিয়ে এত নিশ্চিত হবেন না!" ঋষি উত্তর দিলেন। "আমি মন্ত্রের লড়াইয়ে আপনার সাথে সমানে পাল্লা দিতে পারি! চলুন, আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হোক। আপনি যদি জেতেন, তবে আমার শিষ্যকে নিয়ে যেতে পারেন।"

"বেশ। তবে শুরু করা যাক," জাদুকর বলল।

"আপনি কি নিজেকে এই বাড়িটির সমান উঁচু করতে পারবেন?" ঋষি জিজ্ঞেস করলেন। মুহূর্তের মধ্যেই জাদুকর সেই বাড়িটির সমান উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু ঋষি তাতে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হলেন না। "লম্বা তো যে-কেউই হতে পারে," তিনি বললেন। "আচ্ছা, এখন বলুন তো—আপনি কি নিজেকে একটা মটরদানার সমান ছোট করতে পারবেন?"

"এ আবার কঠিন কী?" জাদুকর জিজ্ঞেস করল। চোখের পলকে সে নিজেকে একটা মটরদানায় রূপান্তরিত করে ফেলল। ঋষি সেই মটরদানাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের ভেতর পুরে দিলেন। এক জোরালো ঢোক গিলে তিনি সেটি গিলে খেয়ে ফেললেন।

আর এভাবেই সেই দুষ্ট জাদুকরের চিরসমাপ্তি ঘটল!

একটি জাপানি লোককথা অবলম্বনে রচিত



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy



পাখিদের বাসা

পাখি! তাদের উজ্জ্বল রঙ দিয়ে তারা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! তাদের গানের সুরে তারা আমাদের মন ভালো করে দেয়! আর ওহ, তারা কী চমৎকার সব বাসা তৈরি করে!

বেশিরভাগ পাখি তাদের বাসাতেই বসবাস করে না। তারা মূলত তাদের ছানাদের জন্যই বাসা তৈরি করে। তারা বাসাতেই ডিম পাড়ে এবং সেগুলোতে তা দিয়ে উষ্ণ রাখে। সেখানেই তারা ছানাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে। ছানারা উড়তে শেখার মতো বড় না হওয়া পর্যন্ত বাসাতেই অবস্থান করে। এরপর পুরো পরিবারটিই উড়ে চলে যায়।



কিছু পাখি বছরের পর বছর ধরে তাদের পুরনো বাসাই পুনরায় ব্যবহার করে। কিন্তু কাকের মতো অনেক পাখিই প্রতি ঋতুতে নতুন করে বাসা তৈরি করে। একারণেই আমরা প্রায়ই কাকদের ঠোঁটে ছোট ছোট ডালপালা বয়ে নিয়ে যেতে দেখি। নিরাপত্তার স্বার্থে, তারা গাছের যতটা সম্ভব উঁচুতে তাদের বাটির মতো দেখতে বাসাগুলো তৈরি করে।

আপনি কি জানেন যে, সব পাখির বাসা বাটির মতো দেখতে হয় না? আসলে বহু রকমের বাসা রয়েছে। কোনো কোনো বাসা সেলাই করে তৈরি করা হয়। কোনোটা আবার বুনন করে তৈরি হয়। আর কোনো কোনো বাসা তো স্রেফ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তৈরি করা হয়!



টুনটুনি বা দর্জি পাখি (Tailor bird) সেলাই করে তার বাসা তৈরি করে। এটি গাছের দুটি ঝোলানো পাতায় ছিদ্র করে এবং সেই ছিদ্রগুলোর ভেতর দিয়ে গাছের আঁশ বা তন্তু ঢুকিয়ে পাতা দুটিকে জুড়ে দেয়। বাসাটি তার চারপাশের পাতার সাথে এতটাই মিশে থাকে যে, আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারি না!



আর বাবুই বা তাঁতি পাখি (Weaver bird) কীভাবে তার বাসা তৈরি করে? এটি গাছের ডালের আগায় একটি শক্ত গিঁট বাঁধে। এরপর এটি গাছের আঁশ দিয়ে বুনে বুনে একটি বিশাল গোলাকার কাঠামো তৈরি করে। তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বাসাটি দেখতে ঠিক একটি উল্টানো কলসির মতো লাগে। এর লম্বা সরু মুখটি নিচের দিকে শূন্যে ঝুলে থাকে, যাতে কোনো শিকারি প্রাণী বাসার ভেতরে ঢুকতে না পারে।

কাঠঠোকরা (Woodpecker) এবং ধনেশ (Hornbill)-এর মতো কিছু পাখি গাছের কোটর বা গর্তকে তাদের বাসা হিসেবে ব্যবহার করে। ওহ, ধনেশ পাখি! আপনি কি কখনো ধনেশ দেখেছেন? এর মাথার ওপর একটি বড় কমলা রঙের ঝুঁটি বা টুপি থাকে এবং ঠোঁটটিও হয় লম্বা ও কমলা রঙের। যখন এটি ওড়ে, তখন এর ডানার ঝাপটানোর বেশ জোরে শব্দ হয়। এটি একটি সাহসী পাখি—আর সেই সাথে নিজের বাহাদুরি দেখাতেও খুব পছন্দ করে!

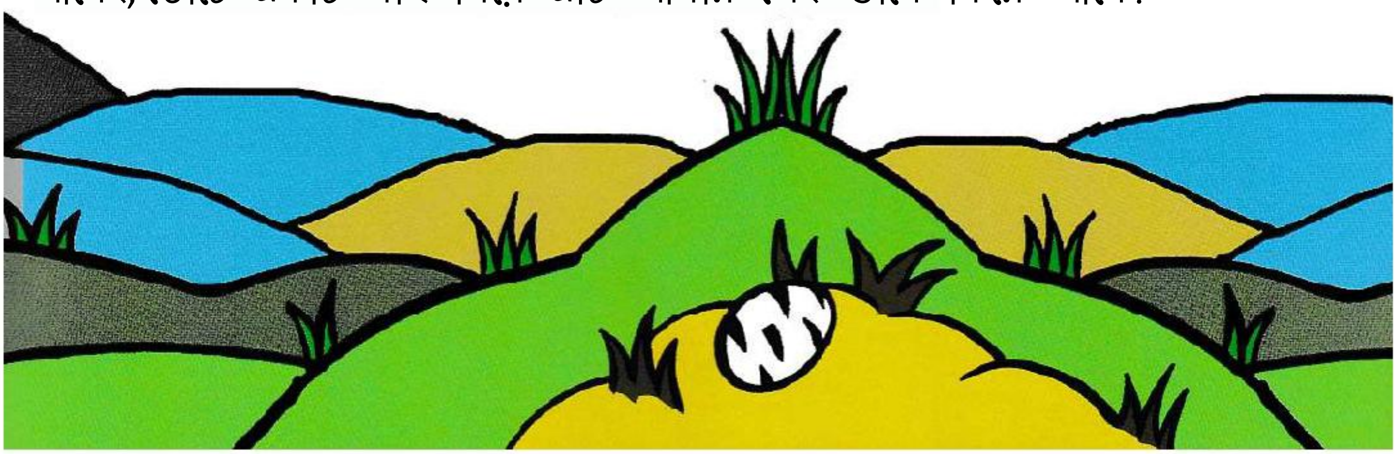


যখন মা ধনেশ ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে গাছের কোটরের ভেতরে প্রবেশ করে। বাবা পাখিটি বাসার প্রবেশপথটি দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়; তবে বাতাস চলাচল এবং খাবার দেওয়ার সুবিধার্থে সেখানে একটি ছোট ছিদ্র খোলা রাখে। ছানারা বড় না হওয়া পর্যন্ত মা পাখিটি বাসার ভেতরেই অবস্থান করে। যখন সে বাবার সাথে খাবার আনার কাজে সাহায্য করার জন্য দেয়াল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন ছানারা নিজেরাই বাসার ভেতরের আবর্জনা ব্যবহার করে সেই দেয়ালটি পুনরায় তৈরি করে ফেলে।

কী অদ্ভুত ব্যাপার, তারা যেন সহজাতভাবেই জানে যে তাদের ঠিক কী করতে হবে! সব পাখি কি নিজেরাই বাসা তৈরি করে? না, তারা তা করে না! কোকিলের (Cuckoo)মতো কিছু পাখি অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। এমনকি কিছু পাখি তো মাটিতেই ডিম পাড়ে!



পাখিদের মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর একটি পাখি হলো মাছরাঙা (Kingfisher); এরা মাটিতে বাসা বাঁধে। আপনি কি কখনো মাছরাঙাকে মাছ ধরতে দেখেছেন? এটি গাছের নিচু কোনো ডালে বসে থাকে এবং জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎই এটি জলে ঝাঁপ দেয়—আর আপনি ‘এক, দুই, তিন’ গুনে শেষ করার আগেই, ঠোঁটে একটি মাছ নিয়ে এটি আবার সেই ডালে ফিরে আসে!

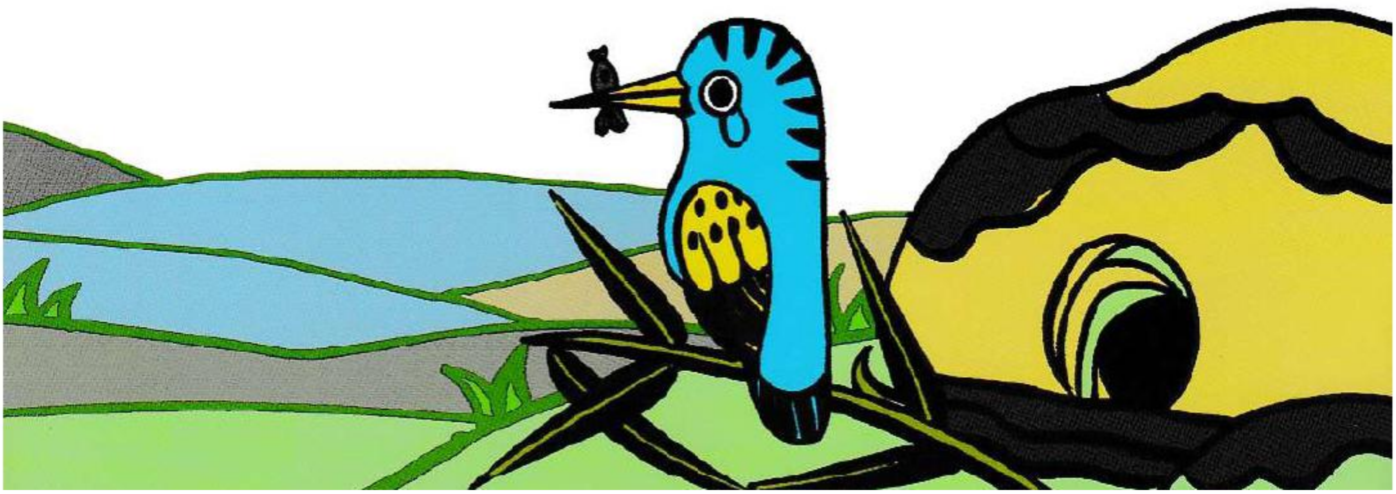




বাসা বাঁধার সময় মাছরাঙারা কোনো হ্রদ বা পুকুরের পাড়ে বালির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নেয়। ডিম পাড়ার পর, বাবা মাছরাঙা মা-পাখিকে ডিমগুলো তা দিতে বা উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ডিম ফুটে ছানা বের হওয়ার পর, বাবা ও মা—উভয় পাখিই পালা করে ছানাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। বাবা-মা পাখি দুটি এভাবেই টানা চার মাস ধরে পরিশ্রম করে যায়!

পৃথিবীতে অসংখ্য চমৎকার ও আকর্ষণীয় পাখি রয়েছে। আমরা যদি একদম চুপচাপ স্থির হয়ে বসে তাদের পর্যবেক্ষণ করি, তবে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারব।

আপনার বাড়ির আশেপাশে কোন কোন পাখি বাস করে?



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?



এই ফলটি আসে নানা জাত ও রূপে—
সবুজ, হলুদ কিংবা লাল; গোলগাল বা সরু।
খোসা ছাড়ালেই মেলে এক চটজলদি নাস্তা—
যা মিষ্টি স্বাদের আর ভিটামিনে ভরপুর।

যেন সবুজ মার্বেল, কাঁচের সুন্দর গুলি—
লতানো গাছে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে!

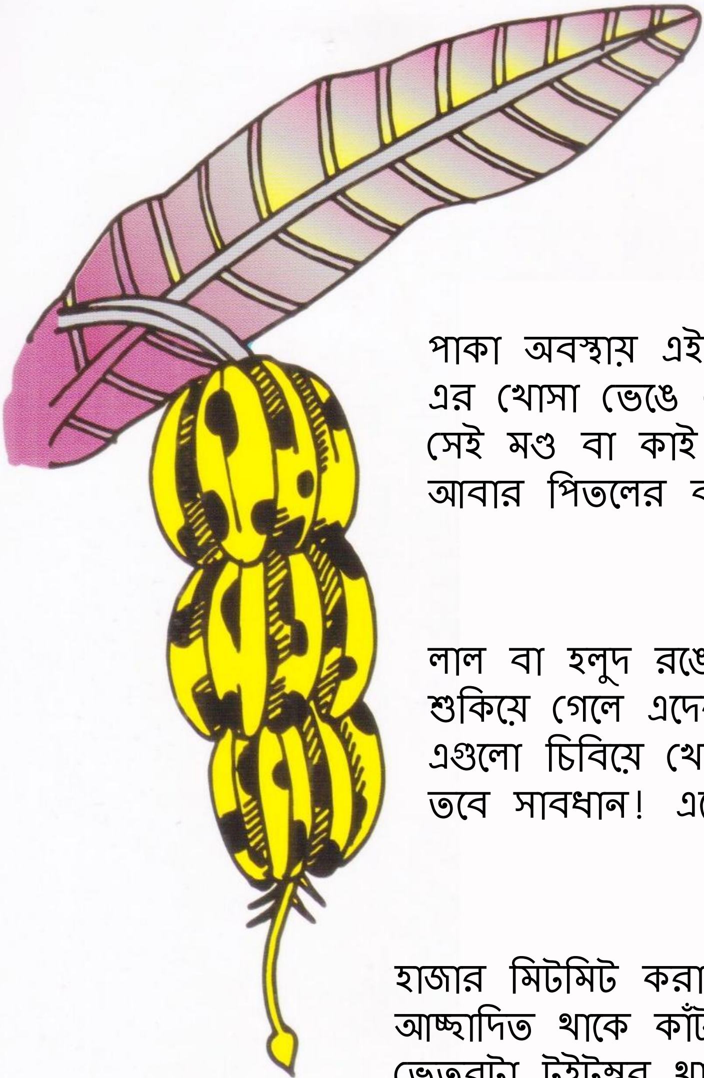
এটি তোমার জিভকে করে দেবে বেগুনি—
আর দাঁতগুলোকে রাঙিয়ে দেবে নীল রঙে!
গাছে থাকা অবস্থায় এটি গাঢ় ও চকচকে দেখায়—
আর শরীরকে জোগায় অজস্র স্বাস্থ্যগুণ।



শক্ত খোসায় মোড়া একটি গোলক—
যার ভেতর ভরা থাকে রসালো প্রকোষ্ঠ।
সেই প্রকোষ্ঠগুলো খাও একে একে—
অথবা ফলটিকে কাটো মাঝখান দিয়ে—
তারপর নিংড়ে বের করে নাও পুষ্টিকর রস।

শিশুরা গাছ থেকে পেড়ে নেয় এই ফল—
তোতাপাখিরা ঠোঁট দিয়ে খুঁড়ে খায় এর ভেতরটা।
এর ভেতর থাকে অসংখ্য ছোট ছোট কুড়মুড়ে বীজ—
সবুজ বা হলুদ রঙের এই ফলের সুবাস বড়ই লোভনীয়।

এর মসৃণ সবুজ খোসায় আঁকা থাকে সুন্দর নকশা—
কাটলেই এটি খুলে যায় ‘কট’ শব্দ করে।
ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে লাল রঙের গোল মুখ—যাতে
থাকে অসংখ্য কালো ছোপ।
এর এক টুকরো খেলেই মনটা হয়ে ওঠে সতেজ।

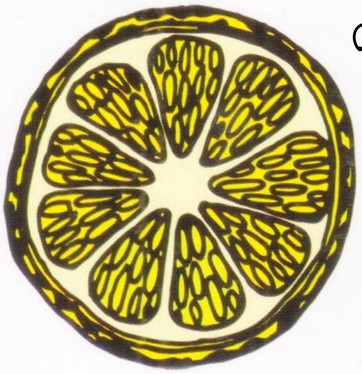


সুঠাম গড়নের একটি গোলাকার ফল—
যা মেলে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙে।
ভেতরটা ধবধবে সাদা আর বেশ মচমচে—
কাশ্মীর আর সিমলার মাটিতে এর জন্ম।

পাকা অবস্থায় এই ফলটি হয় টক-মিষ্টি—
এর খোসা ভেঙে ভেতরটা নিতে হয় চটকে।
সেই মণ্ড বা কাই ব্যবহার করা হয় রান্নায়—
আবার পিতলের বাসনপত্র ঝকঝকে করতেও এটি কাজে লাগে।

লাল বা হলুদ রঙের ফলের থোকা—
শুকিয়ে গেলে এদের খোসা হয়ে যায় কুঁচকানো।
এগুলো চিবিয়ে খেতে বেশ সুস্বাদু ও মিষ্টি—
তবে সাবধান! এদের ভেতর লুকিয়ে থাকে শক্ত পাথরের মতো আঁটি!

হাজার মিটমিট করা চোখের ওপর এটি পরে থাকে এক মুকুট—
আচ্ছাদিত থাকে কাঁটাভরা বর্মের আড়ালে।
ভেতরটা টইটম্বুর থাকে আঠালো রসে—
আর মোড়ানো থাকে আঁশযুক্ত আবরণে—
যেন স্বর্গীয় হালুয়ার হাজারো ছোট ছোট গ্রাস!



সবুজ রঙের, কাঁথা-সেলাইয়ের মতো নকশাকাটা এক জ্যাকেটে মোড়া—
যার ভেতর লুকিয়ে থাকে কালো রঙের ডিম্বাকৃতির দানা।
এটি এক অতি সুস্বাদু, মাখনের মতো মোলায়েম ও মিষ্টি ফল।



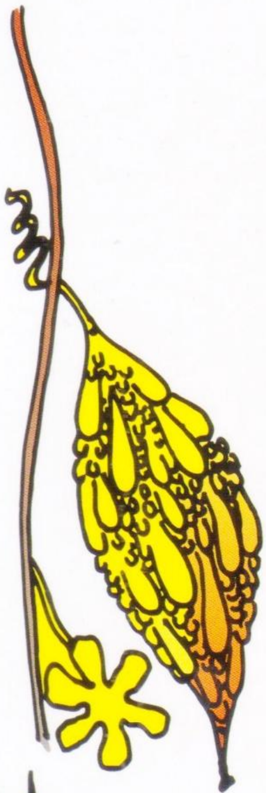
আমার লাল রঙের রত্নভাণ্ডারের ভেতর—
রয়েছে ছোট ছোট হলুদ প্রকোষ্ঠ।
আর সেই প্রকোষ্ঠগুলোর ভেতরেই সযত্নে রাখা আছে—
মূল্যবান লাল রঙের রত্নদানা।

আঙুর, কমলালেবু, আতাফল, জাম, খেজুর, তরমুজ,
পেয়ারা, আপেল, কাঁঠাল, তেঁতুল, আনারস, কলা, ডালিম।



সবুজ ও লম্বা, তোমার আঙুলের মতন
কাটলে মনে হয় যেন পঞ্চভুজ রত্ন
আর সুস্বাদু রাতের খাবার রাঁধতে এর জুড়ি নেই

এর রঙ কমলা
আকৃতিতে এটি মোচাকৃতির
মাটির নিচেই এর জন্ম
আর আমাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য এটি খুবই উপকারী



আমি গোল আর সবুজ
আমার শরীরটা ঠাসা থাকে পাতায়
কুচি করে নাও আর ভাপিয়ে নাও
অথবা মচমচে সালাদে কাঁচাই খেয়ে নাও

কাঁটাভরা ডালপালা আর
পাখার মতো কাঁটাযুক্ত পাতা নিয়ে
সাদা, সবুজ কিংবা বেগুনি রঙের এই ডিম্বাকৃতির ফলটি
নিজের মাথায় যেন মুকুট পরে থাকে



যদি তুমি আমাকে কাটো
তবে আমি তোমাকে কাঁদিয়ে ছাড়ব

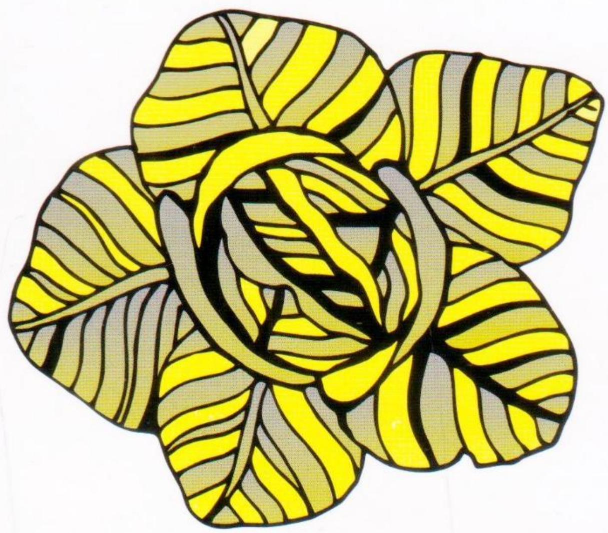


এই যে এখানে সবুজ গাছের সারি
কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ভালো করে ধুয়ে নাও
তৈরি করো এক সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পদ
আর অপেক্ষা করো—কবে পাতাগুলো আবার গজিয়ে উঠবে

তারার মতো সুন্দর সাদা ফুলের মাঝে
আর পেঁচানো নরম লতানো ডগার ফাঁকে
লম্বা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে থাকা ফলগুলো
ঝুলে থাকে মাচার ওপর থেকে!

আমার পাতাগুলো হাতির কানের মতো
আমার মাটির নিচের কন্দগুলো যেন এক-একটা কলসি
মাটির নিচেই তারা লুকিয়ে থাকে
আর তাদের রঙও ঠিক মাটিরই মতো

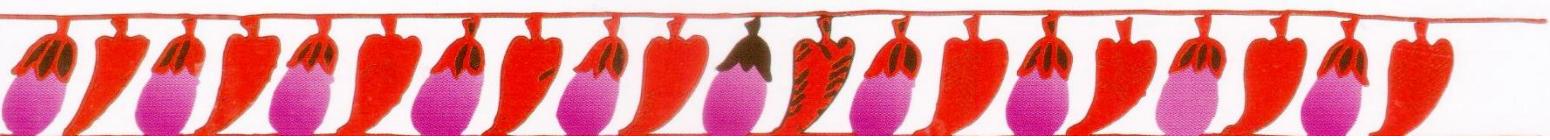
এক লম্বাটে প্রকোষ্ঠের ভেতর
সবুজ মটরদানার এক বিশাল বাহিনী



আমি সবুজ আর ভীষণ তেঁতো
তবে আমি কোনো ওষুধ নই
ছোটরা আমাকে দেখলেই দৌড়ে পালায়
কিন্তু খাবার হিসেবে আমি একদম পরিপূর্ণ

হলুদ ফুলের এক লতানো গাছে আমি বেড়ে উঠি
পাকলে আমি হয়ে উঠি তরমুজের সমান বড়
তবে আমার রঙটা হালকা, ধূসর-সবুজাভ
স্বাদে আমি একদমই পানসে, তবে পেটের জন্য খুবই উপকারী

পালংশাক, চিচিঙ্গা, বেগুন, চালকুমড়া, ঢেঁড়স,
বাঁধাকপি, ওলকচু, গাজর, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, করলা



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

73

যে বক্তা কথা বলতে চাইলেন না

মোল্লা নাসিরুদ্দিন ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি একজন দক্ষ বক্তাও ছিলেন। তিনি সবসময় মানুষকে হাসাতে পারতেন এবং ভাবাতেও পারতেন।

একবার তাঁর প্রতিবেশীরা মোল্লাকে একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। তিনি সেখানে যেতে চাইছিলেন না। মানুষের সাথে মেলামেশা করতে তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। শেষমেশ তিনি সভায় যেতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় খুঁজতে লাগলেন।





সেই দিনটি এল। মোল্লা সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা সবাই জানেন?"

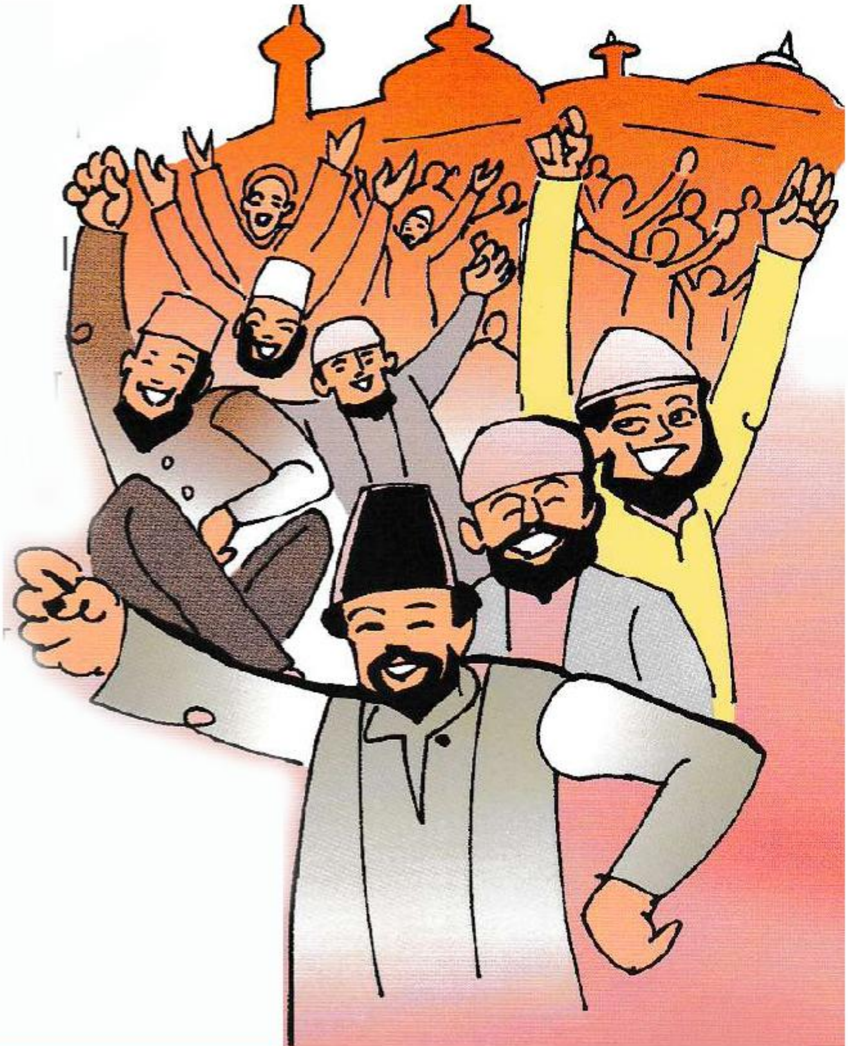
"জানি না... জানি না," সমস্বরে উত্তর এল। এতে মোল্লা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "যারা কিছুই জানে না, তাদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত নই!" এই বলে তিনি বাড়ির পথে রওনা দিলেন।

শ্রোতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মোল্লা নাসিরুদ্দিনের পিছু নিলেন। তাঁরা মিনতি করে বললেন, "আমাদের ক্ষমা করুন!" এরপর তাঁরা তাঁকে পরবর্তী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি যেতে রাজি হলেন।



মানুষজন মোল্লাকে আর চটাতে চাইছিলেন না। তাই তাঁরা একটি ফন্দি আঁটলেন।

পরবর্তী সভা শুরু হলো। আবার মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা জানেন?" কিন্তু এবার সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "জানি! আমরা জানি!"



মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "যে বিষয়টি আপনারা আগে থেকেই জানেন, সে সম্পর্কে আমি কেন আর কথা বলতে যাব?" এই বলে তিনি বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

কী দারুণ হতাশা! সভায় উপস্থিত লোকজন আলোচনা করতে লাগলেন—এখন কী করা যায়। তাঁরা একে অপরকে বললেন, "আমরা আমাদের মোল্লার স্বভাব বুঝে গেছি!" আর তাঁরা নতুন আরেকটি পরিকল্পনা করলেন।

পরবর্তী সভা শুরু হলো। মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা জানেন?" উপস্থিত লোকজনের অর্ধেক বললেন, "আমরা জানি! আমরা জানি!" আর বাকি অর্ধেক বললেন, "আমরা জানি না! আমরা জানি না!"

মোল্লা নাসিরুদ্দিন বললেন, "বেশ তবে!" "যারা জানেন, তাঁরাই বরং যারা জানেন না—তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন!" এই বলে তিনি সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উপস্থিত জনতা একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল!



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

ইউকিও ও তিমি

ইউকিও ছিল এক জেলের ছেলে। সে তার মা-বাবার সাথে সমুদ্রের তীরে বাস করত। যখন সে ঘরের কাজ বা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত না, তখন সমুদ্রতীরের কাছে থাকা পাথুরে জলাশয়গুলো ঘুরে দেখতে সে খুব ভালোবাসত। সেখানে সে তারামাছ, কাঁকড়া এবং মাঝে মাঝে সামুদ্রিক স্পঞ্জও খুঁজে পেত।

!

একদিন একটি অদ্ভুত শব্দ শুনে ইউকিও এই সব বিস্ময়কর দৃশ্য থেকে অন্য দিকে আকৃষ্ট হলো। শব্দটা কিসের? সে দেখতে গেল। ওই তো! পাথরের মাঝে আটকে পড়া এক বিশাল তিমি বালির ওপর তার লেজ আছড়াচ্ছে। তিমিটি আটকে পড়েছে



"আহা, বেচারা তিমি!" ইউকিও সবিস্ময়ে বলে উঠল। "জল ছাড়া তো তুমি বাঁচতে পারবে না!" সে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি!"

ইউকিও একটি বালতি হাতে নিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল। সে বালতিটি জলে পূর্ণ করে তিমির কাছে ফিরে এল। সে খুব যত্ন করে তিমির মাথার ওপর জল ঢেলে দিল। সে আবার বালতি ভরে তিমির পিঠের ওপর জল ঢেলে দিল। আবার সে বালতিটি ভরে তিমির লেজের ওপর জল ঢালল।

ইউকিও তিমিটিকে বলল, "তুমি বিশাল বড়, তাতে কী? আমি তোমার জন্য এক হাজার বালতি জল বয়ে আনব!"

সে আবার সমুদ্রের দিকে দৌড়ে গেল। সে বালতি পূর্ণ করল এবং আবার দৌড়ে ফিরে এল। "লেজের জন্য তিন বালতি! পিঠের জন্য চার বালতি! মাথার জন্য পাঁচ বালতি!" অনবরত গুনতে গুনতে ইউকিও জল ঢালতে লাগল। তবুও, তিমির শরীরের কিছু অংশ শুকিয়ে যাচ্ছিল। ইউকিও দৌড়াতে লাগল আর জল ঢালতে লাগল।

হঠাৎ তার শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। সে বালির ওপর ধপাস করে পড়ে গেল! সে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে নড়ারও শক্তি ছিল না!



কিন্তু তার মনের ভেতর সেই কথাগুলোই ঘুরপাক খেতে লাগল—"...এক হাজার বালতি জল... এক হাজার বালতি জল..." সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল এবং আবার সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল। সে আর থামল না, যতক্ষণ না...

"আর দরকার নেই!" ইউকিও চারদিকে তাকাল। ওই তো তার দাদু দাঁড়িয়ে আছেন! আর সাথে গ্রামের আরও অনেক মানুষ!

"তুমি খুব পরিশ্রম করেছ," তার দাদু তাকে বললেন। "এবার বিশ্রাম নাও!" তিনি ইউকিওকে একটি বিশাল পাথরের ছায়ায় নিয়ে গেলেন।



গ্রামের সবাই হাতে পাত্র আর তোয়ালে নিয়ে সেখানে এসেছিল। তারা তাদের পাত্রগুলো জলে পূর্ণ করল এবং তিমির ওপর সেই জল ঢেলে দিল। তারা তোয়ালেগুলো ভিজিয়ে তিমির পিঠের ওপর বিছিয়ে দিল। অবশেষে তিমিটির সারা শরীর ভিজে গেল। কিন্তু গ্রামবাসীরা থামল না। জোয়ার আসা পর্যন্ত তারা অবিরাম কাজ করে চলল।

এখন ঢেউগুলো তিমির লেজ ধুয়ে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার শরীর বালুচর থেকে ওপরে উঠে এল। অবশেষে, এক বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ল। সেটি তিমিটিকে পাথরের ওপর দিয়ে তুলে নিয়ে সাগরের গভীরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মানুষজন উল্লাস করে উঠল। তারা তিমিটিকে সাঁতরে দূরে চলে যেতে দেখল। তারপর তারা নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, হাসতে ও গল্প করতে করতে বাড়ির পথে রওনা হলো। আর ইউকিও? সে তখন তার দাদুর কোলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

একটি জাপানি গল্প—"আ থাউজেন্ড পেইলস অফ ওয়াটার"

(A Thousand Pails of Water)—থেকে অবলম্বিত।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

এক দানা চাল

একদা এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। তার মাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও ফলনশীল। রাজ্যের হ্রদ ও নদীগুলো স্বচ্ছ জলে কানায় কানায় ভরে থাকত। প্রতি বছর রাজ্যের প্রজারা প্রচুর পরিমাণে ধানের ফসল ফলাত।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, অতিরিক্ত যে ধান বা চাল উৎপাদিত হতো, তা রাজার গুদামঘরে জমা রাখা হতো। দীর্ঘকালের সমৃদ্ধির ফলে গুদামঘরে সঞ্চিত চালের পরিমাণ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুদামঘরগুলো তখন পূর্ণ ছিল।

কিন্তু এক বছর বর্ষা এল না। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেমে এল। রাজার মন্ত্রীরা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, এখন সময় এসেছে গুদামঘরের দরজা খুলে দিয়ে সঞ্চিত চাল প্রজাদের মাঝে বিতরণ করার।"

কিন্তু রাজা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন! তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি যদি সব চাল বিলিয়ে দিই, তবে আমার অতিথিদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করব?" ফলে প্রজাদের অনাহারেই দিন কাটাতে হলো।



একদিন রাজার সাথে দেখা করতে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি এলেন। তাঁদের সম্মানে এক বিশাল ভোজের আয়োজন করা হলো। হাতিদের পিঠে চাপিয়ে ঝুড়ি ভর্তি চাল রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

রানি নামের এক বালিকা হাতিদের সেই শোভাযাত্রাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, একটি ঝুড়ি থেকে চাল গড়িয়ে নিচে মাটিতে পড়ছে। ঝুড়িটির এক জায়গায় একটি ছিদ্র ছিল! রানি দৌড়ে গিয়ে নিজের আঁচলে সেই ঝরে পড়া চালের দানাগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগল। সে হাতিদের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল এবং ঝরে পড়া প্রতিটি দানা যত্ন করে কুড়িয়ে নিল।

শোভাযাত্রাটি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছাল। সেখানে প্রহরীরা রানিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, "এত চাল তুমি কোথায় পেলে? এগুলো দিয়ে তুমি কী করবে?"

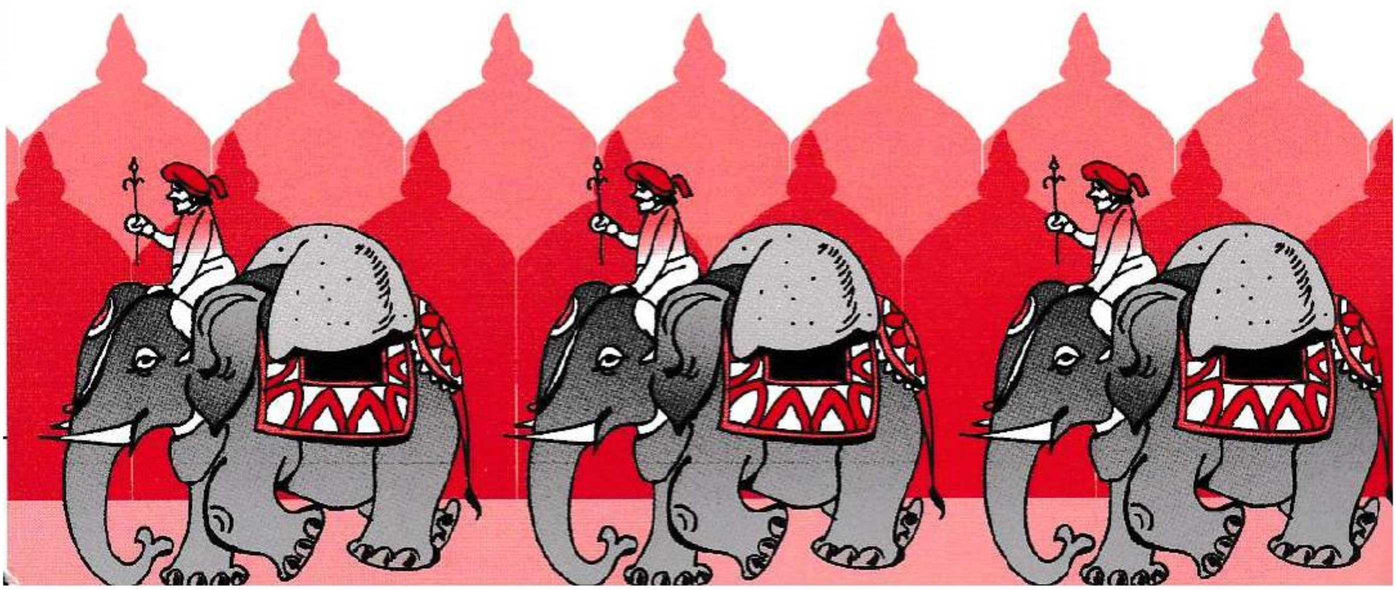
রানি তাদের উত্তর দিল, "একটি ঝুড়ি থেকে চালগুলো গড়িয়ে নিচে পড়ছিল। আমি এগুলো মহারাজকে উপহার দিতে নিয়ে যাচ্ছি।"

রাজাকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন, "ওই বালিকাটি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান। তাকে অবিলম্বে আমার সামনে নিয়ে এসো!" প্রহরীরা রাজার আদেশ পালন করল।

রাজা রানিকে বললেন, "খুকি, তুমি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছ। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব!"

রানি বলল, "আমি কোনো পুরস্কারের আশায় আসিনি। তবে আপনি যদি একান্তই আমাকে কিছু দিতে চান, তবে দয়া করে আমাকে মাত্র 'এক দানা চাল' উপহার দিন। আমার আর কিছুই চাই না!"

রাজা তার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, "কিন্তু আমি তো স্বয়ং মহারাজ! আমি যখন পুরস্কার দেব, তখন তা অবশ্যই বড়সড় কিছু হতে হবে। মাত্র 'এক দানা চাল' তো কোনো পুরস্কারই নয়!"



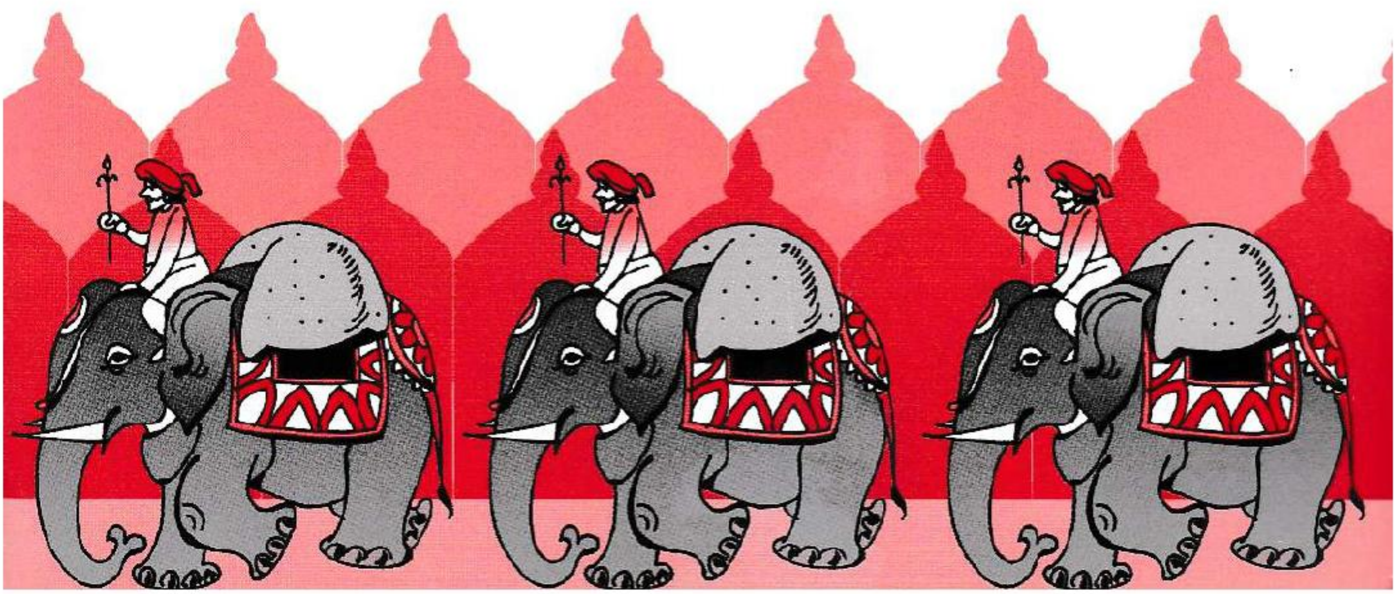
রানি বলল, "তাহলে কি আপনি আমাকে ত্রিশ দিনের জন্য চাল দেবেন? আজ আমাকে এক দানা চাল দিন। কাল আপনি আমাকে দুই দানা দিতে পারেন। আর তার পরের দিন চার দানা। প্রতিদিন আপনি আমাকে আগের দিনের সংখ্যার দ্বিগুণ করে দিতে পারেন।"

"তুমি কি শুধু এটুকুই চাও? তুমি কি নিশ্চিত?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন। রানি তার দাবিতে অটল রইল। "এত সামান্য একটি পুরস্কার দেওয়ার সামর্থ্য নিশ্চয়ই আমার আছে," রাজা মনে মনে ভাবলেন। "আমি তোমার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করি!" তিনি রানিকে বললেন।

সেদিন রানি তার সেই এক দানা চাল নিয়ে বাড়ি ফিরল। পরের দিন তার বাড়িতে দুই দানা চাল পৌঁছে দেওয়া হলো। তার পরের দিন এল চার দানা। দশম দিনে নিয়ে আসা হলো ৫১২ দানা চাল। সেটা ছিল মোটামুটি এক মুঠো চালের সমান।

ষোড়শ দিনে রানি পেল দুই ঝুড়ি চাল। তাতে ছিল ৩২,৭৬৮ দানা। সেদিন রাজা মনে মনে ভাবলেন, "আমাকে যে এত বেশি চাল দিতে হবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি!" চব্বিশতম দিনে রানি পেল আট ঝুড়ি চাল, যাতে ছিল ৮,৩৮৮,৬০৮ দানা।

সাতাশতম দিনে সে পেল চৌষট্টি ঝুড়ি চাল। এই চাল বত্রিশটি হাতির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাতে ছিল ৬৭,১০৮,৮৬৪ দানা।



"চালের পরিমাণ এত দ্রুত কীভাবে বেড়ে গেল?" রাজা চিন্তিত হয়ে ভাবলেন। তিনি আর কত চাল দিতে পারবেন? কিন্তু তিনি তো কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কি একটি ছোট মেয়ের চেয়েও কম মর্যাদাবোধের পরিচয় দেবেন?



ত্রিশতম দিনটি এল। দুইশো ছাপ্পান্নটি হাতি ৫৩৬,৮৭০,৯১২ দানা চাল বয়ে নিয়ে রানির বাড়িতে পৌঁছাল।

এখন রাজার শস্যভাণ্ডার একেবারে শূন্য! তিনি রানিকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এত চাল দিয়ে তুমি কী করবে?"

রানি উত্তর দিল, "এই চাল ক্ষুধার্ত মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হবে—এমনকি আপনাকেও দেওয়া হবে, মহারাজ! তবে এখন থেকে দয়া করে আপনি কেবল ততটুকু চালই নিজের কাছে রাখবেন, যতটুকু আপনার প্রয়োজন। আপনি কি আমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দেবেন?"

রাজার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল! "হ্যাঁ। তুমি যা বলবে, আমি ঠিক তাই করব," তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সব মিলিয়ে রানি মোট কতটুকু চাল পেয়েছিল? ১,০৭৩,৭৪১,৮২৩টি শস্যদানা!

আপনি নিজেই এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। ৩০ দিনের একটি মাসের ক্যালেন্ডারের পাতা নিন। মাসের প্রথম দিনের ঘরের মধ্যে ১টি শস্যদানা লিখুন। এরপর, দ্বিতীয় দিনের ঘরের মধ্যে ২টি শস্যদানা রাখুন। পরবর্তী ঘরের মধ্যে রাখুন ৪টি শস্যদানা। রানি প্রতিদিন ঠিক কতগুলো করে শস্যদানা পেয়েছিলেন, সেই সংখ্যাটি হিসাব করুন এবং ক্যালেন্ডারের পাতাটি পূরণ করে ফেলুন।

সবকটি ঘরের সংখ্যা যদি আপনি যোগ করেন, তবেই আপনি পেয়ে যাবেন—রাজার কাছ থেকে রানি মোট কতগুলো শস্যদানা পেয়েছিলেন।

একটি ভারতীয় লোককথা

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

76 জাদুর নুড়িপাথর



একদা এক বনে একটি ছোট্ট ভালুক তার মা ও বাবার সাথে বাস করত। ছোট্ট ভালুকটি নদীর ধারে খেলতে যেতে খুব ভালোবাসত। পথের মাঝে সে অনেক মজার মজার জিনিস দেখতে পেত—বীজ, পাখির পালক, বড় পাথর আর সুন্দর সুন্দর নুড়িপাথর।

নুড়িপাথরগুলোই ছিল ছোট্ট ভালুকটির সবচেয়ে প্রিয়। বাড়িতে তার নুড়িপাথরের বেশ বড়সড় একটি সংগ্রহই গড়ে উঠেছিল!

একদিন ছোট্ট ভালুকটি এমন একটি নুড়িপাথর খুঁজে পেল, যা সূর্যের আলোয় লালচে আভা ছড়াচ্ছিল। কী দারুণ এক রত্ন! সে পাথরটি কুড়িয়ে নিল এবং পথ চলতে লাগল। হঠাৎ মেঘে সূর্য ঢেকে গেল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। পথের মাটি কাদাটে হয়ে উঠল। "ইশ, বৃষ্টিটা যদি থেমে যেত!"—ভাবল ছোট্ট ভালুকটি। আর অমনি—চমৎকার! বৃষ্টি থেমে গেল!

"ওহ! আমি তো একটা জাদুর নুড়িপাথর খুঁজে পেয়েছি!"—উপলব্ধি করল ছোট্ট ভালুকটি। "যখনই আমি পাথরটি আমার থাবায় ধরে রাখি, আমার সব ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায়!" সে ঘুরে দাঁড়াল—দৌড়ে গিয়ে তার বাবা-মাকে জাদুর নুড়িপাথরটি দেখাবে বলে। কিন্তু বাড়ির পথে ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল সিংহ! ভয়ে ছোট্ট ভালুকটির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। তখন সে ভাবল,



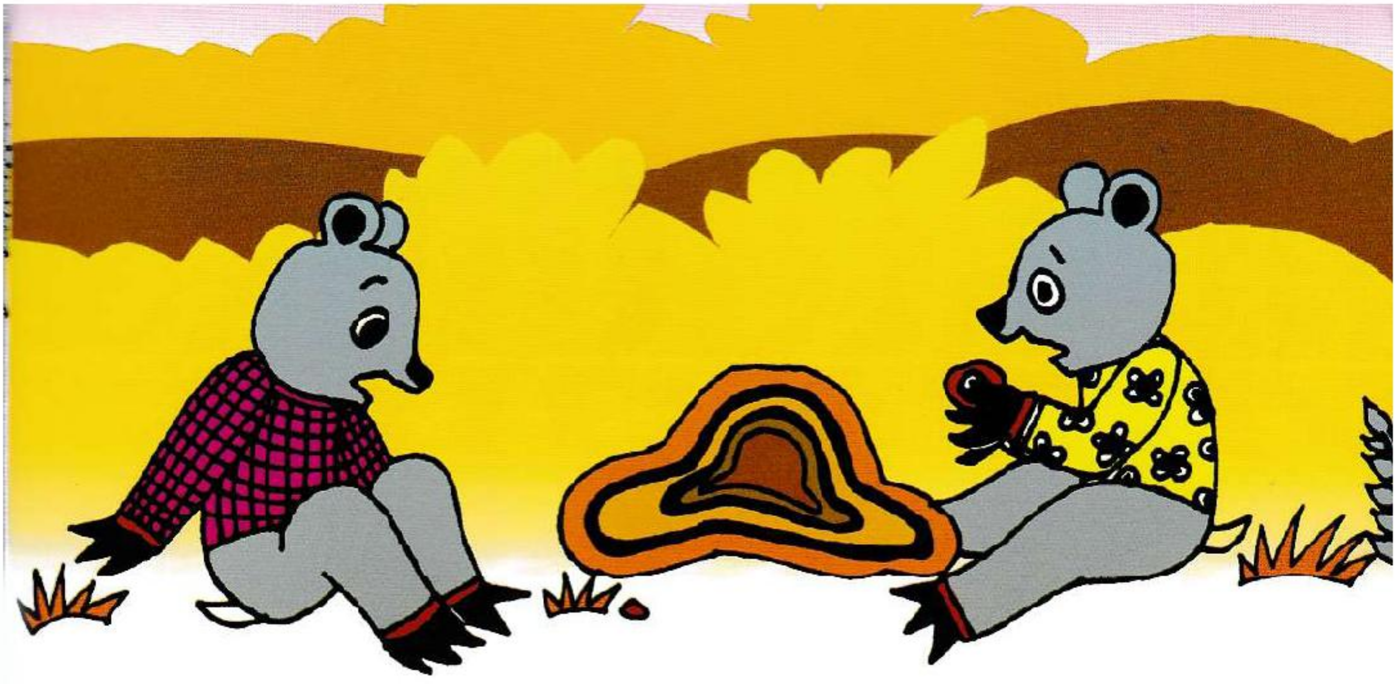
"আমি নিজেকে অন্য কোনো রূপে বদলে ফেলতে পারি! এমন কিছু, যাকে সিংহটা খেতে চাইবে না!" হুম... আহা! "ইশ, আমি যদি একটা পাথর হয়ে যেতে পারতাম!"—সে মনে মনে বলল। আর অমনি—চমৎকার! সে একটি পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ছোট্ট ভালুকটি বেঁচে গেল!

কিন্তু জাদুর নুড়িপাথরটি পথেই পড়ে গিয়েছিল। "ওহ, সর্বনাশ!"—ভাবল ছোট্ট ভালুকটি। "আমি তো এখন পাথরের রূপেই আটকা পড়ে গেলাম!"

এদিকে, ছোট্ট ভালুকটির বাবা-মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "প্রায় অন্ধকার হয়ে এল যে! আমাদের বাচ্চাটা এখনো ফিরে এল না কেন?"—বললেন মা ভালুকটি। তাঁরা দুজনে মিলে বনের এদিক-সেদিক ঘুরে অন্য পশুদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "তোমরা কি কোথাও একটা ছোট্ট ভালুককে দেখেছ?" কিন্তু কেউ-ই তাকে দেখেনি।

প্রতিদিন বাবা ও মা ভালুক বাইরে বেরিয়ে তাদের সন্তানকে খুঁজতে যেতেন। প্রতিদিন তাঁরা সবার কাছে তার খোঁজখবর নিতেন। আহা, বেচারা ভালুক দম্পতি! তাঁরা দিন দিন আরও বেশি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন। তবুও তারা তাদের খোঁজ করা থামালেন না





একদিন বিকেলে, তাঁরা নদীর পথের ধারে পড়ে থাকা একটি বিশাল পাথরের ওপর বসে পড়লেন। "একটু জিরিয়ে নিই," তাঁরা একে অপরকে বললেন—"তারপর আবার পথ চলা শুরু করব।" তাঁরা কী করে জানবেন যে, এই পাথরটিই আসলে তাদেরই অতি আদরের ছোট্ট ভালুকটি!

নিজের বাবা-মাকে দেখে ছোট্ট ভালুকটি ভীষণ—ভীষণ খুশি হয়ে উঠল! কিন্তু সে তো আর তাদের নিজের মনের কথা জানাতে পারছিল না। সে নড়াচড়া করতে পারছিল না, এমনকি মুখ ফুটে কোনো শব্দও করতে পারছিল না। এরপর ছোট্ট ভালুকটির মা পথের ধার থেকে নুড়িপাথর কুড়াতে শুরু করলেন। "আহা, আমাদের বাচ্ছাটি যদি এই নুড়িপাথরগুলো দেখতে পেত!" তিনি বললেন। "ও নিশ্চয়ই এগুলো নিজের সংগ্রহের তালিকায় যোগ করতে খুব ভালোবাসত!"

এরপর ছোট্ট ভালুকটির বাবাও এসে তাঁর সাথে যোগ দিলেন। হৃদয়ে অজস্র স্মৃতি নিয়ে তাঁরা এক ডজন সুন্দর নুড়িপাথর কুড়ালেন এবং সেগুলোকে পাথরের ওপর স্তূপ করে রাখলেন। অবশ্যই, সেই নুড়িপাথরগুলোর একটি ছিল বাচ্চা ভালুকটির সেই জাদুর নুড়িপাথর!

ছোট্ট ভালুকটির মা সবকটি নুড়িপাথর গোল করে সাজালেন—ঠিক যেভাবে তাঁর বাচ্ছাটি সাজাত। সূর্যের তীব্র আলো পাথরের ওপর এসে পড়ল; সেই তাপে পাথরটি উষ্ণ হয়ে উঠল এবং নুড়িপাথরগুলো চকমক করে উঠল।

আর ঠিক তখনই—জাদু! যেখানে পাথরটি ছিল, সেখানে এখন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর অতি আদরের বাচ্চাটি! এতক্ষণ ধরে বাচ্চা ভালুকটি মনে মনে ভাবছিল, "মা, বাবা—আমিই তো তোমাদের সেই বাচ্চা! আহা, আমি যদি আবার একটা ভালুক হতে পারতাম!" যেই মুহূর্তে তার মা সেই জাদুর নুড়িপাথরটি পাথরের ওপর রাখলেন, অমনি জাদু কাজ করে বসল!

এখন চারদিকে শুধুই আনন্দের বন্যা। বাচ্চাটির বাবা-মা তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা তাকে শূন্যে ছুড়ে ছুড়ে আদর করলেন। বাড়ি ফেরার আগে, তাঁরা তিনজন মিলে দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাধুলা করলেন।

উইলিয়াম স্টেইগ-এর লেখা 'সিলভেস্টার অ্যান্ড দ্য ম্যাজিক পেবল' অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

জেলে ও রাক্ষস

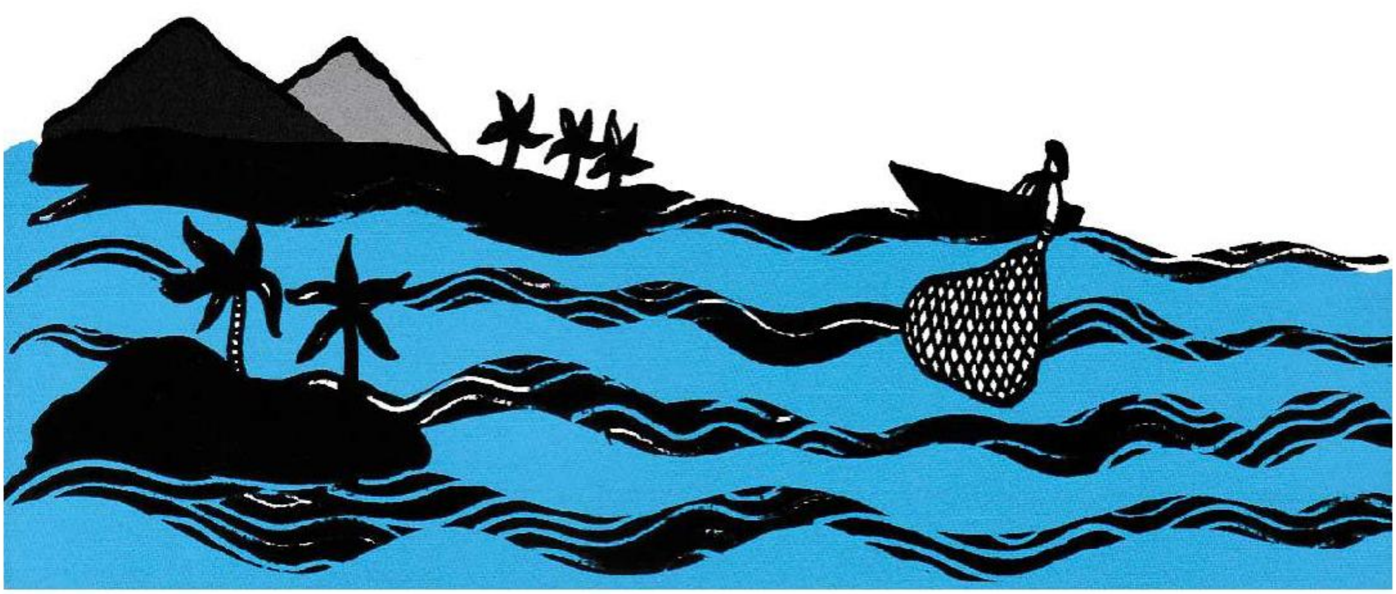
সমুদ্রের ধারে এক গ্রামে এক গরিব জেলে বাস করত। প্রতিদিন ভোরবেলা সে নৌকা বেয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যেত। সে সবসময় ঠিক ততটুকুই মাছ ধরত, যা দিয়ে তার কোনোমতে দিন গুজরান হয়ে যেত।

এই জেলে তার যৌবনকালে একটি ব্রত নিয়েছিল—সে দিনে ঠিক তিনবারই তার জাল ফেলবে। সেই ব্রত সে গত এতগুলো বছরে একবারও ভঙ্গ করেনি।

আজ তার প্রথম বারের জালে খুব ভারী কিছু একটা উঠে এল। অসীম কষ্টে সে সেটা টেনে নৌকায় তুলল। হায় রে! ওটা ছিল সদ্য নিহত কোনো পশুর মৃতদেহ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জালটি খুলে দিল এবং মৃতদেহটি আবার জলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বারের মতো জাল ফেলে সে আবার সেই ভারী জালটি নৌকায় তুলতে গিয়ে হিমশিম খেল। এবার জালে আটকে ছিল একটি বিশাল মাটির পাত্র।

পাত্রটির ভেতরে কি সোনা আছে? নাকি রুপোর মুদ্রা? হায়, না! ওটা ছিল পাথর, কাদা আর কাঁচের ছোট ছোট টুকরোয় পূর্ণ।



"হে ঈশ্বর!" জেলেটি আর্তনাদ করে উঠল। "আজ অন্তত একটা মাছ ধরার সুযোগ আমাকে দাও!" এই বলে সে তৃতীয়বারের মতো তার জাল ফেলল।

এবার জালে যা উঠল, তা আগের বারের চেয়েও ভারী ছিল। কী অবাক কাণ্ড! এর ভেতরে ছিল কেবল একটি ছোট পিতলের কলসি। কিন্তু জেলেটি তাতে যারপরনাই খুশি হলো। "এই সুন্দর কলসিটা বিক্রি করেই আজ রাতের খাবারের খরচ উঠে আসবে!" সে মনে মনে ভাবল।

দ্রুত সে নৌকা বেয়ে তীরে ফিরে এল। নৌকা থেকে লাফ দিয়ে সে ডাঙায় উঠল। তারপর কলসিটির মুখ খুলে সে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল।

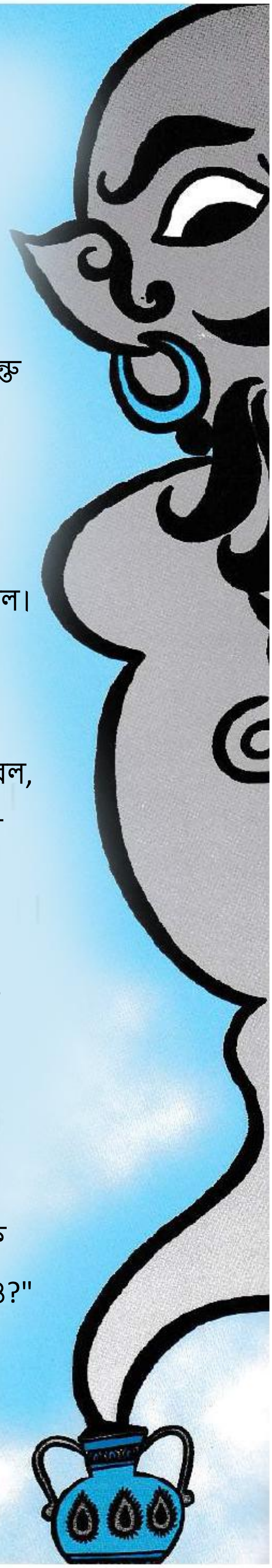
হঠাৎ কলসির মুখ দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উঠতে দেখে জেলেটি ভয়ে পিছিয়ে গেল। জমাট বেঁধে যখন ধোঁয়াটা এক রাক্ষুসে আকৃতি ধারণ করল, তখন সে ভয়ে কাঠ হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। রাক্ষসটির মাথা গিয়ে ঠেকেছিল মেঘের রাজ্যে! তার চোখগুলো হীরার মতো ঝকমক করছিল! আর তার মুখটা ছিল যেন এক বিশাল গুহা!

জেলেটির হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বেচারা! সে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

রাক্ষসটি কথা বলে উঠল। "আমি তোকে মেরে ফেলব!" সে গর্জন করে বলল।

"আমাকে?" জেলেটি আর্তনাদ করে উঠল। "কিন্তু আমিই তো তোমাকে ওই কলসি থেকে উদ্ধার করেছি!" "তুমি আমাকে কেন হত্যা করতে চাও?"

"আমি তোমাকে বলব, তবে তারপরই আমি তোমাকে হত্যা করব!" সে উত্তর দিল। "কলসির ভেতর আমার প্রথম একশ বছর," সে বলতে লাগল, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যে কেউ এই কলসিটি খুলবে, আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করব। কিন্তু কেউ এল না!





"পরবর্তী একশ বছরে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি তাকে নানারকম উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করব। আবারও, কেউ এল না।

"তখন আমি আমার শেষ প্রতিজ্ঞাটি করলাম: যে আমাকে মুক্ত করবে, আমি তাকে মৃত্যু উপহার দেব—কেবল মৃত্যুই!"

"এ কি ন্যায়বিচার?" জেলে জিজ্ঞেস করল, "একটি ভালো কাজের প্রতিদান হিসেবে শাস্তি দেওয়া?" সে দৌড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু তার পা আর তার কথা শুনল না। সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

দানবটি জেলের দিকে এগিয়ে এল। সে ধোঁয়ার মতো মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল—পিছনে পায়ের কোনো ছাপ বা কোনো চিহ্নই রেখে গেল না! মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তার শিকারের কাছে পৌঁছে যাবে।

জেলেটি মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে, সে দানবটির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল এবং বলল, "হে শক্তিমান! তুমি কী অসাধারণ! তোমার বিশাল আকৃতি অবিশ্বাস্য—তোমার মাথা যেন আকাশচুম্বী! তোমার পায়ের কড়ে আঙুলের নখটিও তো এই কলসির চেয়ে বড়!"

দানবটি গর্বে ফুলে উঠল।

"তবে একটি প্রশ্ন আমাকে খুব ভাবাচ্ছে," জেলেটি বলে চলল। "তুমি কীভাবে তোমার বিশাল শরীরটা পুরোটা এই কলসির ভেতর আটকালে—সেখানে এত দীর্ঘ সময় ধরে থাকার কথা তো বাদই দিলাম?"

মুহূর্তের মধ্যেই দানবটি বলল, "আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" সে আকারে ছোট হতে লাগল—আরও ছোট, আরও ছোট। যখন সে যথেষ্ট ছোট হয়ে গেল, তখন সে কলসির ভেতর ঢুকে পড়ল। জেলেটি কলসির ঢাকনাটি খপ করে ধরে ফেলল এবং শক্ত করে আটকে দিল।

"বাঁচাও! বাঁচাও!" দানবটি আর্তনাদ করে উঠল। "আমাকে বের হতে দাও! আমি তোমাকে একজন ধনী মানুষ বানিয়ে দেব!"

কিন্তু জেলে বলল, "আরও এক হাজার বছর ওখানেই বন্দি হয়ে থাকো!" এই বলে সে কলসিটি আবার সমুদ্রের গভীরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিজের ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরে সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ!

'এক হাজার এক আরব্য রজনী' থেকে সংগৃহীত একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

জ্ঞানই সম্পদ

একদা তিন ভাই ছিল। তারা স্কুলে খুব ভালো পড়াশোনা করত এবং বড় হয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পরেও, জ্ঞানের জন্য তাদের তৃষ্ণা বিন্দুমাত্র মিটলোনা।

তারা তাদের বাবাকে বলল, "আমরা নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে জানি। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা কীভাবে বেড়ে ওঠে, তা-ও আমাদের জানা আছে। আমরা প্রাচীন সব কাহিনি পড়েছি। এখন আমরা আরও অনেক কিছু শিখতে চাই।"

বাবা উত্তর দিলেন, "বৎসরা, বই পড়ে তোমরা যতটা শেখা সম্ভব, তার সবটাই শিখে ফেলেছ। এখন সময় হয়েছে তোমাদের পৃথিবীটা দেখার!"

তাই ভাইয়েরা তাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল। যখন তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো, বাবা অশ্রুসজল নয়নে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।



তিনি তাদের হাতে ভ্রমণের খরচ বাবদ কিছু অর্থ তুলে দিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন—সবকিছু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে এবং যা দেখবে, তা মনে রাখতে। এরপর তিনি তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন।

সেই তিন ভাই দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াল। তারা অনেক নতুন বিষয় শিখল। আর তাদের জীবনে ঘটল নানা রোমাঞ্চকর সব ঘটনা!

একবার একটি শুকনো ও ধুলোমাখা পথে তারা এক সিপাহির দেখা পেল...

১ম ভাই: শুভ সকাল, মহাশয়! আপনি কি কোনো উট খুঁজছেন?

২য় ভাই: উটটির কি বাম চোখটি অন্ধ?

৩য় ভাই: উটটির পিঠে কি কোনো নারী চড়েছিলেন?

সিপাহি: থামো! তোমরা আমার উটটিকে কোথায় দেখেছ?

১ম ভাই: মহাশয়, আমরা তো উটটিকে চোখেই দেখিনি!

সিপাহি: তাহলে তোমরা উটটি সম্পর্কে এত কিছু জানলে কীভাবে? মিথ্যুক কোথাকার! চোর সব! আমি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাব!

সিপাহি তাদের রাজার বিচারসভায় নিয়ে গেল। সে রাজাকে জানাল যে, ওই ভাইয়েরা তার উটটি সম্পর্কে কত বিস্তারিত তথ্য জানে।

রাজা: যুবকরা! তোমরা দাবি করছ যে আমাদের এই সিপাহির উটটিকে তোমরা চোখেই দেখনি। অথচ উটটি সম্পর্কে তোমরা সব তথ্যই জানো। এর একটা ব্যাখ্যা দাও!

৩ ভাই: মহারাজ! আমরা চোর নই! আমাদের বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা উটটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

রাজার সভাসদদের সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

রাজা: বিচারবুদ্ধি আর জ্ঞান, তাই না? বেশ, দেখা যাক!

তিনি তাঁর ভৃত্যদের কানে কানে কিছু নির্দেশ দিলেন। ভৃত্যরা সভা থেকে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর একটি বিশাল বাক্স কাঁধে করে ফিরে এল। তারা বাক্সটি রাজার সামনে নামিয়ে রাখল।

রাজা: এবার তোমাদের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দাও। বলো তো, এই বাক্সের ভেতরে কী আছে?

১ম ভাই: এটি বেশ হালকা ওজনের কিছু একটা।

২য় ভাই: এটি দেখতে গোলাকার। তৃতীয় ভাই: এটি একটি ডালিম!

রাজা বাক্সটি খুললেন।

রাজা: একি! তোমরা কীভাবে তা বুঝতে পারলে?



প্রথম ভাই: আপনার লোকেরা বাক্সটি খুব সহজেই বহন করে আনল, যদিও এটি বেশ বড়। তাই আমি বুঝতে পারলাম যে, এর ভেতরে নিশ্চয়ই হালকা ওজনের কিছু আছে।

দ্বিতীয় ভাই: আমি বাক্সের ভেতর কিছু একটা গড়িয়ে বেড়ানোর শব্দ শুনতে পেলাম। তাই আমি নিশ্চিত হলাম যে, বস্তুটি নিশ্চয়ই গোলাকার।

তৃতীয় ভাই: এই রাজপ্রাসাদের ঠিক বাইরেই একটি ডালিম বাগান রয়েছে। আপনার ভৃত্যরা সেখানে গিয়ে খুব দ্রুতই ফিরে এল। তাই আমি অনুমান করলাম যে, বাক্সটির ভেতরে একটি ডালিমই আছে।

রাজা: সাবাশ! এবার আমাকে সেই উটটির কথা বলো।

প্রথম ভাই: আমি পথের ওপর উটের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই আমি বুঝতে পারলাম যে, একটি উট ওই পথ দিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ভাই: পথের ডান পাশে জন্মানো ঘাস ও ঝোপঝাড়গুলো সদ্যই খাওয়া হয়েছে বলে মনে হলো। কিন্তু বাম পাশের ঘাসগুলোতে খাওয়ার কোনো নতুন চিহ্ন ছিল না। তাই আমি অনুমান করলাম যে, উটটির বাম চোখটি অন্ধ।

তৃতীয় ভাই: আমি লক্ষ্য করলাম যে, উটটি পথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল।

ঠিক তার কাছেই আমি এক নারীর স্যান্ডেলের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই আমি অনুমান করলাম যে, একজন নারীই উটটির পিঠে চড়ে আসছিলেন।

রাজসভার সকল সভাসদ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

রাজা: হে তরুণগণ, তোমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা আমার দেখা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর। তোমরা দয়া করে এখানেই থেকে যাও এবং আমার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করো!

একটি এশীয় লোককথা

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

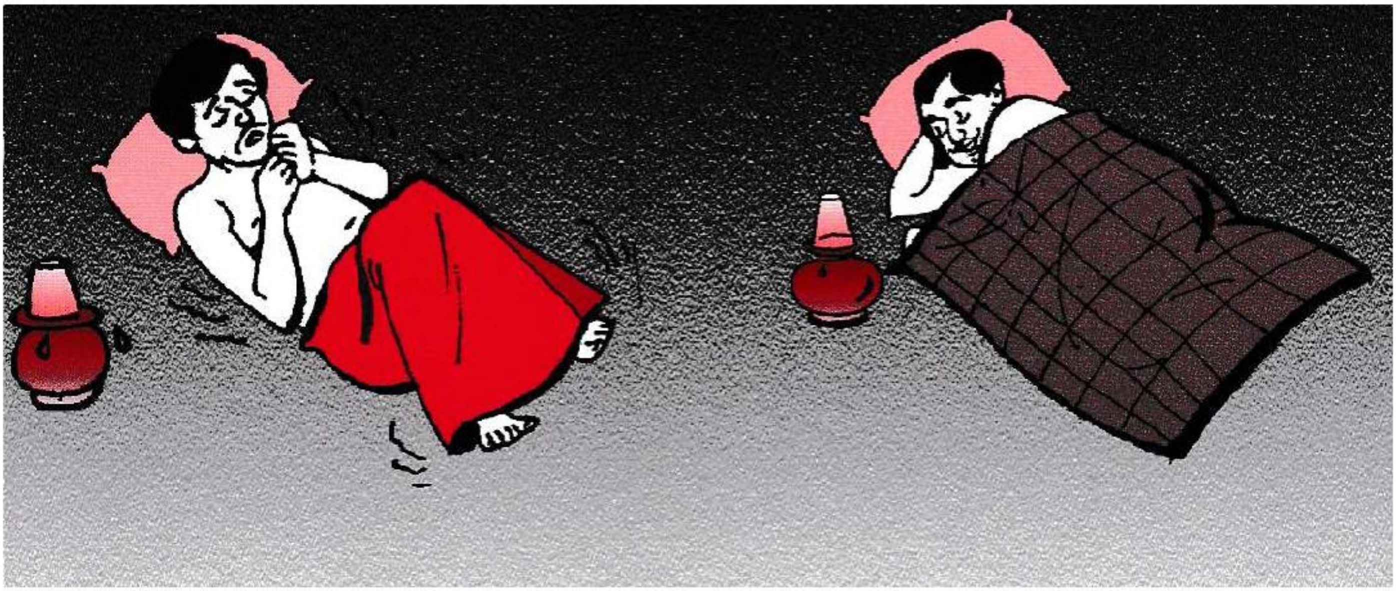
সমান ভাগ

একদা রামু ও সোমু নামে দুই ভাই ছিল। তারা প্রতিবেশী হিসেবে বেশ শান্তিতেই বসবাস করত, কিন্তু একদিন...

সোমু রামুকে বলল, "চলো, আমাদের যা কিছু আছে—গরু, আমগাছ, কম্বল—সবকিছুই আমরা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিই। কী, রাজি তো?" রামু এতে সম্মত হলো।

"বেশ!" সোমু বলল। "গরুটার সামনের দিকটা তুমি নাও, আর আমি নেব পেছনের দিকটা। আমগাছটার নিচের অংশটা তুমি রাখো, আর আমি নেব ওপরের অংশ। আর কম্বলের ব্যাপারে বলি—দিনের বেলা ওটা তুমি ব্যবহার করবে, আর রাতে আমি। রাজি?" সে তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল। রামু সরল মনে বলল, "ঠিক আছে, চলো তা-ই করি।"





সেই দিন থেকে রামু গরুকে খাওয়াত, কিন্তু সোমু গরুর দুধ দোহাত এবং সেই দুধ বিক্রি করে দিত। রামু আমগাছে জল দিত, কিন্তু আমগুলো পাড়ত সোমু।

দিনের বেলা কম্বল দিয়ে রামুর কোনো কাজই থাকত না। রাতে সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিদ্রাহীন রাত কাটাত। পাশেই সোমু কম্বল মুড়ি দিয়ে বেশ আরামদায়ক উষ্ণতায় নিশ্চিন্তে ঘুমাত।

একজন বৃদ্ধ এই পুরো ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন। তিনি রামুকে কাছে ডাকলেন এবং তার কানে কানে কী যেন ফিসফিস করে বললেন। ওহ! রামুর মুখের অভিব্যক্তি তখন কতই না বিচিত্র হয়ে উঠল! অবশেষে সে হো হো করে হেসে উঠল এবং দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

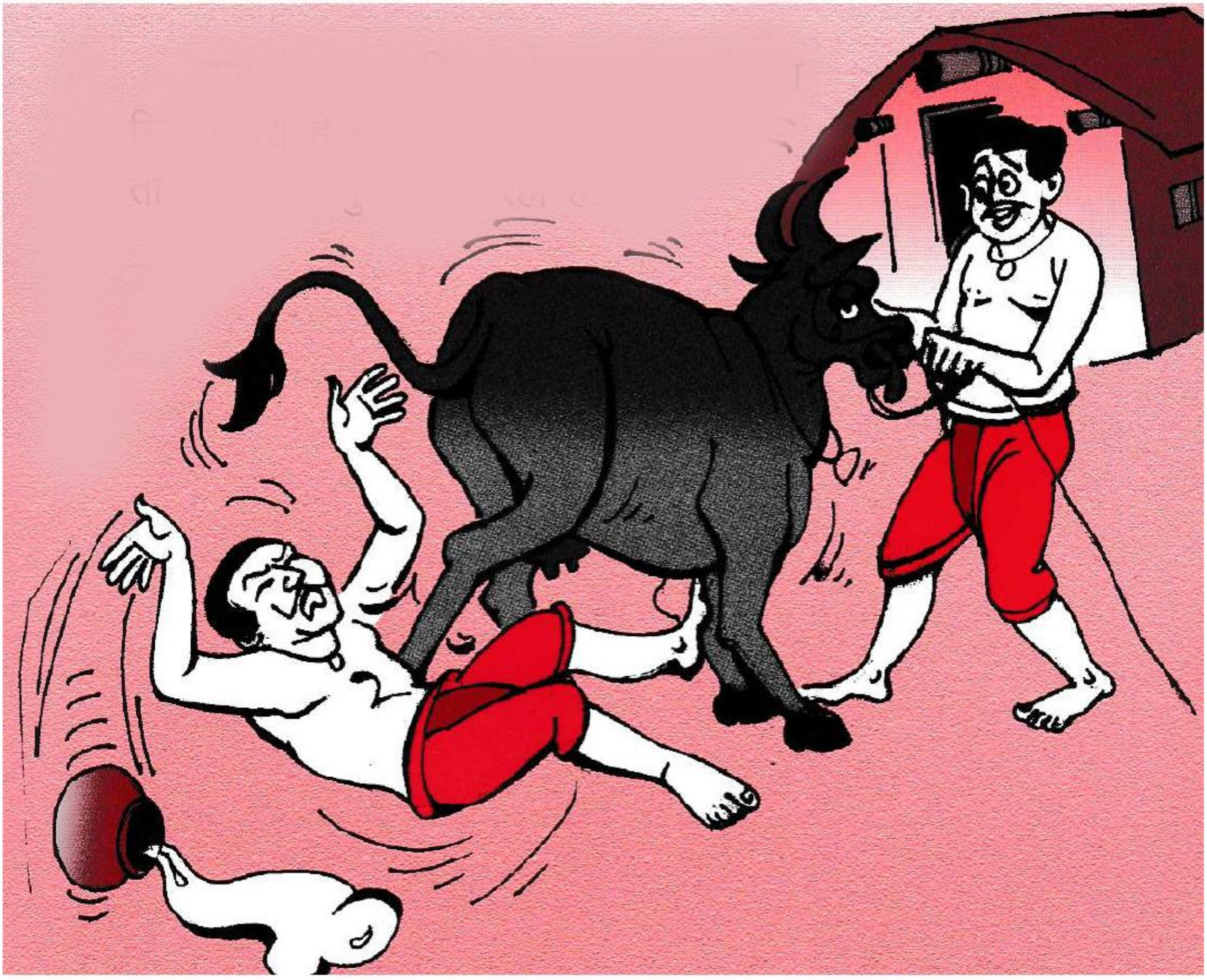
পরের দিন রামু কম্বলটির ওপর জল ঢেলে দিল। সেই রাতে কম্বলটি তখনও ভেজা ছিল। ফলে সোমু সেটি একদমই ব্যবহার করতে পারল না! সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিদ্রাহীন রাত কাটাল। সকালে সে রামুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কম্বলটার ওপর জল ঢেলে দিলে কেন?"

"দিনের বেলা কম্বলটা আমার," রামু বলল। "আমি ওটা দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি!"

সোমু যখন গরুর দুধ দোহাতে শুরু করল, তখন রামু গরুর দড়িটা সজোরে টান দিল। এতে গরুটা রেগে গেল এবং সোমুকে সজোরে লাথি মারল। দুধ সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"তোমার হলোটা কী?!" সোমু চিৎকার করে উঠল। "তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

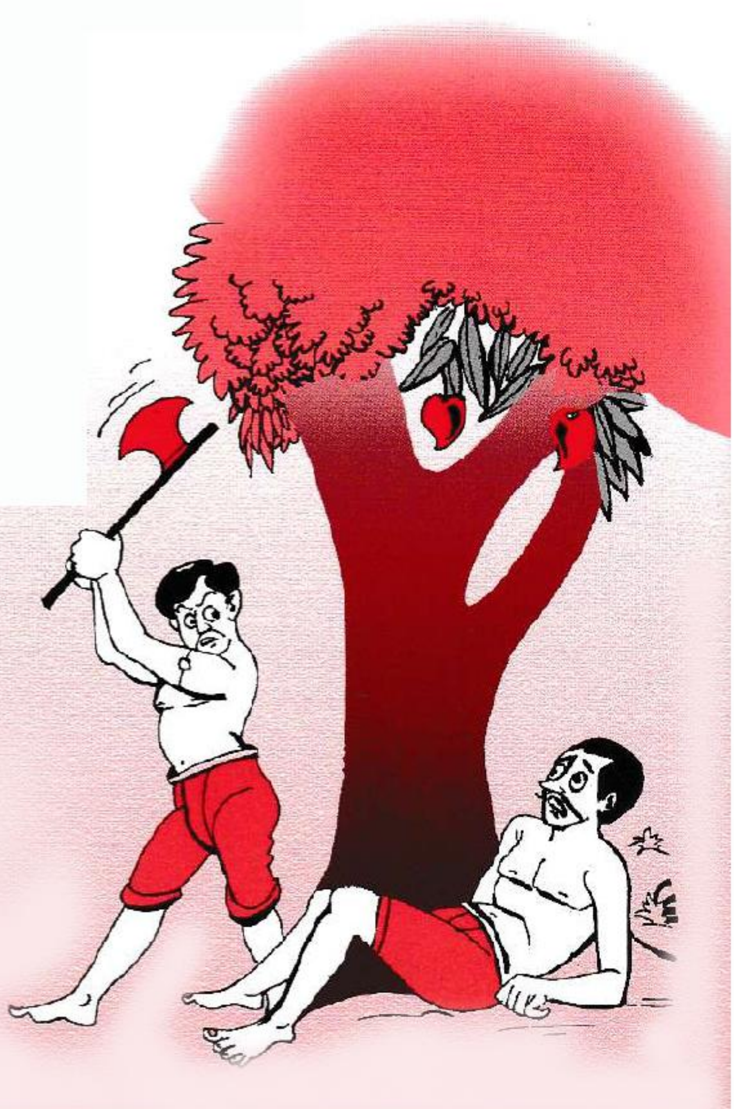
"গরুটার সামনের দিকটা তো আমার," রামু উত্তর দিল। "আমি যদি দড়িটা টানতে চাই, তাতে তোমার কী বলার আছে?"



সোমু আমগাছটির ছায়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাগে-ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক তখনই হঠাৎ করে শোনা গেল—"ঠক, ঠক!" কুড়ালের শব্দ ভেসে এল। বিস্ময়ে চোখ মেলে চাইল সোমু। গাছের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রামু। সে গাছটি কাটতে শুরু করেছিল! "এ তুমি কী করছ?" আর্তনাদ করে উঠল সোমু।

"গাছের গোড়ার অংশটুকু তো আমারই নিজস্ব সম্পত্তি," বলল রামু। "আর আমি সেটাই কাটছি!"

সোমু বুঝতে পারল যে, সে আর তার ভাইকে বোকা বানাতে পারবে না। সেই দিন থেকে তারা দুজনে গরুর দুধ আর আম ভাগ করে নিতে লাগল। সেগুলো বিক্রি করে তারা প্রাপ্ত অর্থ সমানভাগে ভাগ করে নিত। আর কম্বলের ব্যাপারে তারা পালা করে ব্যবহার করত— এক রাতে সোমু ব্যবহার করত, তো পরের রাতে রামু।



© Katha Jharna 2008
P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

৪০ কাঠবিড়ালির ডোরাকাটা দাগ

রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। একদিন তিনি রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করলেন এবং নিজের উড়ন্ত রথে করে তাঁকে নিজের রাজ্য লঙ্কায় নিয়ে গেলেন।

সীতাকে উদ্ধার করতে হলে রামকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে! তিনি তাঁর বিশাল ও দুর্ধর্ষ বানর-সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে সেই বিশাল ও দুর্লঙ্ঘ্য জলরাশির দিকে তাকিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি সমুদ্ররাজের কাছে সাহায্য চাইবেন।

"আমাদের জন্য সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটি পথ খুলে দিন!" রাম মিনতি করে বললেন। কিন্তু সমুদ্ররাজ তাঁর প্রার্থনায় কোনো কর্ণপাত করলেন না। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাম সমুদ্রের জলে তাঁর ঐন্দ্রজালিক বাণ নিক্ষেপ করলেন। ফলে সমুদ্রের সমস্ত মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে উঠল।

তখন সমুদ্ররাজ ঢেউয়ের বুক চিরে উপরে উঠে এলেন। তিনি রামকে বললেন, "প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব চিরন্তন রূপ ও নিয়ম রয়েছে। আমি কীভাবে আমার অসীম গভীরতা কমিয়ে ফেলব কিংবা আমার ঢেউয়ের চিরন্তন গতিকে থামিয়ে দেব? তার পরিবর্তে, আমি তোমার সেনাবাহিনীকে আমার রাজ্যের ওপর দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করার অনুমতি দিচ্ছি।"



তাই রাম তাঁর সৈন্যদের সেতু নির্মাণের আদেশ দিলেন। সৈন্যরা গিয়ে হাজার হাজার বিশাল বিশাল পাথর ও শিলাখণ্ড সংগ্রহ করে নিয়ে এল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেতুটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তারা অবিরাম ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলল।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝেই একটি কাঠবিড়ালি সেতুর নির্মাণস্থলে এসে উপস্থিত হলো। তার মুখে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট নুড়িপাথর। সে অত্যন্ত যত্নসহকারে সেই নুড়িপাথরগুলো বড় বড় শিলাখণ্ডগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছিল। সে বারবার এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছিল, সাধ্যমতো যতগুলো সম্ভব নুড়িপাথর সংগ্রহ করছিল এবং সেগুলোকে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছিল।



রাম যখন কাঠবিড়ালিটির এই অবিরাম কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, "ওই ছোট্ট কাঠবিড়ালিটি আসলে কী করছে?"

কিন্তু বানরদের নজরে যখন কাঠবিড়ালিটি এল, তখন তারা তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল— "এই যে, পুঁচকে! আমাদের সাথে কাজ করার জন্য তুই বড্ড বেশি ছোট আর দুর্বল। এখান থেকে দূর হ!"

কাঠবিড়ালিটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।





"আমি সেতুটি নির্মাণে সাহায্য করছি," সে বলল।

বানররা তাদের দরাজ কন্ঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল এবং কাঠবিড়ালিটিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি এর চেয়ে হাস্যকর কোনো কথা আর কখনও শুনেছ?"

কিন্তু কাঠবিড়ালিটি নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরল। "ওই বিশাল পাথরগুলো বহন করা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি কেবল ছোট ছোট নুড়িপাথরই বহন করতে পারি। তাই আমি সেগুলোই নিয়ে এসেছি। কারণ, সীতাকে উদ্ধারের কাজে আমিও তো সাহায্য করতে চাই।"

বানররা কাঠবিড়ালিটিকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিল এবং পুনরায় নিজেদের কাজে মন দিল। কিন্তু কাঠবিড়ালিটি অবিরাম নুড়িপাথর সংগ্রহ করে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো বসিয়ে যেতেই থাকল।



এ দৃশ্য দেখে বানরদের একজন ক্ষোভে কাঠবিড়ালিটিকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাঠবিড়ালিটি আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল। "রাম!"—সে আর্তনাদ করে উঠল। যখন সে আবার পৃথিবীর দিকে নেমে আসছিল, রাম তাকে লুফে নিলেন। তিনি তাকে নিজের হাতের তালুতে ধরে রাখলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেটির দিকে তাকালেন।

এরপর তিনি বানরদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "তোমরা অত্যন্ত শক্তিশালী, আর এই কাঠবিড়ালিটি দুর্বল। কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

"যারা দুর্বল, তাদের মধ্যেও হয়তো গভীর নিষ্ঠা থাকতে পারে। আমাদের তাদের সাহায্যও প্রয়োজন। আর এ কথা মনে রেখো—বিশাল সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বসানো ছোট ছোট নুড়িপাথরই আসলে সেতুটিকে আরও বেশি মজবুত করে তোলে।"

রাম কাঠবিড়ালিটিকে নিজের হাতের ওপর ধরে রাখলেন। তিনি পরম স্নেহে সেটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর সেই ঐশ্বরিক আঙুলগুলোর স্পর্শে কাঠবিড়ালিটির পিঠে তিনটি গাঢ় রেখার ছাপ পড়ে গেল। বলা হয়ে থাকে—সেই ছাপগুলোই হলো সেই ডোরাকাটা দাগ, যা আমরা আজও কাঠবিড়ালিদের পিঠে দেখতে পাই।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

জীবন জাল



একটি জঙ্গলে, একটি ছোট কালো বিড়াল থাকত। বেচারা সব সময় খুব ভয় পেত। চারদিকেই সে দেখত, এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খাচ্ছে। তাই সে সারাদিন ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকত।

একদিন বিকেলে একটি বেজি সেখানে এল। তার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে সে কালো বিড়ালটিকে দেখে ফেলল। কাছে গিয়ে সে বিড়ালটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

সেই দেখে বিড়ালটি ভয়ে কাঁপতে শুরু করল।

বিড়াল: তুমি কি আমাকে খেয়ে ফেলবে?

বেজি: না, একেবারেই না! আমি তোমার লেজটা দেখছিলাম। ওটার ডোরাগুলো সাপের মতো। তাই......... তাকিয়ে ছিলাম।

বিড়াল: আমি তো আর সাপ নই! আমি একটা বিড়াল। তাহলে... তুমি আমাকে মারবে না তো?

বেজি: তুমি তো আমার বন্ধু। আমি কোনোদিনই বন্ধুকে মারি না।





বিড়াল: সত্যি!? প্রতিদিন দেখি, এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খাচ্ছে। মাকড়সা পোকা খায়। ছোট ছোট পাখি মাকড়সা খায়। ঈগলেরা ছোট ছোট পাখি খায়...... মারামারির যেন শেষই নেই!

বেজি: শোনো, প্রাণীরা তাদের বন্ধুদের খায় না। তারা শুধু তাদের শিকারকেই খায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

বিড়াল: প্রকৃতি? আমি তো প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না!

বেজি: কী বলো! কিন্তু তুমি তো ইঁদুর খাও। ইঁদুর কি তোমার বন্ধু?



বিড়াল: না, ও তো আমার শত্রু!

বেজি: সে কী করে তোমার শত্রু হল? সে তোমার কী ক্ষতি করেছে?

বিড়াল: সে তো আমার কিছুই করেনি। আমি সারা জীবন ইঁদুর খেয়েই আসছি! আমি কখনো এটা নিয়ে ভাবিনি।

বেজি: এটাই তো প্রকৃতি। ইঁদুর হলো তোমার স্বাভাবিক শিকার।

বিড়াল: ওহ! তাহলে তোমারও কি কোনো স্বাভাবিক শিকার আছে?

বেজি: হ্যাঁ, সাপ! আমি ছোটবেলা থেকেই সাপ খেয়ে বড় হয়েছি। আমি তো এ নিয়ে কখনো কিছু ভাবিই নি। স্বাভাবিকভাবেই, আমি সাপ দেখলেই খাই।

বিড়াল: সাপ কি তোমার শত্রু?

বেজি: ও হ্যাঁ! সুযোগ পেলে সাপ আমাকে মেরে ফেলবে।

ঠিক তখনই একটি শিয়াল সেখানে এল। বিড়াল আর বেজি তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ল।

বেজি: সুপ্রভাত, শিয়াল মশাই! আপনি কি আমাদের খেতে চান?

শিয়াল: একেবারেই না! আমি নিজে শিকার করে খাই না।

বিড়াল: তাহলে আপনি তো অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা!

শিয়াল: তেমন নয়। আমি শুধু সিংহের শিকারের অপেক্ষা করি। সিংহ খাওয়া শেষ করলে, আমি আমার ভাগ নিই। সিংহের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত সব প্রাণীই আমার বন্ধু।

বিড়াল: সিংহ কি আমাদের খেয়ে ফেলবে?

শিয়াল: না, আমার তা মনে হয় না। সে বড় প্রাণী বেশি পছন্দ করে।

এরপর একটি রাজগোখরা সাপ ফিসফিস করে এগিয়ে এল। সে একটি ইঁদুরকে তাড়া করছিল। বেজি গাছ থেকে চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে পড়ে সাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হল। শেষে সাপটি মরে পড়ে রইল।

ইঁদুরটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।



ইঁদুর: বেজি কাকা! আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ!

বেজি: এ তো কিছুই না! যে কোনো বেজিই এমনটাই করত।

বিড়াল: (গাছ থেকে নামতে নামতে) এ এক আজব ধাঁধা। সাপ তোমার শত্রু, তাই তোমরা একে অপরকে মারতে চাও। কিন্তু ইঁদুর তোমার বন্ধু। আমিও তোমার বন্ধু। অথচ আমি ইঁদুর খাই। এটাই আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বেজি: প্রকৃতি এমনই। এখানে বন্ধুত্ব আছে, আবার শত্রুতাও আছে। আমরা সবাই জীবনের এক বড় জালের এক একটা সুতোর মতো, আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে বাঁধা।

বিড়াল: তুমি কত বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী! সব কিছুই জানো! তুমি সত্যিই খুব ভালো বন্ধু!

ইঁদুর: হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো বন্ধু!

বেজি: তোমাদের দুজনেরই বন্ধু হতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু এখন, বন্ধু ইঁদুর, তোমার চলে যাওয়াই ভালো— আমার বন্ধু বিড়ালের আবার খিদে পাওয়ার আগেই!

ইঁদুর: ধন্যবাদ! বিদায়!

অ্যাড্রিয়েন ফস্টার পটারের গল্প অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy



বোঝা হালকা হওয়া

হান্স দূরের এক শহরে কাজ করতে গিয়েছিল।
সে টানা সাত বছর মন দিয়ে কাজ করল।
একদিন সে তার তত্ত্বাবধায়ককে বলল,
"আমি আমার মাকে দেখতে বাড়ি যেতে চাই। তিনি আমাদের গ্রামেই থাকেন। দয়া করে আমার মজুরি দিন, যেন আমি তা নিয়ে যেতে পারি।"

তত্ত্বাবধায়ক বললেন,
"তুমি সাত বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছ। এই নাও তোমার মজুরি।"
এই বলে তিনি তাকে একটি বড় সোনার টুকরো দিলেন।

হান্স সোনার টুকরোটি কাপড়ে মুড়ে মাথায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল।

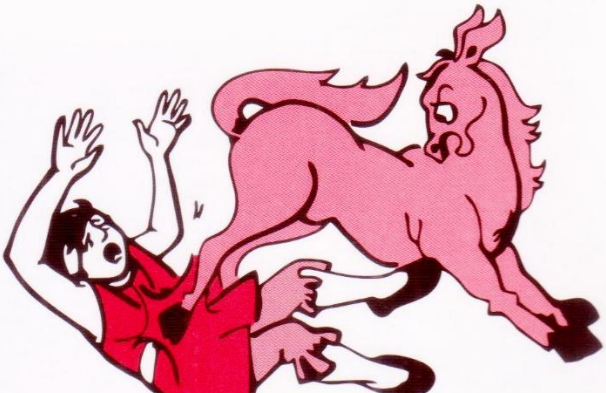
পথে সে দেখল, একজন লোক একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে।
হান্স মনে মনে বলল,
"আহা! যদি আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যেতে পারতাম!"

এ কথা শুনে ঘোড়াওয়ালা বলল,
"তুমি এত ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটছ কেন?"

হান্স বলল,
"আমার উপায় নেই। এই সোনা আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতেই হবে।"

ঘোড়াওয়ালা বলল,
"তা হলে এমন করো—আমাকে সোনাটা দাও, আর আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও। এতে তুমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে!"

হান্স খুশি হয়ে সোনার টুকরোটি দিয়ে ঘোড়াটি নিল।
কিন্তু সে ঘোড়ায় চড়তেই আর লাগাম টানতেই ঘোড়াটি ছুটে গেল!
হান্স ছিটকে পড়ল এক খাদের মধ্যে!



সব মোটেও ঠিক ছিল না।

কাছেই কাজ করছিল এক চাষী। সে হান্সের ঘোড়াটি ধরে ফেলল এবং তাকে খাদের ভেতর থেকে উঠতে সাহায্য করল। হান্স তাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, "এই ঘোড়াটা আমাকে কত সহজেই ফেলে দিল! আমি আর কখনো এটায় চড়ব না। কিন্তু আপনার গরুটাকে দেখুন—কী শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে! আমার এমন একটি পশু থাকলে কত ভালো হতো!"

চাষী বলল, "ওহ! তুমি যদি গরু চাও, নিশ্চয়ই নিতে পারো। বদলে কি তোমার ঘোড়াটা আমাকে দেবে?"

হান্স খুশি হয়ে ঘোড়াটি দিয়ে গরুটি নিল। গরুটিকে সামনে হাঁকিয়ে সে আবার রওনা হল।

কী গরম দিন! হান্স খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। সে ভাবল, "এই গরুটা যদি আমাকে একটু দুধ দিত!"

সে হাঁটা থামিয়ে বসে গরুটিকে দুধ দোয়াতে গেল। কিন্তু গরুটি চমকে উঠে তাকে লাথি মারল!

হান্স রাস্তায় পড়ে গেল। দুধ তো আর পাওয়া গেল না!

চোখ খুলে হান্স চারদিকে তাকাল। তার গরুটি একটু দূরে শান্তভাবে ঘাস খাচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি!

এমন সময় এক লোক সেখানে এল। সে একটি ছাগলকে লম্বা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি হান্সকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।



হান্স বলল, "এই গরু দুধ দেয় না, শুধু লাথি মারে! আপনার ছাগলটা বরং ভালো। আপনি কি গরুর বদলে ছাগলটা দেবেন?"



লোকটি রাজি হল। হান্স গরু দিয়ে ছাগলটি নিল। দড়ি ধরে সে আবার হাঁটা শুরু করল।

পথে সে একজন লোককে দেখল, যার কাছে একটি মুরগি ছিল। হান্স ভাবল, "বাড়িতে মুরগি থাকলে ভালো হয়। এটি আমাদের ডিম দেবে। কিছু ডিম রেখে দিলে সেগুলো থেকে বাচ্চাও বের হবে। তখন আমাদের অনেক মুরগি হবে!"

তাই সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছাগলের বদলে আপনি কি আপনার মুরগিটা দেবেন?"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল।

এবার হান্স দ্রুত হাঁটতে লাগল। মুরগিটা তো একেবারেই হালকা!

কিন্তু তখনো তার বাড়ি বেশ খানিকটা দূর। ঠিক তখনই এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে আসছিল। তার মাথায় ছিল একটি ধার দেওয়ার পাথর (শান পাথর)।





হান্স দেখল লোকটি খুব কষ্ট করে বোঝা বহন করছে। তার খুবই সহানুভূতি হল। সে লোকটির জন্য দুঃখ পেল এবং তাকে সোনার টুকরো, ঘোড়া, গরু আর ছাগলের গল্প বলল।

লোকটি বলল, "তোমার ওই ছোট্ট মুরগিটা আছে— তুমি তো খুব ভাগ্যবান! যদি তুমি এটা আমার এই ধার দেওয়ার পাথরের (শান পাথর) সঙ্গে বদল করতে চাও, তাহলে তুমি অনেক ছুরি ধার দিতে পারবে আর ছুরি ধার দিয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে!"

আমাদের সরল হান্স তাতেই রাজি হয়ে গেল! লোকটি কৃতজ্ঞ হয়ে মুরগি নিয়ে চলে গেল, আর হান্স শান পাথরটি মাথায় তুলে নিল।

হান্স হাঁটতে হাঁটতে এক বড় কুয়ার কাছে পৌঁছাল। সে পাথরটি কুয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে জল খেতে গেল।

হঠাৎ কী হল! ঘুরতে গিয়ে হান্স পাথরটিতে ধাক্কা খেল, আর পাথরটি কুয়ার ভেতরে পড়ে গেল!

হান্স বলে উঠল, "আরে বাপরে! আমার সব বোঝা তো নিজে থেকেই একে একে হালকা হয়ে গেল!"

এই বলে সে আনন্দে দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটল, তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে!



জার্মান লোককাহিনি অবলম্বনে

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

সোনার বেজি

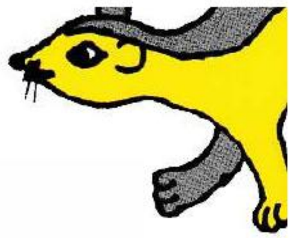
যুদ্ধ শেষ হলে পাণ্ডবরা এক বড় জয়োৎসবের আয়োজন করলেন। সম্রাট যুধিষ্ঠির সব দেশের রাজাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

তিনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে উপহার বিলিয়ে দিলেন ও দানধ্যান করলেন। চারদিকে গান, নাচ আর মহাভোজের আনন্দে ভরে উঠল পরিবেশ। সেখানে সবার জন্য ছিল প্রচুর খাবার।

এই আনন্দের মাঝেই হঠাৎ একটা বেজি উৎসবের হলে এসে হাজির হল। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেজিটির শরীরের অর্ধেক অংশ সোনার মতো ঝলমল করছিল। আলোর ঝিলিকে সেটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।





নিঃশব্দে বেজিটি মেঝের উপর দিয়ে এগিয়ে এল।

সম্রাটের কাছে গিয়ে সে বলল, “ধর্মরাজ! এই উৎসব সত্যিই অসাধারণ। আপনি আপনার সম্পদ উজাড় করে দান করেছেন।”

রাজা যুধিষ্ঠির মাথা নাড়লেন।

বেজি আবার বলল, “তবে আপনার দান এখনো সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়।”

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, “কেন? কোথায় আমার ভুল হয়েছে?”

বেজি বলল, “আমি এমন এক গরিব মানুষের কথা জানি, যার দান আপনার চেয়েও বড়। আমার এই শরীরের অর্ধেক সোনালি হওয়ার গল্প শুনলেই আপনি বুঝবেন।”

তারপর বেজি গল্প শুরু করল—

“যার কথা বলছি, সে ছিল এক দরিদ্র গ্রামবাসী। সে মাঠে কঠোর পরিশ্রম করত, তবুও সামান্য শস্যই পেত। সেই শস্য সে পরিবারের সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিত। এইভাবেই তারা অনেক বছর ধরে অল্প খেয়ে বেঁচে ছিল।

তারপর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এল। আগে তাদের কাছে অল্প ছিল, আর এখন তাদের কাছে কিছুই রইল না। পুরো পরিবার তিন দিন না খেয়ে রইল।

চতুর্থ দিনে, সেই গরিব মানুষটি কষ্ট করে কিছু শস্য জোগাড় করল। সে সেগুলো বাড়ি এনে আটা বানাল।

রাতের খাবার প্রস্তুত হল।

ঠিক সেই সময় এক সন্ন্যাসী সেই বাড়িতে এলেন। "আমার খুব খিদে পেয়েছে!" তিনি বললেন। সেই দরিদ্র গ্রামবাসী নিজের ভাগের খাবারটুকু তাঁকে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসীর পেট ভরল না। তিনি আরও খাবার চাইলেন। গ্রাসেই দরিদ্র মবাসীর স্ত্রী নিজের ভাগের খাবারটুকু তাঁকে দিলেন। আবারও সন্ন্যাসী আরও খাবার চাইলেন। গ্রামবাসীর ছেলে নিজের ভাগের খাবারটুকু ছেড়ে দিল। সন্ন্যাসী সেটাও খেয়ে ফেললেন, এরপরও তিনি আরও খাবার চাইলেন! এবার পুত্রবধূ নিজের ভাগের খাবারটুকু দিয়ে দিলেন। অবশেষে, সন্ন্যাসী খাওয়া থামালেন।

তারপর তিনি বললেন, "তোমরা নিজেরা অনাহারে থাকলেও, আমাকে তোমরা সানন্দে খাইয়েছ। তোমাদের এই উদারতা একজন রাজার উদারতার চেয়েও মহৎ!" তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"এই সবকিছু যখন ঘটছিল, তখন আমি নিজেই তা স্বচক্ষে দেখেছি," বেজিটি বলে চলল।



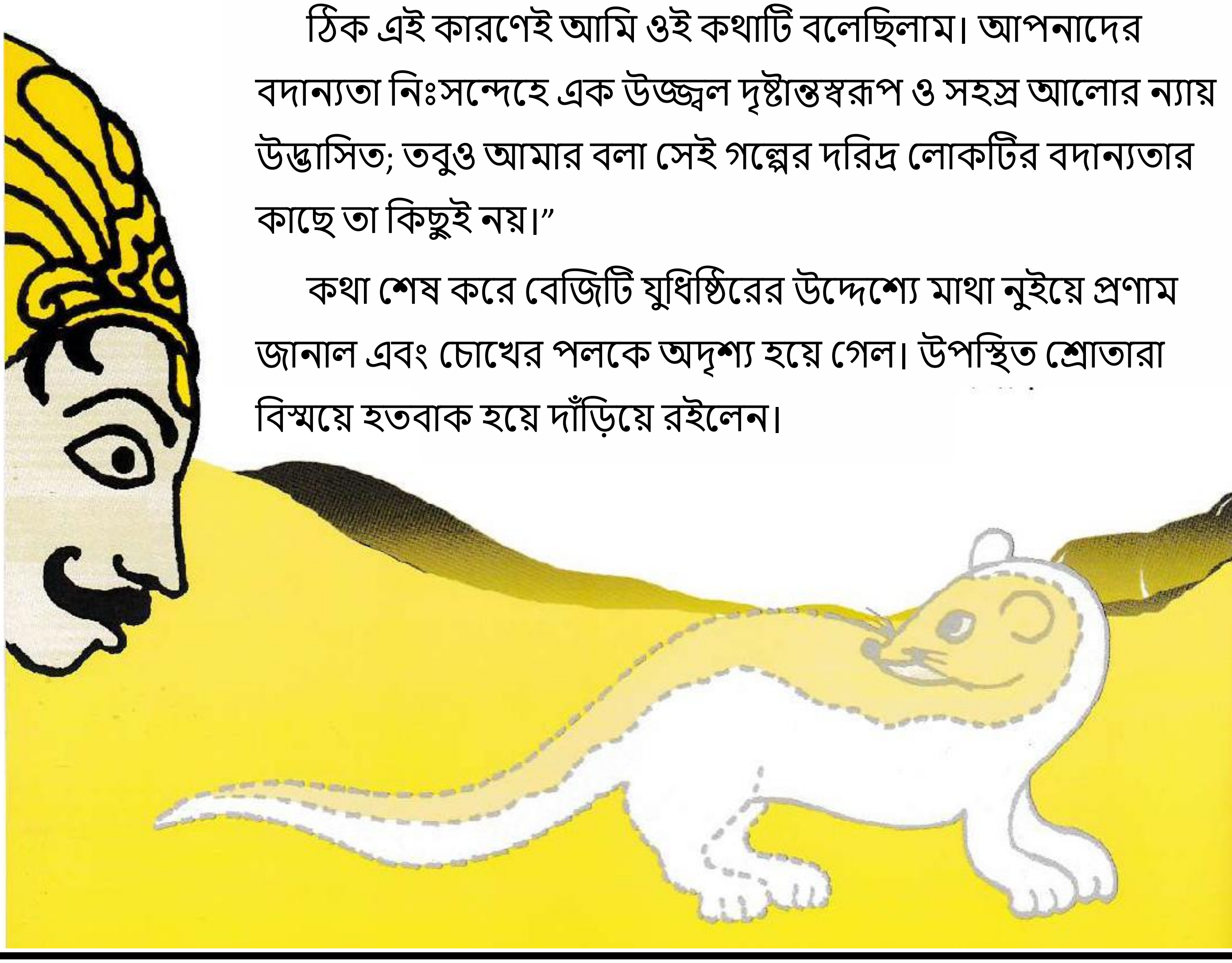
"এরপর, আমি চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পিষে রাখা শস্যের কিছুটা আমার লোমের সাথে আটকে গেল। আমার শরীরের সেই অংশটি সোনালি বর্ণ ধারণ করল।

সেই থেকে, আমি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিটি স্থানেই আমি হামাগুড়ি দিয়েছি, গড়িয়েছি এবং শরীর মোচড় দিয়েছি—এই আশায় যে, আমার শরীরের বাকি অর্ধেক অংশও হয়তো সোনালি হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আজ, আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আপনাদের এই বিজয়োৎসবে উপস্থিত হয়েছি। আমি উৎসবকক্ষের ভেতর দিয়ে এবং সমবেত জনমণ্ডলীর মাঝে হামাগুড়ি দিয়েছি, গড়িয়েছি এবং শরীর মোচড় দিয়েছি। কিন্তু আপনারা তো স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন, আমার শরীরের বাকি অর্ধেক অংশটি সোনালি হয়ে ওঠেনি।

ঠিক এই কারণেই আমি ওই কথাটি বলেছিলাম। আপনাদের বদান্যতা নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ও সহস্র আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত; তবুও আমার বলা সেই গল্পের দরিদ্র লোকটির বদান্যতার কাছে তা কিছুই নয়।"

কথা শেষ করে বেজিটি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাল এবং চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?

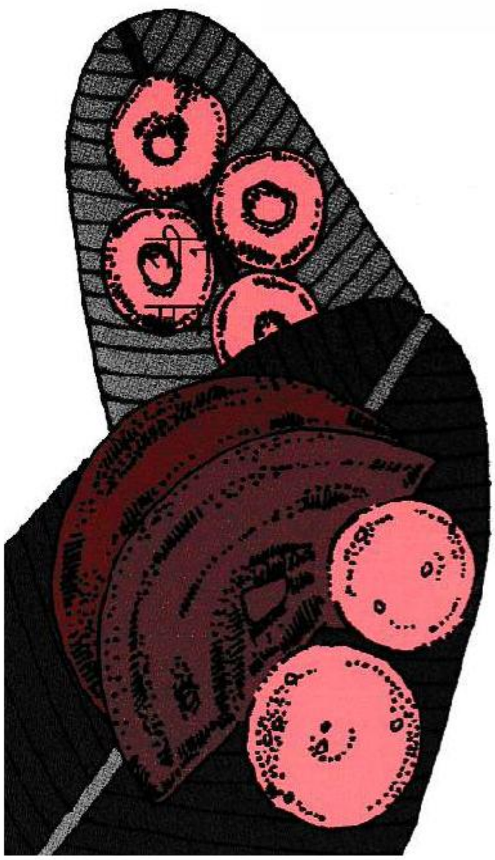
ঝকঝকে হলুদ গোল বল,
খেলার জন্য নয় মোটেও চল!
মুখে পুরে নাও এক কামড়,
মিষ্টি স্বাদে হবে মন ভরপুর!



ছোট্ট ঘর এক তিন কোণা,
ভিতরে আলু-মশলায় ভরা,
সবাই খায় বড়ই মজা করে—
খেতে লাগে বড়ই চমৎকার রে!

গোল গোল পাতলা থালায়,
নরম গরম কেক ফুলে ভাপায়,
সাথে চাটনিকে সঙ্গী নিয়ে
সবুজ পাতায় রয় সে চেয়ে!

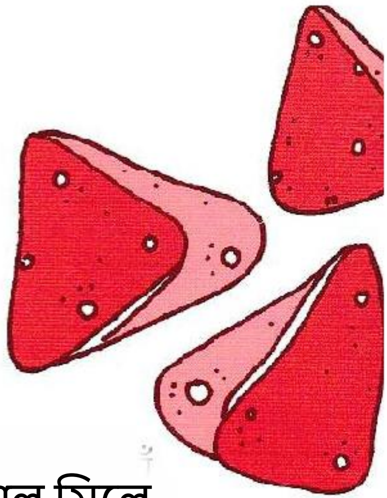
সাদা চিকন সাপের দল,
গোল থালায় জড়িয়ে চল,
কুরমা বা নারকেল দুধে—
খেতে লাগে দারুণ স্বাদে!



আটায় বানানো গোল-গাল চেহারা
ফুলকো আর মুচমুচে দোহারা
তেলে ঝাঁপ দিলে উঠি ফুলে ফেঁপে,
মোটা হই আমি মুহূর্তে!

গোল গোল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরি,
তেলে ভাজার পর রসেতে পেট ভরি,
গরম গরম খাও তাড়াতাড়ি—
না হলে মজা যাবে হারি!

আগুনের উপর কালো থালা,
তার ওপর ফুটছে সাদা পাতলা ,
দেখো! ফেঁপে উঠছে ধীরে—
মশলা ভরার সময় এলে!

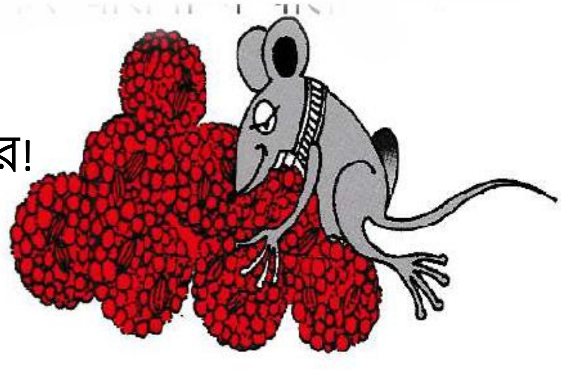


সাদা চাল, দুধ আর চিনি মিশে,
রান্না হলো মিষ্টি, নয় যে সে,
এলাচ-বাদাম আরও দিলেই—
উৎসবের রঙ বদলে যায় নিমেষেই!

চাল আর মুগ ডাল মিলে,
গুড় দিয়ে, মিষ্টি ঢেলে,
এলাচ-ঘি আর বাদাম যেই দেব্ আঃ—
যে খাবে, বলবে সেই- বাহ বাহ!

কড়মড় করে নকশা তার,
মুখে দিলেই সে স্বাদের জুড়ি মেলা ভার,
দাঁতকে দেয় বেশ নাড়া,
তবু খেতে সবার সেরা !

গোল গোল আর সোনালি রঙ,
বাইরে কড়মড়, ভেতরে নরম ঢঙ,
প্রোটিনে ভরা এই খাবার,
সাম্বার আর দইয়ের সাথে মিলে দারুণ স্বাদ তার!



নারকেল কুঁচি, গুড়ের সাথে,
এলাচ মিশে সুগন্ধে মাতে,
চালের গোলায় ভরে ভাপালেই,
মন জিতবে সব অতিথি আসলেই!

ইডলি, দোসা, মিষ্টি পঙ্গল, লাড্ডু, জিলেপি, মোদক,
ইডিয়াপ্পম, মুরুক্কু, বড়া, পুরি, সামোসা, পায়েস

জোরে জোরে মারো যেই,
আমি তাতে সাড়া দেই!
এইভাবেই খেলি দু'জন,
মজা লাগে সারাক্ষণ!

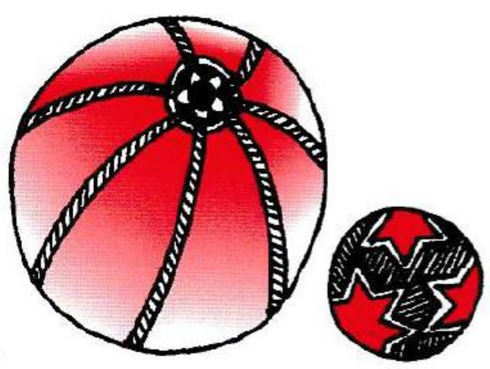


আমি উড়ি, তবু ঈগল নই,
ঝাঁপ দিই, তবু পেঁচা নই,
রঙিন আমি, টিয়া নই—
তবু সবার ভালোবাসায় ভেসে রই!

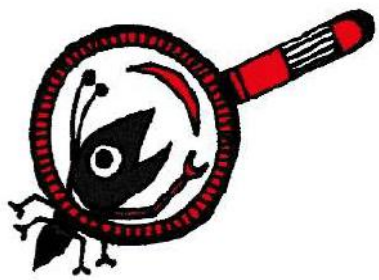
এই খেলাটা অনেক পুরনো,
দড়ি আর বন্ধু হলেই যথেষ্ট যেনো,
চল না সবাই মিলে খেলি—
তুমি কি খেলবে আমার সঙ্গে মিলি?

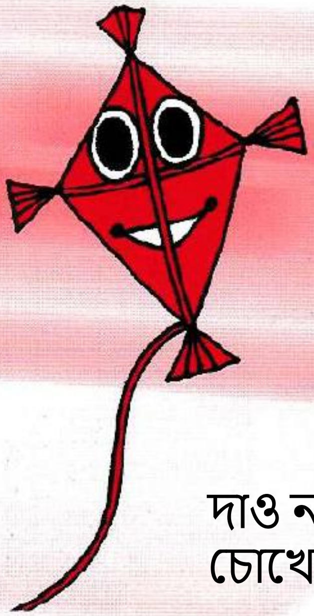
উঁচুতে উঠি আকাশ ছুঁতে চাই,
দূরের ঐ ডালকেও ছুঁতে যেন যাই,
আবার নেমে যাই হুশ করে নিচে,
আবার উঠি খুশির নাচে!
উপর-নীচ, উপর-নীচ—হুশ!
দোলাই তোমার মনটি করে খুশ !

আমায় ফেললে চুপটি কোথায় হই,
আবার উঠলে স্থির না হই!



এক পায়ে ভর দিয়ে নাচি,
ঘুরি ঘুরি আনন্দে মাখি,
শেষে যখন ক্লান্ত হই—
চুপটি হয়ে শুয়ে রই!





আঙুল ছোঁয়ায় উড়ি আমি,
হালকা ছোঁয়ায় ভাসি আমি,
কিন্তু যদি খোঁচাও আমায়—
ফেটে যাই রেগে, আওয়াজ করে-ধুম!

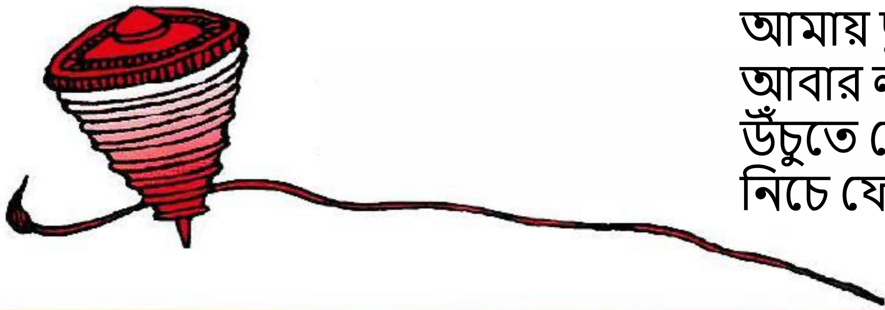
কাঠের বাড়ি, চৌদ্দ ঘর,
ভিতরে থাকে কত যে পর!
সত্তরটি ছোট্ট বাচ্চা নাচেরে—
বল তো তারা কারা রে?

দাও না কিছু ছোট্ট জিনিস,
চোখের সামনে তা দ্বিগুণ করি নিশ্চিন্ত!



ঘুরি আমি নেচে নেচে, একই বৃত্তের চারপাশে
হাতি-ঘোড়া আছে সব শেখানো পড়ানো,
নিজের জায়গায় যে যার দাঁড়ানো!

আমার পা চলে না,হাতে আমি দিই না তালি কখনও,
আমার মুখে নেই কথা, আঙুলেও নেই চুটকি
—কিছুই করি না আমি তেমন!
শুধু যখন বাচ্চারা আসে কাছে, আমি উঠি জেগে,
আমায় ওরা ভালবাসে, "আমার প্রিয়" বলে, খেলায় ভাসে!



আমায় ছুঁড়ে দিলে নিচে,
আবার লাফিয়ে উঠি পিছে!
উঁচুতে ফেলো—নামি আবার,
নিচে ফেলো—উঠি আবার!

দোলনা, বেলুন, বল, পুতুল, আতসকাচ, নাগরদোলা, ঘুড়ি,
তাঞ্জোর পুতুল, দড়ি লাফ, পাল্লাংকুঝি, লাট্টু, ঢোল

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

টমেটোগুলো সব গেল কোথায়?



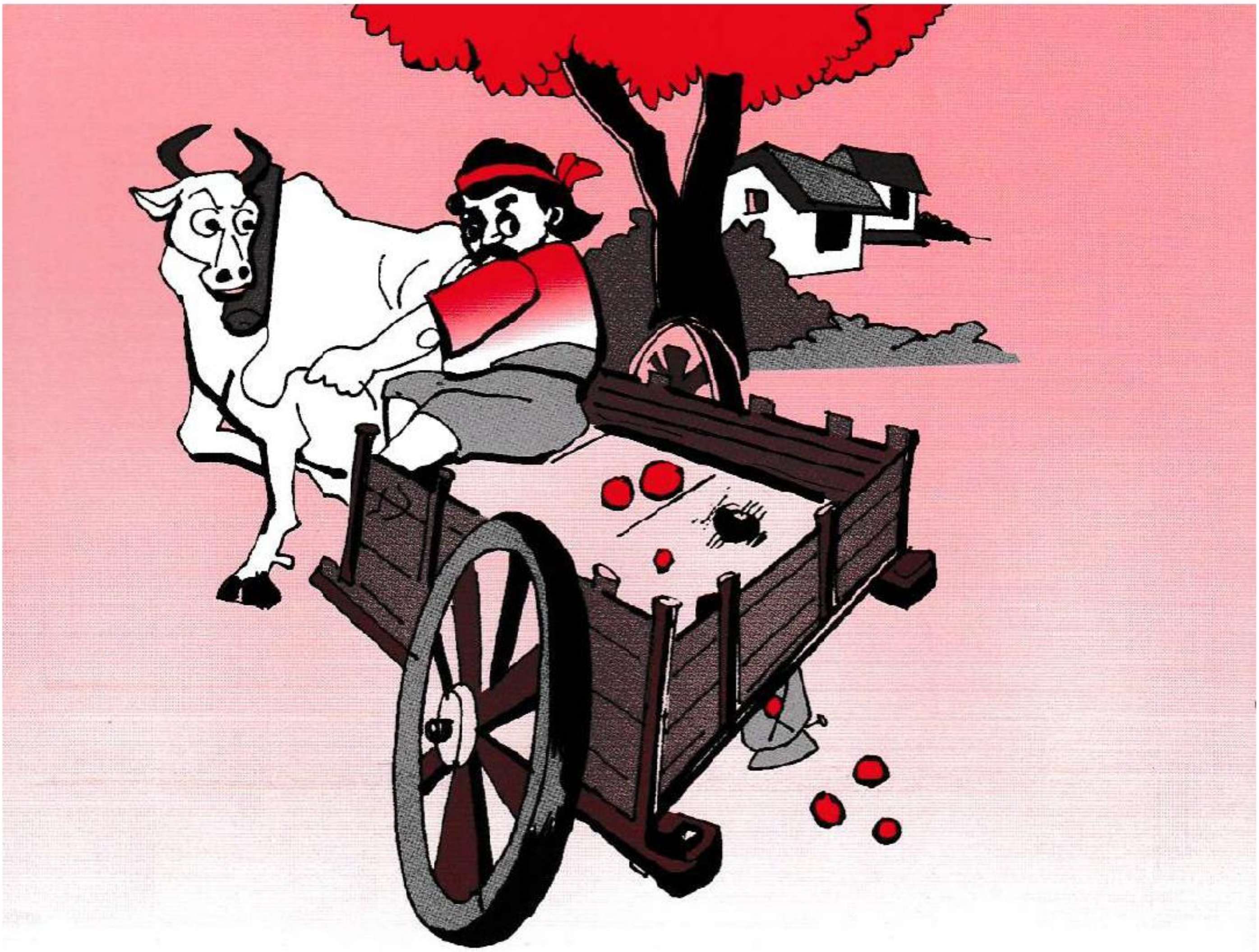
মোহনের বাগানটি বেশ ভরে উঠেছিল। টমেটো গাছগুলো সূর্যের দিকে তরতর করে বাড়ছিল। ফলগুলো সব বেশ শক্তপোক্ত ও লালচে হয়ে উঠেছিল। নিজের বাগানের টমেটোগুলো নিয়ে মোহনের গর্বের শেষ ছিল না!

একদিন হল কি, একটা হরিণ সেই বাগানে ঢুকে পড়ল। সেটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মোহন একটা পাথর হাতে তুলে নিল। কিন্তু তার স্ত্রী বলে উঠল, "হরিণটিকে আঘাত কোরো না! ও তো মাত্র দু-একটা টমেটো খাবে, তারপর নিজেই চলে যাবে।"

কিন্তু মোহন তার কথা বিশ্বাস করল না। সে বাগানের চারপাশ ঘিরে একটি বেড়া বানাল।

"এখন টমেটোগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ," সে মনে মনে ভাবল।





এরপর বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতে শুরু করল। তারা তো টমেটোর মহাভোজ বসিয়ে দিল! বেচারা মোহন তো দিশেহারা হয়ে পড়ল। "আজ থেকে," সে মনে মনে ঠিক করল, "আমার একটা টমেটোও আর কাউকে নিতে দেব না।"

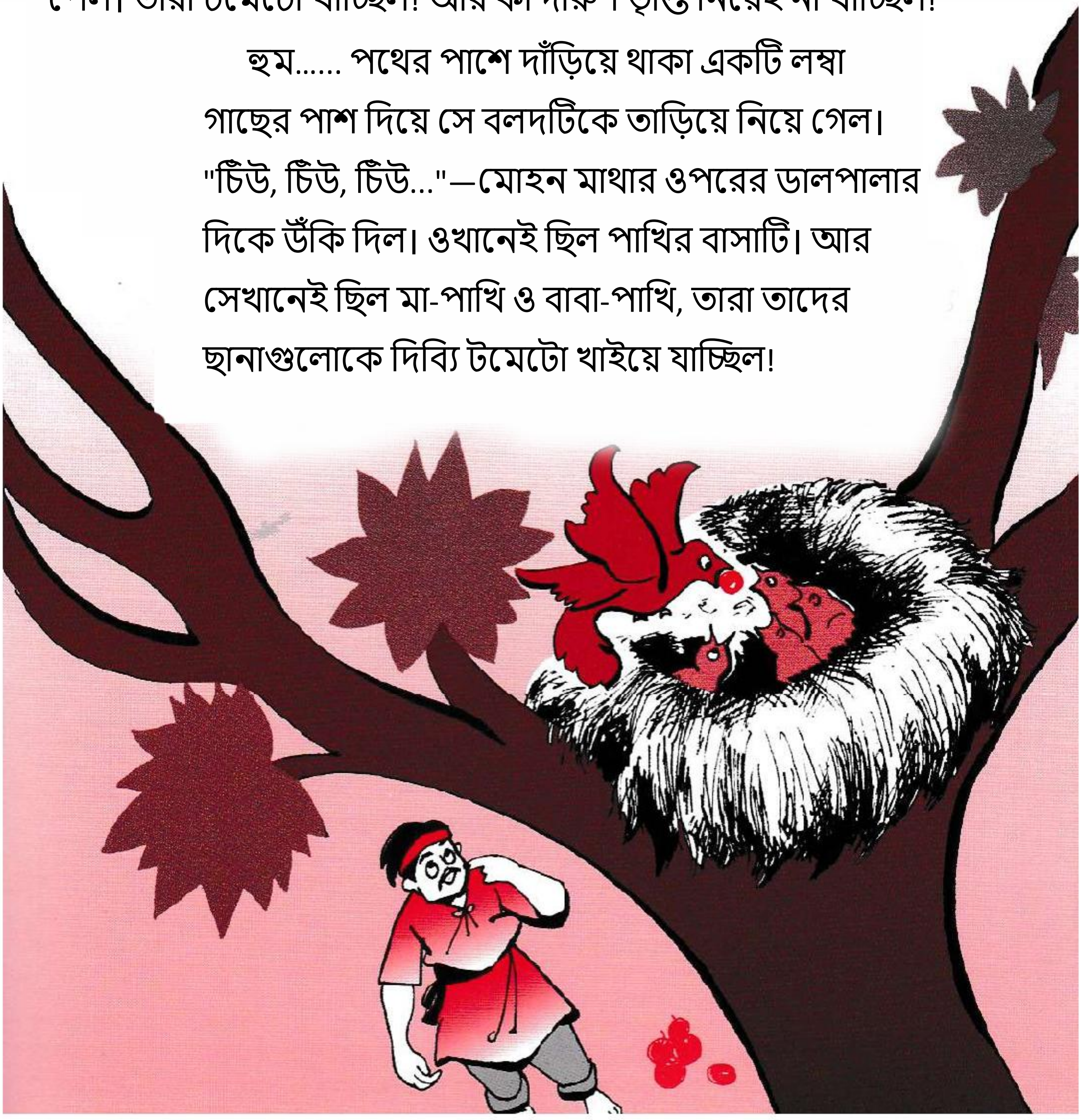
পরদিন খুব ভোরেই সে বাইরে এল এবং বাগানের প্রতিটি পাকা টমেটো তুলে নিল। সে সবকটি টমেটো একটি গাড়িতে বোঝাই করল এবং শহরের দিকে রওনা দিল; গাড়ির বলদটিকে দ্রুত চালানোর জন্য সে মুখে আর চাবুক দিয়ে নানা রকম শব্দ করতে লাগল।

শহরে পৌঁছে মোহন তার গাড়িটি থামাল এবং টমেটোগুলো নামাতে গেল। সেকি, এ কিরকম করে হল! গাড়িটি তো একদম খালি! "আমার টমেটোগুলো গেল কোথায়?" সে হাহাকার করে উঠল। তারপর সে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল। আরে! গাড়ির পেছনের দিকে তো একটা ফুটো রয়েছে! সবকটি টমেটো সেই ফুটো দিয়ে নিচে পড়ে গেছে!

মোহনের তো প্রায় কেঁদেই ফেলার দশা হয়েছিল। কিন্তু না কেঁদে সে প্রতিজ্ঞা করল, "আমি আমার সব টমেটো খুঁজে বের করবই!" সে গাড়িটি ঘুরিয়ে নিল এবং যে পথে এসেছিল, সেই পথ ধরেই ফিরে চলল। কিন্তু একটি টমেটোও তার চোখে পড়ল না!

ব্যাপারটা ছিল খুবই গোলমেলে। হঠাৎ মোহন দুটি ছোট হরিণ দেখতে পেল। তারা টমেটো খাচ্ছিল! আর কী দারুণ তৃপ্তি নিয়েই না খাচ্ছিল!

হুম...... পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লম্বা গাছের পাশ দিয়ে সে বলদটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। "চিঁউ, চিঁউ, চিঁউ..."—মোহন মাথার ওপরের ডালপালার দিকে উঁকি দিল। ওখানেই ছিল পাখির বাসাটি। আর সেখানেই ছিল মা-পাখি ও বাবা-পাখি, তারা তাদের ছানাগুলোকে দিব্যি টমেটো খাইয়ে যাচ্ছিল!



সেই একই গাছের অন্য একটি ডালে সে দেখল, কয়েকটি কাঠবিড়ালি কিচিরমিচির করছে। তারাও তো গপ গপ করে টমেটো খাচ্ছিল! "আমার টমেটোগুলোর আর একটিও ফিরে পাব বলে মনে হয় না," সে মনে মনে বলল।

এবার সে বলদটিকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে দিল। আঁকাবাঁকা পথ ধরে বলদ-টানা গাড়িটি ধীরগতিতে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর সেটি একটি ছোট বাড়ির কাছে এসে পৌঁছাল। ভেতর থেকে শিশুদের হাসাহাসি আর খেলার শব্দ শুনতে পেল মোহন।

সেই শব্দের টানে সে তার গাড়িটি থামাল। কী চমৎকার দৃশ্য! শিশুদের সবার হাতেই টমেটো। তাদের মুখগুলো হাসিতে উদ্ভাসিত। “ঐ তো,আমার সেই অমূল্য টমেটোগুলো!" মনে মনে ভাবল মোহন। "দেখো, তারা এই পৃথিবীতে কত আনন্দ বয়ে এনেছে!"

এবার টমেটো হারানোর বিষয়টি তাকে আর বিন্দুমাত্রও বিচলিত করল না। এক হালকা মন নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

৪৬ তিনটি সোনার পুতুল



বিজয়নগরের রাজদরবারে উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। এক পরিব্রাজক পণ্ডিত তিনটি সোনার পুতুল নিয়ে এসেছেন। পুতুল তিনটি দেখতে হুবহু একই রকম। যারাই দেখছে, তারাই ভাবছে যে পুতুলগুলো সব এক। কিন্তু পণ্ডিত বললেন, "এই তিনটি পুতুলকে দেখতে একই রকম মনে হচ্ছে। আসলে, এদের প্রত্যেকটি অন্য দুটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা।"

এরপর তিনি ঘোষণা করলেন, "যদি কেউ পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারে, তবে সে পুতুলগুলোর সাথে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে পাবে। কিন্তু, দশ দিন পরেও যদি কেউ

পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না পায়, তাহলে আপনি আমাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন!" রাজার প্রতি এটাই ছিল তাঁর চ্যালেঞ্জ। এবং রাজা তা গ্রহণ করলেন।

সারা রাজ্যে গুঞ্জন আর ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো! পুতুলগুলো প্রদর্শনের জন্য রাখা হলো। সেগুলো দেখতে মানুষের ভিড় জমতে লাগল। এইরকম করে নয় দিন কেটে গেল। কিন্তু পুরস্কারটি কেউ দাবি করল না।

রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "এই পণ্ডিত তো এবার প্রকাশ্যে বিজয় ঘোষণা করবে! আর আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এ যে অসহ্য!" তিনি বললেন।

"শান্ত হোন, মহারাজ," তেনালি রামন রাজাকে আশ্বস্ত করলেন। "আমরা যথাসময়ে পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করব।"



পরদিন তেনালি রামন এসে পুতুলগুলো পরীক্ষা করলেন। ভিড় জমে গেল এই দেখার জন্য যে তাদের এই চতুর মন্ত্রী কীভাবে রাজ্যের সম্মান রক্ষা করেন?

কিছুক্ষণ পর তেনালি রামন সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে একটি লাঠি নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি সেটি প্রথম পুতুলটির কানে ঢোকালেন। যখন তিনি লাঠিটি একটু ঠেললেন, সেটি পুতুলটির অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে এল।

এরপর তিনি লাঠিটি দ্বিতীয় পুতুলটির কানে ঢোকালেন। এবার সেটি পুতুলটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল!

কিন্তু যখন তিনি লাঠিটি তৃতীয় পুতুলটির কানে ঢোকালেন, সেটি ওখানেই আটকে গেল এবং আর বের হলো না!

তেনালি রামন পণ্ডিতের দিকে ফিরে বললেন, "এই সেই পার্থক্যগুলো, যার অপেক্ষায় আপনি ছিলেন:



এখানে, প্রথম পুতুলটি বোকা মানুষদের সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বোকা মানুষের এক কান দিয়ে যা ঢোকে, তা অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় পুতুলটি আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে শেখায়। তারা যা-ই শোনে, তা-ই সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বের করে দেয়।

তৃতীয় পুতুলটি আমাদের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে চিনিয়ে দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কথা বলার আগে চিন্তা করেন। এই ব্যক্তি যা-ই শোনেন, তা সবার আগে নিজের মনের গভীরে ধারণ করেন।"

এই শোনার পর, পণ্ডিত বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তেনালি রামনকে কুর্নিশ করলেন এবং ঐ তিনটি সোনার পুতুল তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে এক থলে সোনার মুদ্রা উপহার দিলেন। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তেনালি রামন কালবিলম্ব না করে সেই দুটি পুরস্কারই রাজার চরণে নিবেদন করলেন। আর এর বিনিময়ে তাঁর পুরস্কার কী ছিল? দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা!



© **Katha Jharna 2008**

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

আমাদের বাগান

নীল আকাশ... মৃদু বাতাস... স্নিগ্ধ রোদ... আর নিচে—ফুলে ভরা এক বাগান; কতই না বিচিত্র রঙের সেই ফুলেরা, মৃদু হাওয়ায় দুলে চলেছে!

গোলাপ, জুঁই, গাঁদা, পদ্ম, চন্দ্রমল্লিকা, জবা—সবারই মিলেমিশে বাস এই বাগানে। ফুলের ফাঁকে ফাঁকে বেড়ে উঠেছে ছোট ছোট ঝোপ, ঘাস আর লতানো গাছ!

সবুজের বিচিত্র সব আভা ফুলের রঙগুলোকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর তাদের সৌন্দর্যকে করে তুলেছে আরও গভীর।

এই বাগানের বাসিন্দারা তাদের বাগানটিকে নিয়ে কতই না গর্বিত!



একদিন, সেই বাগানে, মালী একটা নতুন ফুলের গাছ নিয়ে এল। সে সেটিকে বাগানের ঠিক মাঝখানে পুঁতে দিল।

ফুলটির লাল রঙটি ছিল অদ্‌ভুত সুন্দর আর অন্যধরনের। বাগানের অন্য ফুলগুলো এতে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ল! নতুন এই লাল ফুলটিকে তাদের একদমই পছন্দ হলো না।

নতুন ফুলটি একা হয়ে পড়ল! সে মনমরা হয়ে পড়ল, আর নীরবে কষ্ট পেতে লাগল।

একদিন, একটি ছোট্ট সাদা গোলাপের নজর পড়ল তার ওপর!

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?" সে জানতে চাইল।

লাল ফুলটির মন খুশিতে ভরে উঠল। সে সেই ছোট্ট সাদা গোলাপটিকে শোনাল, সুদূর কোনো এক অজানা জায়গা থেকে সে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছেছে।

ছোট্ট সাদা গোলাপটি গভীর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনল। এরপর সে লাল ফুলটিকে শোনাল তাদের এই বাগানের পরিবেশ-প্রতিবেশের কথা—ঋতুর পালাবদল, মাটির বৈচিত্র্য এবং বাগানের প্রতিটি গাছের খুঁটিনাটি বিবরণ। দেখতে দেখতেই, ফুল দুটি একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠল। তারা প্রতিদিনের অনেকটা সময়ই একে অপরের সাথে গভীর গল্প করে কাটাত। দিনে দিনে তাদের সেই বন্ধুত্ব আরও গভীর ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল।

এরপর একদিন, মালী অনেকগুলো নতুন চারাগাছ নিয়ে এল। এবার তো বাগানের গাছেরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের এই সুন্দর জায়গাটা কি তবে নানা ধরণের ফুলে ছেয়ে যাবে? কী হতে চলেছে, তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

"তোমরা এত চিন্তা করছ কেন?" জিজ্ঞেস করল ছোট্ট সাদা গোলাপটি। "এই ফুলগুলো তো আমাদের প্রতিবেশী। খুব শিগগিরই ওরা আমাদের বন্ধু হয়ে উঠবে!" তার কথা শুনে কিছু ফুল স্বস্তি পেল, তবে সবাই নয়!

এরপর, যখন মৌমাছি আর প্রজাপতিরা তাদের মধু পান করতে এল, তখন কিছু ফুল চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওই নতুন ফুলগুলোর কাছে যেও না। ওরা নতুন,আমাদের চেয়ে আলাদা। ওরা আমাদের বন্ধু নয়!"

কিন্তু মৌমাছি আর প্রজাপতিরা তো কত কত বাগান দেখেছে! তারা উত্তরে বলল, "তোমরা যে কত ভাগ্যবান! এখানে তোমাদের সবার জন্য প্রচুর উর্বর মাটি পেয়েছ। তার সাথে এখানে আরও আছে স্নিগ্ধ বাতাস, জল এবং রোদ। তাছাড়াও, পোকামাকড়ও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে!"

ফুলেরা যেন তাদের ভুল বুঝ্‌তে পারছিল।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে, নতুন চারাগাছগুলোও সতেজ হয়ে উঠছে। এখন সূর্যের রশ্মি প্রতিটি ফুলকে স্পর্শ করছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও তাদের সবাইকে সমানভাবে সিক্ত করছে। মৃদু বাতাস তাদের সবাইকে সতেজ করে তুলছে। বাগানটি এখন আরোও যেন চমৎকার সুন্দর হয়ে উঠেছে!

এখন এখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন বেড়াতে আসে।

উদ্বিগ্ন ফুলেরা তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তারা উপলব্ধি করেছে, "সাদা গোলাপ, মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সবাই সত্যি বলছিল! নতুন ফুলেরা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি! আমাদের জায়গাও কেড়ে নেয়নি!"

এখন বাগানটি শান্ত এবং বন্ধুত্বে একতাবদ্ধ। যারা এখানে ঘুরুতে আসে, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে, "দেখ, দেখ, কী সব রঙ! আর কত রকমের ফুল! আমরা এমন চমৎকার বাগান আগে দেখিনি!"

অ্যাড্রিয়েন ফস্টার পটারের একটি গল্প অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

৪৪ বোকা খোঁজার গল্প!

আকবর ও বীরবলের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। আকবর বললেন, “আমি দেখেই বলে দিতে পারি কোনো মানুষ জ্ঞানী কি না। কিন্তু একজন বোকাকে চেনা অত সহজ নয়।”

বীরবল উত্তর দিলেন, “না, না! একজন জ্ঞানীর চেয়ে একজন বোকাকে চেনা বেশি সহজ।”

আকবর বললেন, “হুম! যদি তুমি আগামীকাল বিকেলের মধ্যে আমাকে আটজন বোকা খুঁজে এনে দেখাতে পারো, আমি তাদের উপহার ও পুরস্কার দেব। তোমার জন্যও একটি পুরস্কার থাকবে।”

আর তাই পরদিন, উজ্জ্বল শীতের সকালে, বীরবল বোকাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।



প্রথম যে ব্যক্তিকে তিনি দেখতে পেলেন, তিনি একটি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। লোকটির মাথার ওপর একটি বিশাল বোঝা ছিল। "আপনি আপনার বোঝাটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?" বীরবল তাকে জিজ্ঞেস করলেন। "এটি গাধার পিঠে তুলে দিচ্ছেন না কেন?"

"আমার এই গাধাটি বহু বছর ধরে আমার সেবা করে আসছে," লোকটি উত্তর দিল। "এখন এটি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এর শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ আমি চাই না যে এটি বাড়তি কোনো বোঝা বহন করুক।"

বীরবল হেসে উঠলেন। "আজ বিকেলে রাজদরবারে চলে আসুন," তিনি বললেন।

"মহারাজ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।" এই বলে তিনি নিজের পথে এগিয়ে চললেন।

কিছুক্ষণ পর, তিনি এক কৃষক আর তার ছেলের দেখা পেলেন। তারা ক্ষেতের মধ্যে কিছু একটা খুঁজছিল। বীরবল তাদের কাছে গেলেন। "আপনারা কী খুঁজছেন?" তিনি জানতে চাইলেন।

"আমরা আমাদের জমানো টাকা-পয়সা এই জায়গায়ই কোথাও পুঁতে রেখেছিলাম," কৃষকটি বলল। "আমরা সেটাই খুঁজছি।"

"কিন্তু জায়গাটি চিনে রাখার জন্য আপনারা কি কোনো চিহ্ন রাখেন নি?" বীরবল জিজ্ঞেস করলেন।

"ক্ষেতের মধ্যে একটি ময়ূর নাচছিল। আমরা ঠিক তার কাছেই একটি গর্ত খুঁড়েছিলাম," ছেলেটি উত্তর দিল।

বীরবল হেসে উঠলেন এবং তাদের রাজদরবারে আসতে বললেন। এরপর তিনি আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড! রাস্তার মাঝখানে দুজন লোক মারামারি করছিল। "থামুন! থামুন!" বীরবল তাদের মিনতি করে বললেন। "আপনারা মারামারি করছেন কেন?"

লোকদুটির একজন বলল, "এই লোকটা! আমি ওকে বলেছিলাম যে, আমাদের যদি একটা বলদ থাকত, তবে বেশ ভালো হতো। আর অমনি ও আমাকে হুমকি দিয়ে বসল যে, ও নাকি ওর বাঘ দিয়ে আমার বলদটাকে আক্রমণ করাবে!" অপর লোকটি বলল, "নিশ্চয়ই, আমি তো তাই করবই—

আমি আমার বাঘ দিয়ে তোমার ষাঁড়টাকে খাওয়াবো।" বীরবল চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাঘটা কোথায়?"

প্রথমজন বলল, "আমরা ঈশ্বরের কাছে বর চাইতে যাচ্ছিলাম। আমি যখন একটা ষাঁড় চাইতে যাচ্ছিলাম, তখন এই লোকটা একটা বাঘ চাইল। ও কেন চায় আমার ষাঁড়টা মরে যাক?" বীরবল হেসে উঠলেন। তিনি ওদের দুজনকেই রাজপ্রাসাদে আসতে বললেন।

একটু এগিয়ে যেতেই, সামনে, একজন লওকের দেখা পাওয়া গেল, সে একটা কাদা-জলে ভরা ডোবায় পড়ে গিয়েছিল। লোকটি দু'হাত শূন্যে তুলে রেখেছিল। বীরবল তাকে তুলতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালেন। লোকটি বলল, "আমার হাতে হাত দেবেন না! আমি যে আলমারিটা বানাচ্ছি, তার মাপ এইমাত্র শেষ করলাম। আপনি যদি আমার হাত সরিয়ে দেন, আমি আলমারিটা কতটা চওড়া ভুলে যাব।"



বীরবল তাকে প্রাসাদে আসতে বললেন।

তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত সভাসদ সমবেত হয়ে গেছিলেন। বীরবলের নির্বাচিত ছয়জন লোক তাদের সবাইকে ব্যাখ্যা করছিল, বীরবল তাদের কী করতে দেখেছিলেন।

সবাই হেসে উঠলে, লোকগুলো হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

সবার শেষে আকবরের দেওয়া উপহারগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং তারা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তারা সবাই চলে গেলে, আকবর বীরবলের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার জন্য কোনো পুরস্কার নেই!" "আমি আটজন বোকা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এনেছ মাত্র ছয়জন!"

বীরবল উত্তর দিলেন, "আপনার জন্য এই বোকাদের খুঁজতে গিয়ে আমি অর্ধেক দিন নষ্ট করেছি। তাহলে আমি হলাম সপ্তম বোকা! আর অষ্টম বোকা হল........" তিনি থেমে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"....ম, ম, মানে আমি নিজে ছাড়া আর কেউ নই, কারণ আমিই তোমায় এমন এক অদ্‌ভুতুড়ে অভিযানে পাঠিয়েছিলাম!" আকবর বললেন।

প্রাসাদ হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

ছোট ছাগলছানার অভিযান

এক বনের ভেতর একটি গুহায়, এক ছোট্ট ছাগলছানা তার বাবা ও মায়ের সাথে বাস করত। এই ছোট ছাগলছানাটির মনে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে জগত ঘুরে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে সাবধান করে রেখেছিল, "বনে সিংহ আর বাঘ ঘুরে বেড়ায়। তাই তুমি কখনোই একা একা বাইরে বের হবে না!"

একদিন সেই ছোট ছাগলছানাটির ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। তার বাবা-মা তখন খাবারের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল। "আর কতক্ষণ আমাকে এভাবে ভেতরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?"— তার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল।

ভয়ে ভয়ে সে গুহার বাইরে উঁকি দিল। পাখিরা গান গাইছিল। গাছের ডালে কাঠবিড়ালিরা কিচিরমিচির করছিল। মৃদু বাতাস পাতাগুলোকে যেন নাচের তালে মাতিয়ে তুলেছিল। এসব দেখে ছোট্ট ছাগলছানাটি মুগ্ধ হয়ে গেল! সে আপনমনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

গাছের সারির মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, ছাগলছানাটি বনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বনের একএকটি নতুন দৃশ্য তাকে আরও আরোও সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবেই সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এভাবেই কখন যেন চারদিকে অন্ধকার হয়ে এল।

এবার তো ঘরে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছোট ছাগলছানাটি তো বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছিল! এখন সে কী করবে? সে এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর লুকিয়ে থাকার মতো একটি নিরাপদ জায়গার খোঁজ করতে লাগল।





ওহ! এই তো একটা গুহা! ছোট্ট ছাগলছানাটি গুহার ভেতরে উঁকি দিল। গুহাটি ছিল একদম খালি। সে ঠিক করল, ওখানেই অপেক্ষা করবে। এই তো, এই বুঝি তার মা-বাবা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ল বলে। ছোট্ট ছাগলছানাটি তার অন্তরের গভীরে এ কথা জানত।

কিন্তু সে যা জানত না, তা হলো—এটি ছিল একটি শিয়ালের গুহা! শিয়ালটি বাইরে গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে ফিরে এল। গুহার ভেতরে অন্য কোনো প্রাণীর উপস্থিতি টের পেয়ে সে গুহার মুখে থমকে দাঁড়াল এবং হাঁক দিয়ে বলল, "কে ওখানে! আমার গুহা থেকে বেরিয়ে আয়!"

আহা! বাবা-মায়ের সান্নিধ্যের জন্য ছাগলছানাটির মন তখন কী ভীষণই না আকুপাকু করছিল! কিন্তু ঠিক তখনই তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে খুব গম্ভীর ও ভারী গলায় জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করল: "কে ওখানে! আমি যে স্বয়ং সিংহরাজের কাকা! রাতের খাবারে আমি বাঘ চিবিয়ে খাই। যা, গিয়ে আমার জন্য পঞ্চাশটা বাঘ ধরে নিয়ে আয়!"

কথাটা শুনে শিয়ালটি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। "সর্বনাশ! আমার গুহার ভেতরে তো দেখি এক রাক্ষস এসে আস্তানা গেড়েছে!"—মনে মনে ভাবল সে। তাই সে দৌড়ে বাঘদের সর্দারের কাছে গেল।

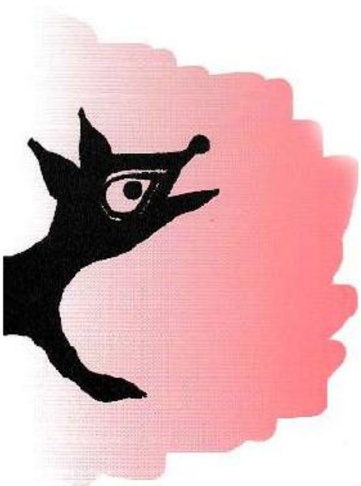


"বাঘমামা!" সে চিৎকার করে উঠল, "আমার বাড়িতে এক ভীষণদর্শন প্রাণী এসে ঘাঁটি গেড়েছে! সে নাকি খাওয়ার জন্য পঞ্চাশটা বাঘ চাইছে!"

"পঞ্চাশটা বাঘ খেয়ে ফেলতে পারে—এমন প্রাণী আবার কেমনতর?"

"বাঘ মামা, হ্যাঁ, সে অনেক বড়!" বলল শেয়ালটা।
"আমি ওটাকে তাড়িয়ে দেব," ঘোষণা করল বাঘের দলপতি।
"এবার আমাকে ওখানে নিয়ে চলো তো দেখি!"





এদিকে, মা ও বাবা ছাগল তাদের বাচ্চাকে খুঁজছিল। তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাচ্চার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে শেয়ালের গুহায় পৌঁছে গেল। কী এক আনন্দময় সাক্ষাৎ! কিন্তু এখন বাচ্চাটা তাদের সব ঘটনা বলল। সে তাদের সতর্ক করে দিল যে শেয়ালটা শীঘ্রই ফিরে আসবে। এমনকি সে একটা বাঘকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে! ছাগলদের পালানোর একটা পরিকল্পনা দরকার ছিল। তারা ভাবল, কথা বলল এবং আরও ভাবল।

একটু পরেই শেয়ালের ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল। আর এই নতুন শব্দটা কিসের? একটা লম্বা, নিচু গর্জন! ধীরে ধীরে সেটা কাছে আসতে লাগল। গর্জন আরও জোরালো হতে লাগল। শীঘ্রই সেই শব্দে গুহাটা ভরে গেল! তিন ছাগল ভয়ে গুহার আরও ভেতরে সিঁধিয়ে গেল!



শেয়ালটা আবার তার গুহায় অচেনা প্রাণীদের উপস্থিতি টের পেল। কিন্তু সে কিছু বলার বা করার আগেই, একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শোনা গেল: "আহ্! আহ্!" মা ছাগলটা বাচ্চাটার কান ধরে টানছিল!

এবার বাবা ছাগলটা গম্ভীর গলায় বলল: "কাঁদছিস কেন, সোনা?" মা ছাগলটাও তার গলার স্বর পাল্টে বলল: "আমাদের মিষ্টি বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে!" "ও এর মধ্যেই একটা হাতি, একটা ভালুক আর একটা মহিষ খেয়ে ফেলেছে। শেষ পাতে মিষ্টি হিসেবে ও একটা সুস্বাদু বাঘ চায়!"

"ব্যস, এইটুকুই?" বাবা বলল। "একটু অপেক্ষা কর! আশেপাশে নিশ্চয়ই অনেক বাঘ আছে। আমি একটা শেয়ালকে অনেক বাঘ নিয়ে আসতে বলেছি!"

সেই শুনে, শেয়াল আর সর্দার বাঘ দুজনেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। "বলে কি!! বাচ্চাটা হাতি, ভালুক আর মহিষ গিলে ফেলেছে?" সর্দার বাঘ বলল।

"আমি যদি গুহায় যাই, আমার কী হবে?" এই বলে সে যত জোরে পারল দৌড়ে পালাল।

আর শেয়ালটা? তোমরাই বল, সে কি এরপর কী হয় তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারে?

একটি ভারতীয় লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

শ্রবণ কুমার

শ্রবণ কুমারের বাবা-মা ছিলেন বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। তবে শ্রবণ কুমারের মতো একজন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পুত্র তাঁদের ছিল। শ্রবণ তাঁদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সেবা করত। সে তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করত। একদিন, শ্রবণের বাবা-মা তাঁদের জীবনের শেষ তীর্থযাত্রায় যাবার গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শ্রবণ তাঁদের নিরাপদে ভ্রমণের উপায় খুঁজে বের করার কথা ভাবতে লাগল। সে দিন-রাত কেবল এই নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল।

অবশেষে, সে একটি পরিকল্পনা করল এবং অবিলম্বে সেই অনুযায়ী কাজে লেগে গেল। প্রথমে, সে একটি মজবুত বাঁশের সাথে দুটি বড় ঝুড়ি বেঁধে দিল। এরপর, সে তার বাবা-মাকে সেই ঝুড়ি দুটির ভেতর তুলে দিল।



এবার সে বাঁশটি নিজের কাঁধে তুলে নিল। এখন তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত!

তারা যখন যাত্রা শুরু করল, তখন গ্রামের অন্য বাসিন্দারা তাদের অনেক আশীর্বাদ করলেন এবং উপহার হিসেবে তাদের অনেক ফল ও ফুল দিলেন।



শ্রবণ তার বাবা-মাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল, বিভিন্ন শহর, পাহাড়-পর্বত এবং নদ-নদীর ওপর দিয়ে তারা চলতে লাগল। আর তারা যেখানেই যেতেন, সেখানেই মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহৃদয়তা পেতেন। "এ যেন এক বিস্ময়!"—মানুষজন সবিস্ময়ে বলে উঠত।

শ্রবণের শান্ত মুখচ্ছবি এবং তার বাবা-মায়ের মুখে ফুটে ওঠা স্নিগ্ধ হাসি দেখে মানুষের চোখে জল এসে যেত।

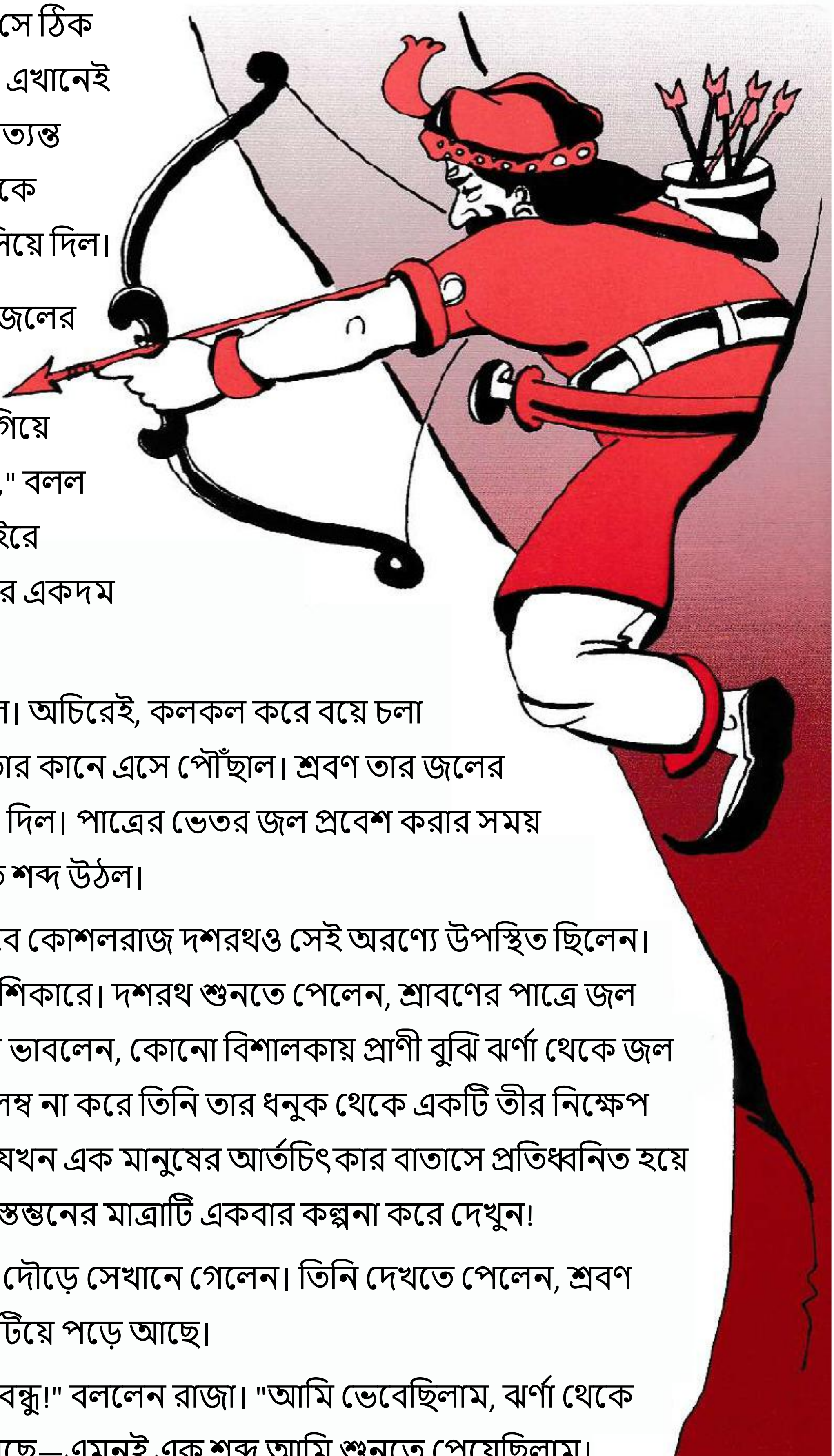
শ্রবণের মনে গভীর ইচ্ছা জাগত যে, তারা যেসব চমৎকার স্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সেখানকার মানুষজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো তার বাবা-মাও যদি দেখতে পেতেন! তাই সে তাদের কাছে সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করার চেষ্টা করত। আর তার বাবা-মাও সেই বর্ণনা শুনতে বেশ আনন্দ পেতেন।

সবরকম বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, এটি ছিল একটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক যাত্রা।

একদিন তাদের যাত্রাপথে পড়ল এক গভীর অরণ্য। তার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হলেন তাঁরা। কী অপূর্ব স্থান সেটি! পাখির কলকাকলিতে চারপাশের বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। হরিণের দল লাফালাফি করতে করতে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। খরগোশেরা তাদের গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল আর ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোমল ফার্ন লতাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছিল। পথ চলতে চলতে শ্রবণ তার বাবা-মায়ের কাছে এই সবকিছুই বর্ণনা করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ করেই পাখির গানের সুর ছাপিয়ে সেখানে এক আতঙ্কের চিৎকার শোনা গেল। হরিণের দল ভয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালাল। খরগোশগুলোও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই দেখে শ্রবণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলতে লাগল।

এখানে তাদের জন্য কি কোনো বিপদ অপেক্ষা করছিল? সে ঠিক করল, আজ রাতের মতো এখানেই যাত্রাবিরতি করবে। সে অত্যন্ত যত্নসহকারে তার বাবা-মাকে একটি গাছের গোড়ায় বসিয়ে দিল।



ওহ, সর্বনাশ! তাদের জলের পাত্রটি যে একেবারে খালি হয়ে গেছে! "আমি গিয়ে কিছুটা জল নিয়ে আসছি," বলল শ্রবণ। "আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব, আপনারা দয়া করে একদম চুপচাপ বসে থাকবেন।"

সে দৌড়ে বেড়িয়ে গেল। অচিরেই, কলকল করে বয়ে চলা একটি ঝর্ণার সুমধুর শব্দ তার কানে এসে পৌঁছাল। শ্রবণ তার জলের পাত্রটি ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে দিল। পাত্রের ভেতর জল প্রবেশ করার সময় 'গলগল' করে এক অদ্ভুত শব্দ উঠল।

সেদিন কাকতালীয়ভাবে কোশলরাজ দশরথও সেই অরণ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে এসেছিলেন শিকারে। দশরথ শুনতে পেলেন, শ্রাবণের পাত্রে জল ভরে ওঠার সেই শব্দ। তিনি ভাবলেন, কোনো বিশালকায় প্রাণী বুঝি ঝর্ণা থেকে জল পান করছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি তার ধনুক থেকে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন এক মানুষের আর্তচিৎকার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তখন তার বিস্ময় ও স্তম্ভনের মাত্রাটি একবার কল্পনা করে দেখুন!

শব্দ লক্ষ্য করে দশরথ দৌড়ে সেখানে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, শ্রবণ সেখানে আহত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

"আমাকে ক্ষমা করো, বন্ধু!" বললেন রাজা। "আমি ভেবেছিলাম, ঝর্ণা থেকে কোনো প্রাণী জল পান করছে—এমনই এক শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তো আসলে তাকেই লক্ষ্য করে তীর ছুড়েছিলাম।"

শ্রবণ অত্যন্ত কষ্ট করে কোনোক্রমে বলল, "আমার জন্য আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। বরং এই জলের পাত্রটি নিয়ে আমার বাবা-মায়ের কাছে যান। তারা ভীষণ তৃষ্ণার্ত। আপনি তাদের কাছে গিয়ে জল পান করতে সাহায্য করুন; কারণ তারা অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন।"

"কিরকম রত্ন এই স্নেহপ্রবণ পুত্র!" ভাবলেন দশরথ। "কীভাবে সে তার পিতামাতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে! আর আমি—আমি নিজেই কিনা এমন এক মহৎ মানুষকে বাণবিদ্ধ করেছি!"

শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন দশরথ।

"তাড়াতাড়ি করুন! এই জলটুকু নিয়ে যান!" এই বলেই শ্রবণ প্রাণত্যাগ করল। দশরথ শ্রবণের নিথর দেহটি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অন্য হাতে তুলে নিলেন জলের পাত্রটি। ধীর পায়ে তিনি সেই পথ ধরে এগোতে লাগলেন, যে পথ ধরে শ্রবণ ঝর্ণার দিকে গিয়েছিল।

তাঁর পায়ের শব্দ শুনে শ্রবণের পিতামাতা ডেকে উঠলেন, "অবশেষে তুমি এসেছ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমরা তোমার জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলাম!"

মহারাজ দশরথ লজ্জায় অধোবদন হলেন! কম্পিত হস্তে তিনি জলের পাত্রটি শ্রবণের পিতামাতার হাতে তুলে দিলেন। এরপর তিনি তাঁদের শ্রবণের মৃত্যুর সংবাদ জানালেন।

শ্রবণের পিতামাতা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের বুকফাটা আর্তনাদ সমগ্র অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দশরথ তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন; তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন থেকে আপনারা কি আমাকেই আপনাদের পুত্র হিসেবে মেনে নেবেন? দয়া করে আপনারা আমার সাথে চলুন আর আমার পরিবারের সাথে এসে থাকবেন চলুন।"

কিন্তু তাঁরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁরা বললেন, "এই শোক আমাদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। শ্রাবণকে ছাড়া আমরা আর বেঁচে থাকতে পারব না।" এরপর তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "একদিন যখন তোমার নিজের প্রিয় পুত্র গৃহত্যাগ করবে, তখন তুমি আমাদের এই যন্ত্রণার গভীরতা বুঝতে পারবে।" এই বলে তাঁরাও প্রাণত্যাগ করলেন।

বহু বছর পর, এক চরম পরিস্থিতির কারণে দশরথ ও তাঁর পুত্র রামের বিচ্ছেদ ঘটল। দশরথ তাঁর সেই শোক সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন শ্রবণের পিতামাতার সেই কথাগুলো তাঁর কানে বারবার বাজতে লাগল।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

91

বাঁশির সুর

একদা পিং নামের এক ধনী বণিক বাস করতেন। বেচারা! তাঁর কাছে এত বেশি টাকা ছিল যে, সেই টাকা দিয়ে কী করবেন, তা-ই তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না।

সারাদিন তিনি কেবল টাকাপয়সার হিসাব-নিকাশ নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন তাঁকে খেলার জন্য ডাকত, তখন তিনি উত্তর দিতেন, "সময় নেই, একদম সময় নেই!"

পিংয়ের স্ত্রী তাঁকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতেন। তিনি বলতেন, "তুমি ঠিকমতো খাও না, ঘুমোও না। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো, তবে কী হবে? তোমার সব পরিশ্রমই তো বৃথা হয়ে যাবে!"

পিংয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই এক চিলতে জমিতে একটি ছোট কুঁড়েঘর ছিল। সেই কুঁড়েঘরে লি এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের দুই সন্তানকে নিয়ে বাস করতেন। লি ছিলেন একজন দিনমজুর। প্রতিদিন ভোরবেলা তিনি কাজের সন্ধানে মাঠে বেরিয়ে পড়তেন। গোধূলিলগ্নে তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।

কিন্তু গরম জলে স্নান সেরে এক কাপ চা পান করার পর, লি নিশ্চিন্তে বসে তাঁর বাঁশি বাজাতেন । তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা তখন গান গাইত আর নাচত। তাঁদের সবার কাছেই সেই সময়টুকু ছিল দিনের সেরা মুহূর্ত।

একদিন পিংয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বললেন, "ওগো, লি এবং তাঁর পরিবারটি তো খুবই গরিব; অথচ তাঁদের কন্ঠস্বরে কী অপার আনন্দের সুর! আমরা কেন লি-এর মতো এত আনন্দে থাকতে পারিনা?"





পিং মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। তারপর বললেন, "ওরা আনন্দে থাকে, কারণ ওদের হাতে অফুরন্ত সময় আছে।"

তিনি লি-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "ওহে, আমি দিনের পর দিন তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।" এই বলে তিনি লি-এর হাতে মুদ্রায় পূর্ণ একটি থলে তুলে দিলেন এবং বললেন, "দয়া করে তোমার প্রতিবেশী ও বন্ধু হিসেবে আমার এই উপহারটি গ্রহণ করো।"

কিন্তু হায়! যে মুহূর্তটিতে লি টাকার থলেটি হাতে পেলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর মনের সব শান্তি উধাও হয়ে গেল। তিনি বারবার মুদ্রাগুলো গুনতেন; কিন্তু প্রতিবারই গুনে শেষ করার আগেই ভুল করে ফেলতেন এবং আবার প্রথম থেকে গোনা শুরু করতেন। লি-এর স্ত্রী কিংবা মেয়েরা যখন তাঁর হাতে বাঁশিটি তুলে দিতে আসত, তখন তিনি কেবল একটি কথাই বলতেন—"সময় নেই! আমার হাতে একদম সময় নেই!"

এরপর নতুন এক সমস্যার উদয় হল। লি এখন এই টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? তিনি একবার টাকাগুলো একটি হাঁড়িতে রাখলেন, একবার বাক্সে ভরলেন, আবার কখনো বা ঘরের তাকে তুলে রাখলেন। শেষমেশ, তিনি টাকার থলেটি দড়ি দিয়ে বেঁধে কুয়োর ভেতর নামিয়ে রাখলেন।



পরদিন আবার নতুন এক দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। তিনি ভাবতে লাগলেন, "আমি আমার এই ধনসম্পদ কীভাবে খরচ করব? আমি কি একটি বলদ কিনব? নাকি একটি লাঙল?" তিনি কুয়োর ভেতর থেকে টাকার থলেটি টেনে তুললেন, মুদ্রাগুলো রোদে শুকাতে দিলেন এবং পুনরায় সেগুলো গুনতে বসলেন। সেদিন গভীর রাতে তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুতে গেলেন।



সময় গড়িয়ে চলল। লি মুদ্রাগুলো গুনতেন, সেগুলো এদিক-সেদিক করতেন এবং কীভাবে খরচ করা যায়, তার পরিকল্পনা করতেন । আর দিনের শেষে তিনি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে, বাঁশি বাজানোর আর কোনো শক্তিই তাঁর থাকত না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, পুরনো অভ্যাসের টানেই লি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বুক ভরে তাজা বাতাস গ্রহণ করলেন এবং সকালের রোদে তার ব্যথাতুর হাড়গুলোকে উষ্ণ হতে দিলেন। তার স্ত্রীও এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। "টাকাই সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু নয়, স্বামী," তিনি বললেন। লির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও যোগ করলেন, "ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতাই হল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।"



হঠাৎই লি বুঝতে পারলেন তাঁর কী করা উচিত!

তিনি সেই পুরো দিনটি বাঁশের কঞ্চি কাটা আর সেগুলোকে চকচকে করার কাজে ব্যয় করলেন ; যতক্ষণ না তিনি এক ডজন চমৎকার বাঁশি তৈরি করে ফেললেন । তিনি সেই বাঁশিগুলো এবং মুদ্রার থলেটি নিয়ে পিং-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। "এই টাকা আমার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে," পিং-এর হাতে থলেটি তুলে দিতে দিতে তিনি বললেন। এরপর তিনি পিং-কে বাঁশিগুলো দিলেন। "দয়া করে আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ এগুলো গ্রহণ করো," তিনি বললেন।

কিন্তু পিং এবং তার স্ত্রী কেবল নিজেদের কাজে ফিরে গেলেন।

হঠাৎই পিং-এর ভাগ্য বদলে গেল। তাঁর হাতে গোনার মতো আর কোনো টাকাই অবশিষ্ট রইল না! সময় যেন এক ভারী বোঝার মতো তার হাতের ওপর চেপে বসল। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন, তাকের ওপর একটি বাঁশি অবহেলায় পড়ে আছে। পিং সেটি তুলে নিলেন এবং বাজাতে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও পরম আনন্দে তার সাথে যোগ দিল।

এরপর থেকে, পিং এবং তার পরিবারের সবাই প্রতি রাতে বাঁশি বাজাতেন। পিং তার সন্তানদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তকে মন ভরে উপভোগ করতে শিখলেন।

কারণ প্রবাদেই তো আছে—"সবচেয়ে বড় ধন সোনা নয়, আনন্দ।"

চীনের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

রাজা ও কাঠবিড়ালি

একদা এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। আহা, কত যুদ্ধই না তিনি করেছিলেন! কত ধনসম্পদই না তিনি জয় করেছিলেন! ইতিহাসের খুব কম শাসকেরই তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেত। একদিন রাজপ্রাসাদের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রাজা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে বললেন, "আমার সামনে কেউ যেন নিজের বড়াই না করে। কারণ, আমি সব দিক থেকে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"



বৃদ্ধ মন্ত্রী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। "আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ!" তিনি বললেন। "মানুষ তাদের সাফল্যের বড়াই করতে ভালোবাসে। এতে দোষের কী আছে? তারা যদি আপনার সামনে গর্বিত হয়ে কথা বলেও থাকে, তবে তা উপেক্ষা করুন। এটি অতি তুচ্ছ একটি বিষয়।"

রাজা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন! ঠিক তখনই একটি কর্কশ শব্দ তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। একটি কাঠবিড়ালি গাছের ডালে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিচিরমিচির করছিল। তার থাবায় ধরা ছিল একটি মুদ্রা।



রাজা কৌতূহল নিয়ে কাঠবিড়ালিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ সেটি গান গেয়ে উঠল!

"ধনসম্পদের এই খেলায়, এ তো স্পষ্ট সবার কাছে—

স্বয়ং রাজাও আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত আজ!"

এই অর্থহীন গান শুনে বিরক্ত হয়ে রাজা কাঠবিড়ালিটিকে ধরার জন্য লাফিয়ে উঠলেন; কাঠবিড়ালিটি তখন তার মুদ্রাটি ফেলে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। রাজা ক্ষিপ্রতার সাথে মুদ্রাটি লুফে নিলেন এবং মন্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন—ততক্ষণে তাঁর মেজাজ আবার ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। "আমি আপনার পরামর্শই মেনে চলব," তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যখন রাজা তাঁর অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই সেই কাঠবিড়ালিটি আবার সেখানে হাজির হল! সেটি ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে নামল এবং গান গেয়ে উঠল—

"রাজা আমার মুদ্রাটি চুরি করে নিয়েছেন!

এ কথা আমি গাইব, গাইব আর গাইতেই থাকব!"

বেচারা রাজা! নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে তিনি কাঠবিড়ালিটিকে তাড়া করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু সব অতিথি তখন তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। অত্যন্ত কষ্টে তিনি নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন। কী ভাগ্যবান সেই কাঠবিড়ালি!

রাজপ্রাসাদে সকালবেলা ছিল দান-খয়রাতের সময়। পরদিন সকালে কাঠবিড়ালিটি রাজপ্রাসাদের ফটকে এসে গান ধরল—

"কী গর্বের সাথেই না রাজা গরিবদের মাঝে তাঁর ধনসম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছেন!

আর আজ, আমার সেই মুদ্রার সুবাদেই তিনি আরও বেশি দান করতে পারছেন!"

"কেউ কি ওই কাঠবিড়ালিটাকে ধরতে পারবে?" রাজা গর্জন করে উঠলেন। কিন্তু কাঠবিড়ালিটি ততক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে গেছে।





দুপুরের খাবারের সময় সেটি আবার এল এবং গান গেয়ে উঠল—

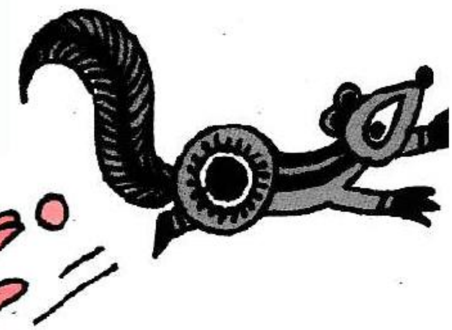
"ও মহারাজ! আমি দেখছি আপনি বেশ তৃপ্তি নিয়েই উপভোগ করছেন—

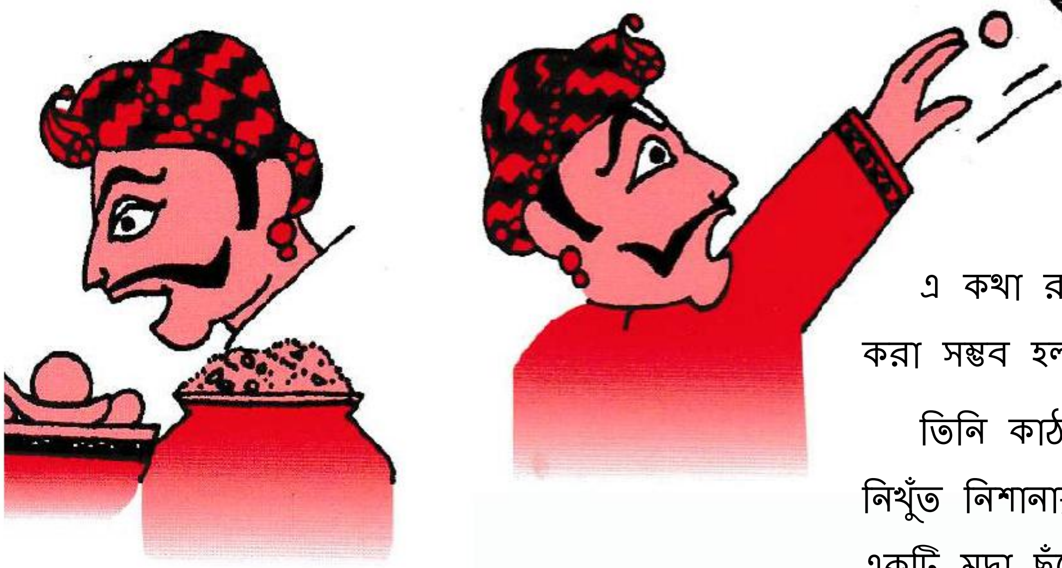
সেই খাবার, যা আপনি কিনেছেন আমারই মুদ্রা দিয়ে!"

রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি কাঠবিড়ালিটিকে জাপটে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটি তাঁর নাগালের বাইরে লাফিয়ে সরে গেল এবং দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে গেল। বিকেলের বাকি সময়টুকু তিনি এক নিদারুণ একাকীত্বের মধ্যে কাটালেন ।

চা-পানের সময় তিনি খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে একদম নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন এবং কাঠবিড়ালিটির আগমনের অপেক্ষায় রইলেন । দেখতে দেখতেই সেটি এসে হাজির হল এবং গেয়ে উঠল:

"খাও, খাও, ওগো রাজা! আমার ধনসম্পদ কীভাবে খরচ করবে তার ফন্দি আঁটতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি কোরো না!"





এ কথা রাজার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না।

তিনি কাঠবিড়ালিটিকে লক্ষ্য করে নিখুঁত নিশানায়, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে একটি মুদ্রা ছুঁড়ে মারলেন।

কাঠবিড়ালিটি ক্ষিপ্রতার সাথে ছুঁড়ে মারা মুদ্রাটির পাশ কাটিয়ে সরে গেল। তারপর সেই মুদ্রাটি কুড়িয়ে নিয়ে গেয়ে উঠল—

" তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন! তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন! আমার ভয়েই তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন!"

রাজা সারা রাত জেগে কাটালেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর মন্ত্রীকে বললেন, "আমি আমার রাজ্যকে কাঠবিড়ালিমুক্ত করব!" এই বলে তিনি তাঁর সেনাপতিদের তলব করার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, "কাঠবিড়ালির সংখ্যা অগণিত। আমরা কীভাবে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করব?"

"আমার সেনাবাহিনী পৃথিবীর সেরা," রাজা উত্তর দিলেন। "তারা সব কাঠবিড়ালিকেই খুঁজে বের করবে!"

মন্ত্রী তাঁকে আরও বোঝানোর চেষ্টা করলেন। "বেশ, কিন্তু সৈন্যদের কথা একবার ভাবুন। তারা কি এত ছোট ও অসহায় প্রাণীদের হত্যা করতে রাজি হবে? আর আপনি, মহারাজ— আপনি কি এমন একজন রাজা হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান, যিনি কাঠবিড়ালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন?"

মন্ত্রীর কথায় রাজার যুদ্ধ-পরিকল্পনার সেখানেই ইতি ঘটল। তিনি স্বীকার করে বললেন, "আমি তো তাহলে হাসির পাত্রে পরিণত হব! কিন্তু এখন আমার কী করা উচিত?"





"মহারাজ! কাঠবিড়ালিটিকে উপেক্ষা করুন!" মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন। "আপনি যদি শুরু থেকেই তা করতেন, তবে আপনার মানসিক শান্তিটুকু হারাতেন না।"

সকালের নাস্তার সময় যখন কাঠবিড়ালিটি কিচিরমিচির করতে করতে সেখানে এল, তখন রাজা গেয়ে উঠলেন—

"পৃথিবীর জ্ঞানীজনেরা বলে থাকেন যে—রাজা কাঠবিড়ালির সমকক্ষ নন!"

কাঠবিড়ালিটি তো হতবাক হয়ে গেল! সেটি নিঃশব্দে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল এবং এরপর আর কখনোই সেখানে তাকে দেখা গেল না।

একটি ভারতীয় লোককথা (মনোজ দাসের পুনর্কথনের ওপর ভিত্তি করে রচিত)

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

93 অসম্ভব সব গল্প

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। বনের সব প্রাণী তখন উৎসবে মেতেছিল। "সবাই এদিকে মনোযোগ দাও!" হাঁক দিয়ে উঠল ভালুক। "আজ রাতে আমাদের প্রধান অতিথি হবেন... বনের সবচেয়ে বয়স্ক প্রাণীটি! আপনি কি দয়া করে সামনে এগিয়ে আসবেন?"

"ওটা তো আমিই!" "না, আমিই সেই প্রাণী!"—চারদিক থেকে এমন সব চিৎকার ভেসে এল। বেশ কয়েকটি প্রাণী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভালুকের দিকে এগিয়ে এল।

ভালুকটি পড়ে গেল মহা বিপদে। সে এখন কীভাবে বুঝবে যে, আসলে কে সবচেয়ে বয়স্ক?

হঠাৎ বাঁদরের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। "চলো, আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি," সে বলল। "দেখা যাক, কে তার বয়সের আধিক্য বা প্রবীণতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস করাতে পারে।" বনের অন্য প্রাণীরাও এতে সায় দিল। এভাবেই শুরু হলো সেই প্রতিযোগিতা।





প্রথমে কথা বলল হাতি। সে বলল, "আমি যখন এই বনে এসেছিলাম, তখন এখানে অন্য কোনো প্রাণীই ছিল না। আমি একাই ঘুরে বেড়াতাম, একদম নিঃসঙ্গ হয়ে।"

"আহা!" ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে টিয়াপাখি বলে উঠল, "আমি যখন এই জায়গায় এসেছিলাম, তখন তো এখানে কোনো বনই ছিল না! আমিই তো নিজেই গাছগুলো লাগিয়েছিলাম এবং সেগুলোর যত্ন নিয়েছিলাম।"

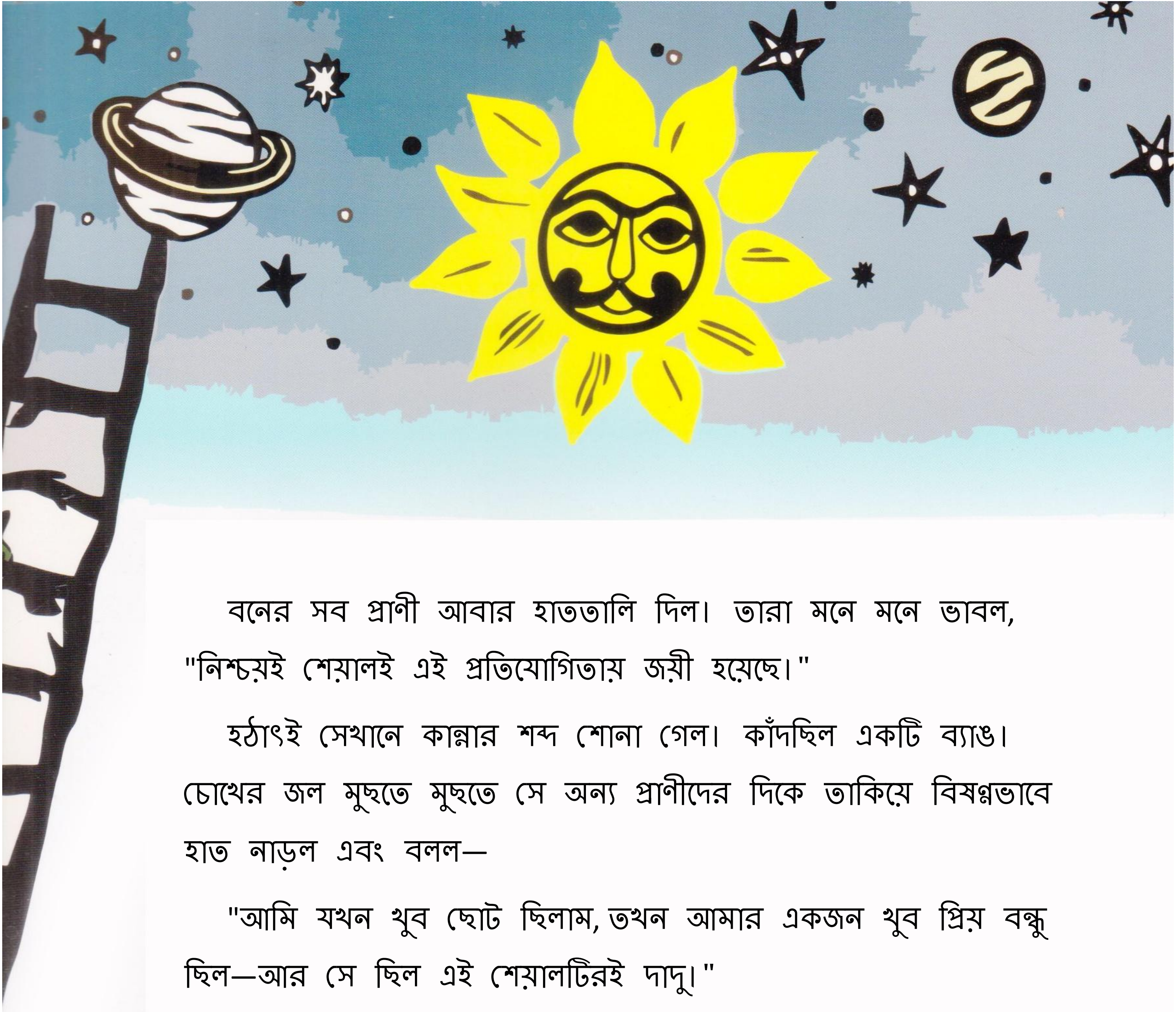
"একদম ঠিক কথা!" সামনে এগিয়ে এসে হরিণ বলল। "আমি নিজের চোখে তোমাকে বীজ বুনতে দেখেছিলাম! আমি তখন আকাশ থেকে মই বেয়ে নিচে নেমে আসছিলাম। আমি ঠিক সেই মুহূর্তেই সূর্য, চাঁদ আর তারাগুলোকে আকাশে টাঙানোর কাজ শেষ করে নেমেছিলাম।"

বনের সব প্রাণী হরিণের জন্য হাততালি দিল। তারা মনে মনে ভাবল, "এই তো আমাদের বিজয়ী!"

কিন্তু ঠিক তখনই শেয়াল তার বসার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। সে বয়সের ভারে ধীর-স্থির ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এল।

সে বলল, "হরিণ যে মই বেয়ে উপরে উঠে সূর্য, চাঁদ আর তারাগুলোকে আকাশে টাঙিয়েছিল—সেই মইটি কিন্তু আমিই বানিয়েছিলাম! আমিই গাছ কেটেছিলাম, মইয়ের দুই পাশের খুঁটি আর মাঝখানের ধাপগুলো তৈরি করে সেগুলোকে জোড়া লাগিয়েছিলাম। কী যে বিশাল একটা কাজ ছিল সেটা! আমি ঠিক সময়েই কাজ শেষ করে মইটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে হরিণ সেটা বেয়ে উপরে উঠতে পারে।"





বনের সব প্রাণী আবার হাততালি দিল। তারা মনে মনে ভাবল, "নিশ্চয়ই শেয়ালই এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে।"

হঠাৎই সেখানে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কাঁদছিল একটি ব্যাঙ। চোখের জল মুছতে মুছতে সে অন্য প্রাণীদের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হাত নাড়ল এবং বলল—

"আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার একজন খুব প্রিয় বন্ধু ছিল—আর সে ছিল এই শেয়ালটিরই দাদু।"

"একদিন আমার সেই বন্ধু আমাকে উপহার হিসেবে কিছু ফল দিয়েছিল।" সেই ফলের ভেতরেই ছিল সেই বীজ, যা থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই গাছ—যে গাছ দিয়ে শিয়াল বানিয়েছিল সেই মই, আর যে মই বেয়ে হরিণ উঠে গিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিল সূর্য, চাঁদ আর তারাদের!

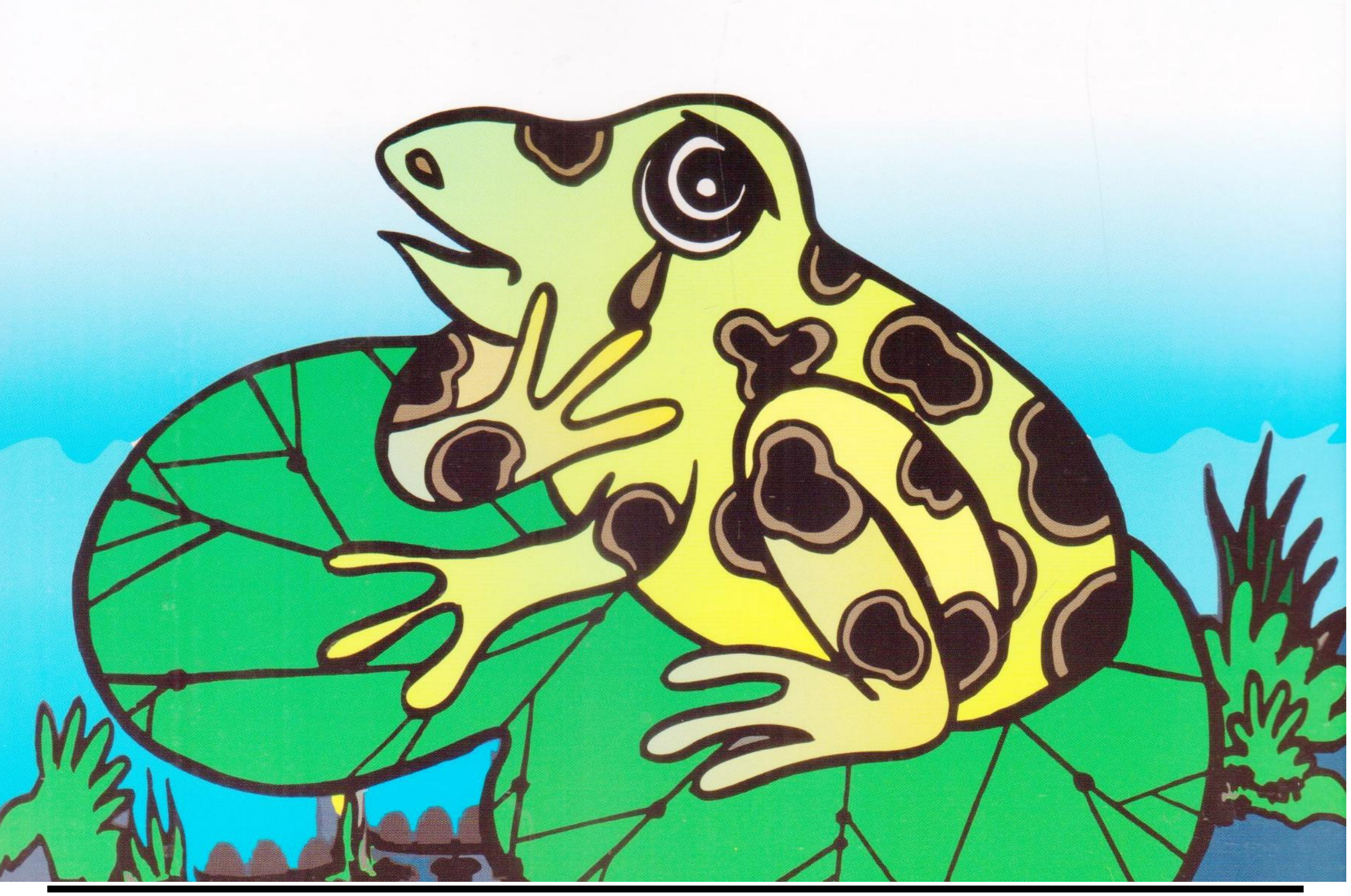
"আমার ছোটবেলার বন্ধুর সাথে কতদিন দেখা হয়নি! এখন আমার মনে ভিড় করে আসছে কত কত স্মৃতি! ঠিক এই কারণেই আমার চোখে জল।"

সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্যাঙের কথা শুনছিল। যখন ব্যাঙ কথা বলা থামাল, তখন এমনকি শিয়ালও নিজের চোখ থেকে অশ্রু মুছছিল। ব্যাঙের গল্প বলার জাদু ছিল এমনই!

সব পশু-পাখি একবাক্যে ব্যাঙকেই প্রধান অতিথি হিসেবে ঘোষণা করল। এবার ব্যাঙের চোখ থেকে সত্যিই জল গড়িয়ে পড়ল—তবে সে জল ছিল আনন্দের অশ্রু!

পূর্ণিমার সেই ভোজসভা ছিল অত্যন্ত জমকালো।

সব পশু-পাখিই সেই ভোজ দারুণ উপভোগ করল; তাদের অনেকেই দীর্ঘক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

টুপ-টাপ!

সেটা ছিল এক ঝড়ের রাত । বৃষ্টির ধারা গাছের ওপর সজোরে আছড়ে পড়ছিল। বাতাস গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোকে এদিক-সেদিক টেনে-হিঁচড়ে নাড়া দিচ্ছিল। গুহা আর গর্তের ভেতর প্রাণীরা ভয়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই...



একটি বাঘ বন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং গ্রামের দিকে ছুটে গেল। সে একটি কুঁড়েঘরের দেয়ালের পাশে আশ্রয় নিল।

দেয়ালের সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাঘটি শুনতে পেল এক বৃদ্ধা আপনমনে বিড়বিড় করে বলছেন, "এই 'টুপ-টাপ' আমাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিয়েছে !"

বৃদ্ধা যখন তাঁর টেবিল আর বাক্সগুলো জলের নাগাল থেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন সেগুলোর একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগছিল। "ধুম, ধাম, ঠক, ঠক!" সেই শব্দে কুঁড়েঘরের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। "এই 'টুপ-টাপ' আবার কী জিনিস?" ভয়ে মিউমিউ করে উঠল বাঘটি।

এদিকে ভোলোনাথ তার গাধাটিকে খুঁজছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে আর মুষলধারে বৃষ্টির কারণে তিনি কিছুই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলেন না। ওহ! দাদুর কুঁড়েঘরের পাশে ওটা কী দাঁড়িয়ে আছে? "ওটা নিশ্চয়ই আমার গাধা!" তিনি মনে মনে ভাবলেন।

ভোলোনাথ বাঘটির দিকে ছুটে গেলেন এবং তার কান মলে দিলেন। "আমি তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি!" তিনি চেঁচিয়ে বললেন। "দুষ্টু কোথাকার!" রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বাঘটির পিঠে চড়ে বসলেন। বাঘটিকে চলতে বাধ্য করার জন্য তিনি তার পাঁজরে লাথি মারতে লাগলেন।

এই সব নতুন অভিজ্ঞতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাঘটি ভোলোনাথের প্রতিটি আদেশ মেনে চলল। বাড়ি ফিরে ভোলোনাথ বাঘটিকে বেঁধে রাখলেন এবং ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালটা ছিল বেশ পরিষ্কার ও ঝলমলে। ভোলোনাথের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাঘটিকে দেখেই তিনি বিকট চিৎকার করে উঠলেন—"আআআআহ!" ভোলোনাথ দৌড়ে বাইরে এলেন। "ওওওওহ!" তিনিও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। দুজনে মিলে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এবার গ্রামের লোকজন দৌড়ে সেখানে এল। বাঘটিকে দেখেই তারাও ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারা যে যার মতো যেদিকে পারল, ছুটে পালাল।



বেচারা বাঘ! কী হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলাই না শুরু হলো! সে তাকে বাঁধা দড়িটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর দৌড়ে আবার বনের ভেতর পালিয়ে গেল।

এদিকে, ভোলোনাথের বাঘের পিঠে চড়ার খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিল। "আর আমি যে শুধু ওটুকুই করেছি, তা নয়!" তিনি গর্ব করে বললেন। "আমি তো বাঘটার কানও মলে দিয়েছিলাম!" বাঘের সাথে সাথেই তাঁর মনের ভয়ও উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি নিজেকে নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করছিলেন। তিনি কতই না সাহসী! বাঘের পিঠে সওয়ার!

ভোলেনাথের বাঘের পিঠে চড়ার খবর গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সেই খবর রাজার কানেও পৌঁছাল। কী এক বিস্ময়কর ঘটনা! তাঁরই রাজ্যে এমন একজন বীরের বসবাস!

রাজা ভোলেনাথকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভোলেনাথকে উপহারে ভরিয়ে দিলেন। "তুমি সত্যিই একজন মহান বীর!" তিনি ভোলেনাথকে বললেন। ভোলেনাথ গ্রামের একজন অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর প্রশংসা করত। ভোলেনাথ ছিলেন পরম তৃপ্ত!

কয়েক মাস কেটে গেল। হঠাৎ শত্রুবাহিনী রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজার সেনাবাহিনী চরম সংকটে পড়ে গেল। রাজার মনে পড়ল ভোলেনাথের কথা। তিনি তাঁর ভৃত্যদের বললেন, "যাও, সেই বীরকে ডেকে আনো যে বাঘের পিঠে চড়েছিল। তাকে একটি যুদ্ধের ঘোড়া দাও। সে আমাদের শত্রুদের ধূলিসাৎ করে দেবে!“

রাজার আদেশ শুনে ভোলেনাথ তো হতবাক! "আমি তো একজন সাধারণ কৃষক মাত্র!" তিনি বললেন। "আমি কীভাবে একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করব?" কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না। তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন।



সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "আমি পড়ে যাচ্ছি!" তাঁর স্ত্রী একটি লম্বা দড়ি নিয়ে এলেন এবং ভোলেনাথের হাত, পা ও শরীর ঘোড়ার সাথে শক্ত করে বেঁধে দিলেন।

ঘোড়াটি বাতাসের বেগে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুটে চলল! বেচারা ভোলেনাথ জানতেনই না কীভাবে ঘোড়াটিকে থামাবেন! মরিয়া হয়ে তিনি একটি গাছের ডাল আঁকড়ে ধরলেন। পুরো গাছটিই গোড়া থেকে উপড়ে এল! সেটি তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতের মুঠোয় বিশাল এক বর্শার মতো শোভা পেতে লাগল। ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

শত্রুসৈন্যরা দেখল ভোলেনাথ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। "ওকে দেখ!" একজন বলল। "ও তো আস্ত একটা গাছকে বর্শা হিসেবে ব্যবহার করছে!" "ওর ঘোড়াটা তো আমার এযাবৎ দেখা সবচেয়ে হিংস্র ঘোড়া!" অন্য একজন বলল। আরেকজন সৈন্য বলল, "ওর যুদ্ধের হুঙ্কারটা শোনো! ও তো যেন ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের মতোই চিৎকার করছে!"



"ওহ! নিশ্চয়ই এ সেই বীর যে বাঘের পিঠে চড়েছিল!" তারা বুঝতে পারল। তারপর তারা সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যার মতো দৌড়ে পালাল।

অবশেষে, ঘোড়াটি এসে থামল। সেটি দাঁত দিয়ে সেই দড়িটি কেটে ফেলল যা দিয়ে ভোলেনাথকে ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। গাছটি ভোলেনাথের হাত থেকে খসে পড়ল এবং তিনি ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

"আমি বেঁচে আছি!" বিস্ময়ের সাথে তিনি মনে মনে ভাবলেন। তিনি ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিলেন এবং বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি কি আর কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়বেন? ক্লান্ত পায়ে পথ চলতে চলতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, লোকজন তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা বলাবলি করছিল—"এই তো সেই ব্যক্তি, যিনি একাই একটি আস্ত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন! অথচ দেখুন, তিনি কেমন সাধারণ মানুষের মতোই মাটিতে হেঁটে চলেছেন!" তাই তিনি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁকে নমস্কার জানাল।

একটি ভারতীয় লোককথা

© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

যুধিষ্ঠির ও যক্ষ

তাদের বারো বছরের দীর্ঘ নির্বাসনের প্রায় শেষ সময় তখন। তারা বনের ভেতর দিয়ে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করছিল। হরিণটি তাদের অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল...

ক্লান্ত পাণ্ডবরা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়লেন। বিষণ্ণ মনে তারা সেই হরিণটির কথা আলোচনা করতে লাগলেন, যা তাদের হাত ফসকে পালিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে, তাদের মন ভালো করার জন্য কোনো কাজের প্রয়োজন। তাই তিনি নকুলকে ডেকে বললেন—

"ভাই নকুল, আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।"

নকুল উঠে দাঁড়াল। "আমি গিয়ে জল নিয়ে আসছি," সে বলল।

সে একটি গাছে চড়ে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল। ওহ, কী সৌভাগ্য! কাছেই একটি পুকুর দেখা যাচ্ছে। সে গাছ থেকে নেমে সেই পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। পুকুরের পাড়ে পৌঁছাতেই সে তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। জল পান করার জন্য সে দুহাত অঞ্জলি করে ধরল। ঠিক তখনই চারপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল!

"থামুন! আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই কেবল আপনি জল পান করতে পারবেন," কণ্ঠস্বরটি বলল। কিন্তু নকুল সেই কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করল। সে এক অঞ্জলি জল পান করল। আর ঠিক তখনই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রাণ হারাল!





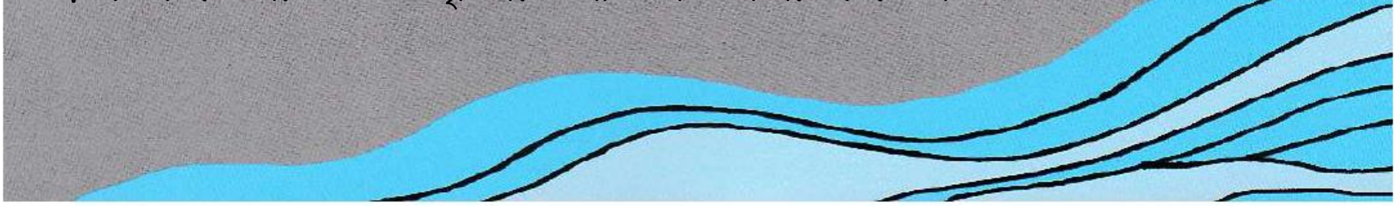
নকুল যখন আর ফিরে এল না, তখন যুধিষ্ঠির তাকে খুঁজতে সহদেবকে পাঠালেন। সহদেব সেই পুকুরটির কাছে পৌঁছাল এবং তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। সেও জল পান করার জন্য দুহাত অঞ্জলি করে ধরল। একটি কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিল। নিজের যমজ ভাইয়ের মতোই সহদেবও সেই কণ্ঠস্বরকে অগ্রাহ্য করল এবং জল পান করল। সে-ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রাণ হারাল!

এরপর এলেন অর্জুন। তিনি দেখলেন, তাঁর ভাইয়েরা মাটিতে নিথর হয়ে পড়ে আছেন। তিনি যখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাল। অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, এই সেই শত্রু যে তাঁর ভাইদের হত্যা করেছে!

"অদৃশ্য শত্রু! দেখে নে, আমি তোর কী দশা করি!" অর্জুন বললেন। ঠিক তখনই তিনিও তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। "একটু জল পান করে নিই, তারপরই তোর সাথে লড়াই হবে," তিনি বললেন। তিনি জল পান করলেন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারালেন।

উদ্বেগ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুধিষ্ঠির ভীমের দিকে ফিরলেন— "প্রিয় ভাই! মহাবীর অর্জুনও এখনো ফিরে আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো ভয়াবহ অঘটন ঘটেছে। দয়া করে তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, জলও নিয়ে এসো! আমি তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে বসেছি!" ভীম একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনি যখন পুকুরটির কাছে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন তাঁর ভাইয়েরা সেখানে মাটিতে পড়ে আছেন। হঠাৎই তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ভীম সেই কণ্ঠস্বরের হুমকিকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন এবং জল পান করলেন। তার ভাইদের মতোই সেও লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল।

অবশেষে যুধিষ্ঠির সেখানে এলেন—তৃষ্ণা আর উদ্বেগের তাড়নায় তিনি সেখানে ছুটে এসেছিলেন। ভাইদের নিথর দেহে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অঝোরে কাঁদতে ও বিলাপ করতে শুরু করলেন। তিনি ছুটে তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের মুখমণ্ডল স্পর্শ করলেন। "শুধুমাত্র এই পরিণতির জন্যই কি আমরা নির্বাসনের এতগুলো বছর সহ্য করেছিলাম? হায়, আমার হৃদয় যে ভেঙে যাচ্ছে! এমন পৃথিবীতে আমি আর কীভাবে বেঁচে থাকব!"



তখন এক গম্ভীর কন্ঠস্বর বলে উঠল, "তোমার অনুজ ভাইয়েরা আমার কথা অমান্য করে জল পান করেছিল। নিজেদের সেই ঔদ্ধত্যের মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। তুমি অন্তত, নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করার আগে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।"

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে, এটি ছিল এক যক্ষের কন্ঠস্বর।

"আপনার প্রশ্নগুলো করুন," তিনি বললেন।

যক্ষ: যারা বিপদে পড়ে তাদের কে রক্ষা করে?

যুধিষ্ঠির: সাহস।

-মানুষ কীভাবে জ্ঞানী হয়?

-জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে থেকে।

-পৃথিবীর থেকে বেশি কে লালন পালন করতে পারে?

-মা।

-বাতাসের থেকে বেশি দ্রুতগামী কে?

-মন।

-পথিকের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে?

-বিদ্যা।

-সুখ কী?

-মন ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য; সদাচরণ।

-সকলের ভালোবাসা পেতে হলে মানুষকে কী ত্যাগ করতে হয়?

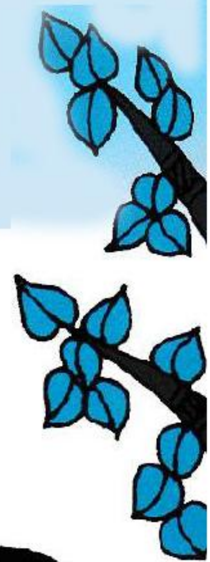
-অহংকার।

-কোন ক্ষতিতে দুঃখ নয়, বরং আনন্দ লাভ হয়?

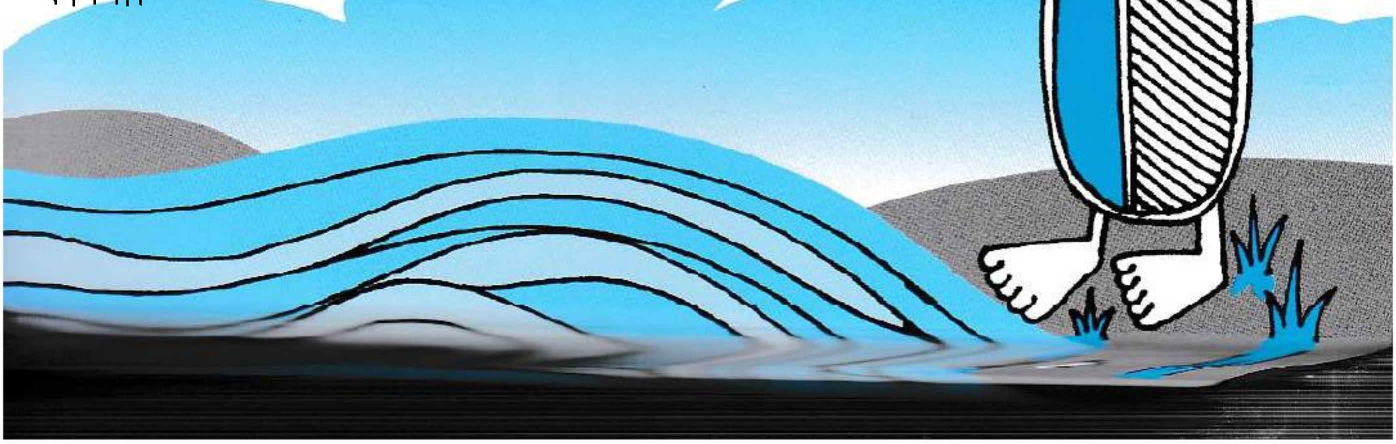
-ক্রোধ বর্জন করা ।

-ধনী হতে হলে মানুষকে কী ত্যাগ করতে হয়?

-কামনা।







-সাফল্যের প্রথম শর্ত কী?

-অক্লান্ত প্রচেষ্টা।



-লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ কোনটি?

-নিরাময় বা রোগমুক্ত অবস্থা।

-মৃত্যুর পর মানুষের সঙ্গী কে হয়?

-মৃত্যুর পর একমাত্র ধর্মই মানুষের সঙ্গী হয়।

-পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় কী?

-প্রতিদিন মানুষ জীবজন্তুকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, তবুও তারা নিজেরা চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

এভাবেই যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে একের পর এক বহু প্রশ্ন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেগুলোর সবকটির উত্তর দিলেন। পরিশেষে যক্ষ বললেন, "তোমার উত্তর শুনে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি! তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও। আমি তাকে পুনরায় জীবিত করে দেব।"

"নকুলই জীবিত হোক," যুধিষ্ঠির বললেন।

হঠাৎ সেই পরাক্রমশালী যক্ষ এক মূর্ত রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন! তিনি বললেন, "ধর্মরাজ! তুমি নকুলকে কেন বেছে নিলে? তোমার ভাই ভীমের দেহে ১৬,০০০ হাতির সমান শক্তি রয়েছে! তোমার ভাই অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বাদ দিয়ে তুমি কেন নকুলকেই বেছে নিলে?"

"কারণটি হলো এই," যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন। "আমার পিতার দুজন স্ত্রী ছিলেন—কুন্তী এবং মাদ্রী। আমি কুন্তীর সন্তান। আমি চাই মাদ্রীর সন্তানদের মধ্য থেকেও অন্তত একজন জীবিত থাকুক। তাই আমি নকুলের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।" "আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, যুধিষ্ঠির! তুমি সত্যিই একজন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি। তোমার প্রতিটি কর্মেই তুমি ধর্মকে অনুসরণ করো। তাই, আমি তোমার সকল ভাইয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি,"—এই কথা বলে যক্ষ উধাও হয়ে গেলেন।

রাজাজির মহাভারতের পুনর্কথন থেকে নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে রচিত।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

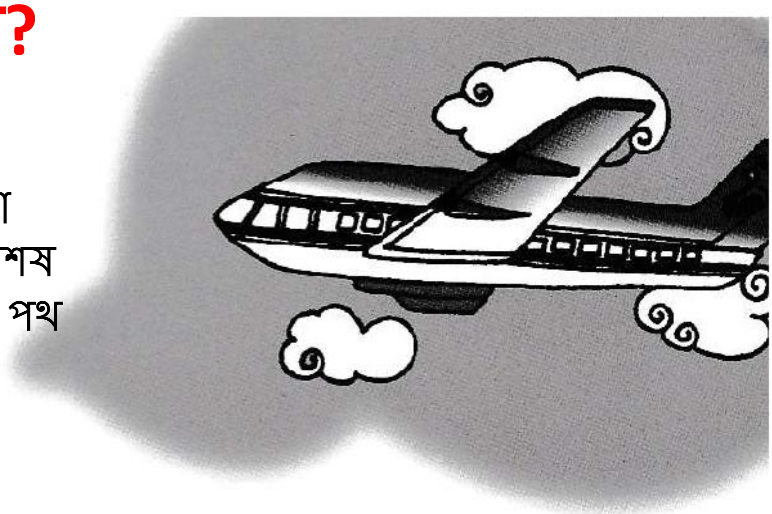
P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?



আমি মাটির ওপর আঁকা একটি রেখা
যার নেই কোনো শুরু, নেই কোনো শেষ
তবে আছে প্রবেশের ও প্রস্থানের বহু পথ

প্রতিদিন বহুবার আমি আসা-যাওয়া করি
বহু মুখ আমি দেখি, যা কেবলই বদলায়
অগণিত মানুষকে আমি তুলে নিই ও নামিয়ে দিই
আর তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করি



আমার কোনো পাখনা নেই
আমার কোনো লেজ নেই
জলের ওপর দিয়ে আমি ভেসে চলি
আমার পালের বুকে বাতাস নিয়ে

তারা কখনোই আলাদা হয় না—তবু তারা বন্ধু নয়
তারা কখনোই মুখোমুখি হয় না—তবু তারা শত্রু নয়



বারবার পথ মাড়িয়ে
আমি তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই
তুমি আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে বয়ে নিয়ে চলো
চড়াই-উতরাই—সব পথেই!



ছুটছে, ছুটছে, সশব্দে ছুটে চলেছে
দুটি রেখার ওপর দিয়ে ছুটছে—উ-উ, উ-উ!
বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদী পেরিয়ে
থামছে এসে গ্রামের মাঝে! উ-উ, উ-উ!
হ্যালো! বিদায়! উ-উ, উ-উ!

আমাকে চালাতে হলে তোমাকে লাথি মারতে হবে!
দুটি গোল চাকা ঘুরছে অবিরাম
দুটি বলিষ্ঠ ঘাড় টানছে সামনে
আটটি লম্বা পা ফেলছে দীর্ঘ পদক্ষেপ
আর একজন সতর্ক কৃষক দিচ্ছে দিকনির্দেশনা



ওই আসছে সে, অনেক উঁচুতে
দেখো তার ডানা, কী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে
ওই তার লেজ, দীর্ঘ ও ঋজু
ওই চলে গেল সে—বহুদূরে, বহুদূরে!





তোমার মনোযোগ কাড়তে আমি চিৎকার করে উঠি,
তারপর তোমার কানে কানে ফিসফিসিয়ে কথা বলি।



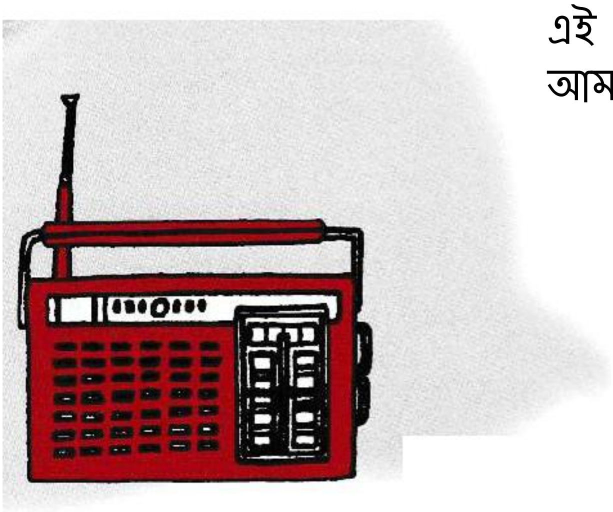
তুমি যা–ই বলো, আমি সবটুকু শুষে নিই,
আর যখন তুমি 'প্লে' (Play) বোতামটি চাপো,
আমি তা হুবহু ফিরিয়ে দিই।

আমি আসি সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে—
এখানে পৌঁছাতে কতই না পথ চলতে হয়েছে আমাকে!
তুমি ছুটে আসো আমার সাথে দেখা করতে,
সুসংবাদের আশায়, গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে।

কেনা হয়ে গেলে আমি এক জায়গায় আটকে যাই,
আর আটকে যাওয়ার পর, মাড়ানো হয় আমাকে !
আমার লেজটি থাকে খাড়া—যদিও তাতে কোনো লোম নেই!
বাতাস থেকে সংকেত (Signals) ধরে এনে,
সে তোমাকে পৌঁছে দেয় পৃথিবীর সব প্রান্তের খবর।

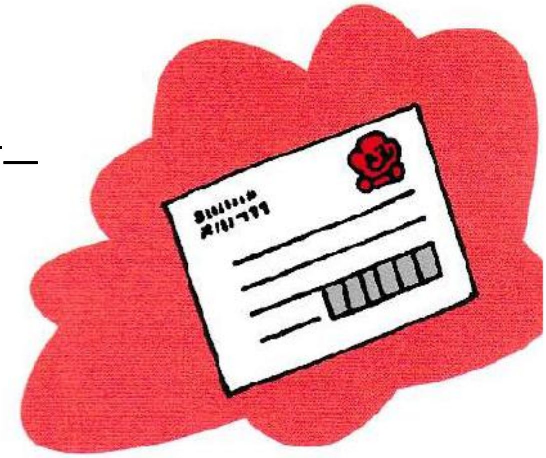


পথচলার ধুলো মেখে,
আমি এসে দাঁড়াই তোমার দুয়ারে।
তুমি আমাকে ঘরে তুলে নাও,
আর আমার বলা কথাগুলো তৃষ্ণার্তের মতো
পান করো।



এই জাদুর বাক্সের ভেতর দিয়ে,
আমরা দেখতে পাই বিশাল এই পৃথিবীটাকে!

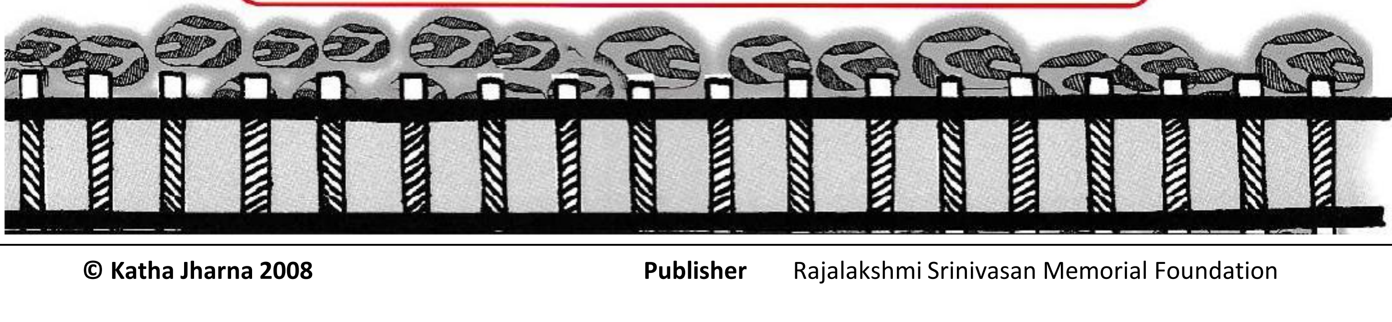
দূর-দূরান্তের সব বার্তা এসে,
মিশে যায় এই উজ্জ্বল বাক্সের মাঝে,
আর তারপর ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে।



আমি এমন একটি চিঠি, যা তুমি পাঠাতে পারো—
মাত্র একটি বোতামে ক্লিক করেই।

ভোরের সূর্যের সাথে সাথেই আমি এসে হাজির হই;
আমাকে দেখে তুমি কী যে খুশি হও!
তুমি হয়তো আমাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নাও,
তবে তা কেবল তোমার নিজের তৃষ্ণা মেটার পরেই—
কারণ, আমার ভাণ্ডারে সবার জন্যই থাকে অফুরন্ত জোগান।

সাইকেল, বাস, গরুর গাড়ি, স্কুটার, রাস্তা, রেললাইন, নৌকা, ট্রেন,
উড়োজাহাজ, ডাকপিয়ন, ই-মেইল, টেলিভিশন, সংবাদপত্র,
ডাকবাক্স, রেডিও, টেলিফোন, চিঠি, অডিও রেকর্ডার, ডাকটিকিট।



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

তোত্তো-চান



একদা জাপানে একটি অসাধারণ স্কুল ছিল। তোত্তো-চান নামের এক ছোট্ট মেয়ে সেখানে পড়াশোনা করত। পরবর্তী কালে সে সেই স্কুলটি নিয়ে একটি বই লিখেছিল। সে চেয়েছিল, সবাই যেন সেই স্কুলটি সম্পর্কে জানতে পারে। তার মনে হতো, স্কুলটি তার জীবনটাই বদলে দিয়েছিল।

স্কুলটির নাম ছিল 'তোমোয়ে গাকুয়েন'। কিন্তু বইটির নাম ছিল 'তোত্তো-চান: জানালার ধারের ছোট্ট মেয়েটি'। সে তার বইটির নাম 'তোমোয়ে গাকুয়েন' না রেখে 'তোত্তো-চান' রেখেছিল কেন? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো—আপনি প্রথমে কোন বইটি হাতে তুলে নেবেন? একটি স্কুল নিয়ে লেখা বই, নাকি জানালার ধারে বসে থাকা এক ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে লেখা বই?

তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের গেটের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো দুটি চারাগাছ। ভাবুন তো একবার—গেটের খুঁটিতে রয়েছে শিকড় আর পাতা! স্কুলের মাঠের চারপাশে কোনো দেয়াল ছিল না। তার বদলে ছিল শুধুই গাছপালা! সারি সারি গাছ, আর তাদের পাশেই ফুলের বাগিচা ।

এমন এক সীমানার ভেতরে অবস্থিত শ্রেণিকক্ষগুলোও কি তবে বিশেষ কিছু ছিল না? অবশ্যই ছিল! তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের সবকটি শ্রেণিকক্ষই ছিল আসলে পুরনো রেলগাড়ির বগি। সেখানে মোট ছয়টি বগি ছিল—প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি করে। এই বগিগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুন করে রং করা হয়েছিল। দেখে মনে হতো, যেন এখনই চলতে শুরু করবে! কিন্তু বগিগুলোর ভেতরে নতুন করে ডেস্ক, চেয়ার আর ব্ল্যাকবোর্ড সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

তোত্তো-চান তার শ্রেণিকক্ষের জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারত। সে কল্পনা করত, যেন ট্রেনটি ছুটে চলেছে। জানালার সামনে দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে নানা রকম দৃশ্যপট। তবে সে খুব একটা এমনটা করত না—আর তার কারণটি ছিল বেশ অদ্ভুত: সে তার পড়াশোনার কোনো অংশই বাদ দিতে চাইত না!

তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল বেশ আনন্দদায়ক! প্রথমে শিক্ষকরা ব্ল্যাকবোর্ডে আলোচনার বিষয়গুলোর একটি তালিকা লিখে দিতেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বেছে নিত যে, তারা কোনটি নিয়ে পড়াশোনা করবে।



তোত্তো-চানের প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে প্রতিটি শিশু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করত। কেউ কেউ বর্ণমালা লেখার অনুশীলন করত। একটি মেয়েকে সব সময়ই দেখা যেত বই পড়তে। অন্য শিশুরা ছবি আঁকত। কেউ কেউ তো আবার শরীরচর্চাও করত। তারা সবাই গভীর মনোযোগের সাথে নিজেদের কাজ করত। তোত্তো-চানের স্কুলে কেউ কখনোই একঘেয়েমিতে ভুগত না!

মাঝে মাঝে স্কুলের সীমানার বাইরেও নানা ধরনের কার্যক্রম চলত। শিক্ষকরা প্রায়ই শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলবেঁধে হাঁটতে বের হতেন। হাঁটার পথের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছিল কলকল ধ্বনি তোলা একটি ছোট নদী। চেরিগাছের ছায়ায় ঢাকা ছিল সেই পথটি। পথটি গিয়ে মিশেছিল কাছেই অবস্থিত একটি মন্দিরের আঙিনায়। মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা পুকুরটির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। সেখানে পড়ে থাকা ছোট ছোট কালো নুড়িপাথর দিয়ে তারা 'হপ-স্কচ' (এক-পায়ে লাফিয়ে খেলার একটি খেলা) খেলত। বিশাল বিশাল মূর্তিগুলোর দিকে তারা বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকত। শিক্ষক তাদের ততক্ষণ খেলতে দিতেন, যতক্ষণ না তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। দলবেঁধে বাইরে ঘুরতে যাওয়াটা তোত্তো-চানের কাছে সব সময়ই ছিল সবচেয়ে প্রিয়!



মাঝে মাঝে পুরো স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিলে অডিটোরিয়ামের ভেতরে তাঁবু খাটাত। সেখানেই তারা রাত কাটাত। স্কুলের মোট পঞ্চাশজন শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই-ই এই ধরনের রাত্রিযাপনের আয়োজনে অংশ নিতে আসত।

একদিন প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বললেন, "আমি তোমাদের একটি পরীক্ষা নেব। এটি হবে সাহসিকতার পরীক্ষা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূতের ভূমিকা পালন করবে। তোমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে লুকিয়ে থাকবে। আর বাকিরা সেই 'ভূতদের' খুঁজে বের করতে যাবে।"

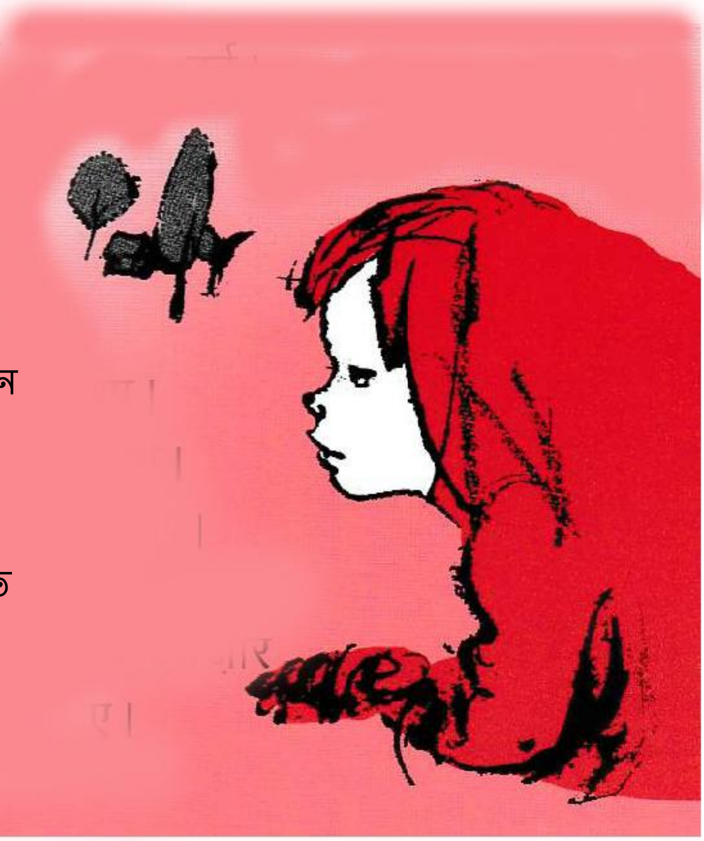
"কে কে ভূত হতে চাও?" তিনি জানতে চাইলেন। সাতজন শিশু হাত তুলল।

পরীক্ষার দিনটি এল। সন্ধ্যায় শিশুরা অডিটোরিয়ামে তাদের তাঁবু খাটিয়ে নিল। 'ভূত' সাজার দলের শিশুরা ভূতের পোশাক পরে সেজেগুজে তৈরি হলো। তারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে গেল, যাতে লুকিয়ে থাকার মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিতে পারে।

যাওয়ার পথে তারা অন্য শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাল। "আমরা কিন্তু তোমাদের সত্যিই খুব ভয় পাইয়ে দেব!" তারা বলল। এবার বাকি শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গেল। তারা 'রক, পেপার, সিজারস' খেলার মাধ্যমে এই দলগুলি তৈরী করল। তোত্তো-চান পাঁচজনের একটি দলে পড়ল।

শিক্ষক সেই 'ভূত-সন্ধানীদের' বললেন, "তোমরা যদি পুরো পরীক্ষাটি শেষ করতে না-ও পারো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তখন আর সবার মতোই তোমরা স্কুলে ফিরে চলে এসো।" (তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের অন্যতম সেরা একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কখনোই শাস্তি দেওয়া হতো না!)

সময় হয়ে এল। তারা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। দলগুলো সেই 'ভূতদের' খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তোত্তো-চানের দলটি ধীরগতিতে হাঁটছিল। চারপাশ তখন নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কোনো কোনো শিশু ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল; তাদের কাঁপুনি থামছিলই না। গাছের পাতার ফাঁকে যখন বাতাস শোঁ-শোঁ করে বয়ে গেল, তখন তারা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল—"উউউহ!" চলার পথে তাদের পা ফসকে গেলে বা তারা হোঁচট খেলে, তারা ভাবত—"নিশ্চয়ই কোনো ভূত আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে!" যদি কোনো বন্ধু তাদের হাত ধরে ফেলত, তবে তারা সজোরে হাতটি সরিয়ে নিত। তারা মনে মনে ভাবত—"এ নিশ্চয়ই কোনো ভূতের হাত!"

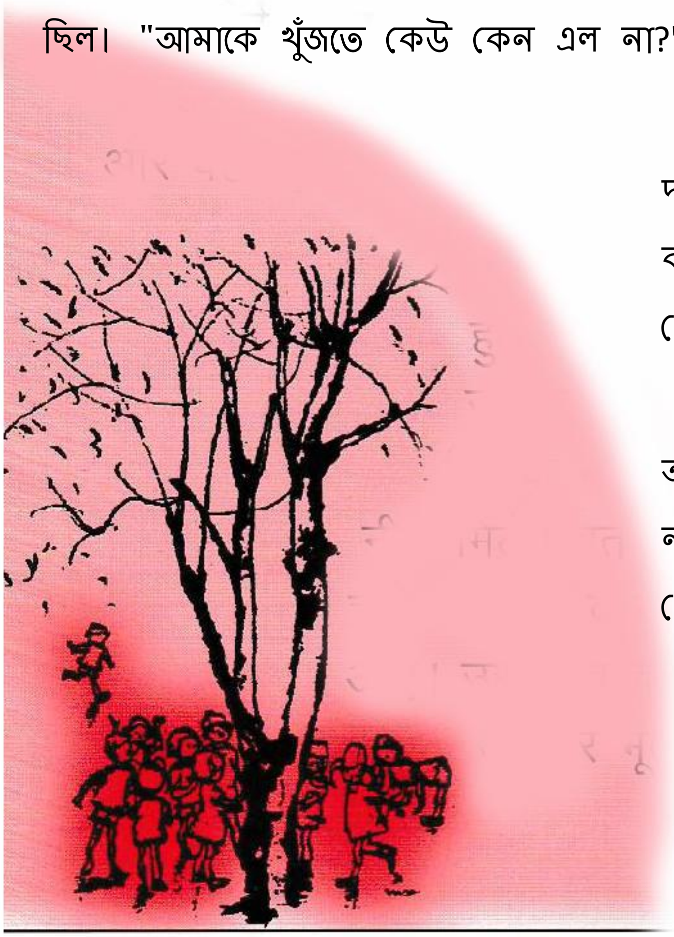


শীঘ্রই সবারই আর ধৈর্য রইল না। তোত্তো-চান তার দলের সবাইকে নিয়ে দৌড়ে স্কুলে ফিরে এল। অন্য দলগুলোও ঠিক তাদের পিছু পিছু এল! আর আরও অনেক দল তো আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল! আচ্ছা, কোনো শিশু কি আদৌ সেই "ভূতদের" খুঁজতে গিয়েছিল?

কিছুক্ষণ পর, সেই "ভূতদের" একজন দৌড়ে এল। সে ছিল একটি ছোট ছেলে। সে কাঁদছিল। তাকে খুঁজতে কেউ-ই আসেনি। তাই সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। একজন শিক্ষক তাকে মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্কুলে ফিরিয়ে আনলেন।

ঠিক তখনই আরও একটি "ভূত" কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এল। তার সাথে ছিল একজন "ভূত-সন্ধানী "। আর সেই সন্ধানী ও কাঁদছিল! সেই "ভূতটি" টের পেয়েছিল যে একজন ভূত-সন্ধানী তার দিকেই আসছে। তাই তাকে ভয় দেখানোর জন্য সে হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দুজনে একে অপরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেল! দুজনেই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল! এই ঘটনাটি শোনার পর বাকি সব শিশু হো হো করে হেসে উঠল। শীঘ্রই সেই "ভূতগুলোও" তাদের সাথে হাসিতে যোগ দিল।

সবশেষে এল খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি পোশাক পরা একটি "ভূত"। সে ভীষণ রেগে ছিল। "আমাকে খুঁজতে কেউ কেন এল না?" সে জানতে চাইল।



শিশুটির হাত-পা জুড়ে ছিল মশার কামড়ের দাগ। "দেখো!" শিশুরা হেসে উঠল। "এ তো মশার কামড় খাওয়া ভূত!" বেচারা সেই "ভূতটিও" শেষমেশ তাদের সাথে না হেসে পারল না।

সেই দিন থেকে, তোত্তো-চান কিংবা তার স্কুলের অন্য কোনো সহপাঠী—কেউই আর ভূতকে ভয় পেত না। কারণ, দিনশেষে দেখা গেল—ভূতরাও তো ভয় পেতে পারে!

তেৎসুকো কুরোয়ানাগির স্মৃতিকথার ডরোথি ব্রিটনের করা অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।

চিত্রশিল্পী: চিহোরো ইওয়াসাকি

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

স্মৃতিচারণ

প্রিয় মঞ্জু,

আমি এইমাত্র গান্ধীজির আত্মজীবনী—'আমার সত্য অন্বেষণের কাহিনী' (The Story of My Experiments With Truth)—পড়া শেষ করলাম। বইটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর!

বইটিতে গান্ধীজির জীবনের প্রারম্ভিক সময়ের নানা ঘটনার কথা বলা হয়েছে—সেই সময়কার কথা, যা আমরা স্কুলে পড়া 'লবণ সত্যাগ্রহ' বা 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এরও আগের ঘটনা। এই বইটি পড়ে আমি গান্ধীজির জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

তাঁর শৈশবকালটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়! জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর বয়স যখন আনুমানিক বারো বছর, তখন তিনি 'শ্রবণ'-কে নিয়ে লেখা একটি বই পড়েছিলেন। তুমি কি শ্রবণের কথা শুনেছ? তাঁর বাবা–মা ছিলেন দৃষ্টিহীন। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে তাঁরা শ্রবণের ওপরই নির্ভর করতেন। আর শ্রবণও তাঁদের সেবাযত্ন ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিলেন। কিশোর গান্ধীজি শ্রবণের জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি একটি চিত্রপ্রদর্শনও দেখেছিলেন। সেই চিত্রাবলিতে দেখা গিয়েছিল, শ্রবণ একটি কাঠের বাঁকের দুই প্রান্তে ঝোলানো দুটি ঝুড়ির মধ্যে তাঁর বাবা–মাকে বসিয়ে, সেই বাঁকটি নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে চলেছেন!

শ্রবণের এই কাহিনি গান্ধীজির মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি সংকল্প করলেন যে, শ্রবণের মতোই গভীর ভালোবাসা দিয়ে তিনিও তাঁর বাবা–মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন।



গান্ধীজির মনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী আরেকটি কাহিনি হলো রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রের জীবনভিত্তিক একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি বারবার সেই নাটকটি দেখতে যেতেন। একবারের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি বোধ করেননি! সেই নাটকের দৃশ্যগুলো তাঁর মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি সর্বদা সেই দৃশ্যগুলো নিয়েই ভাবতেন।

হরিশ্চন্দ্রকে কতই না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল! তাঁর পুরো পরিবারকেই দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল! তবুও তিনি তাঁর দেওয়া কথা বা প্রতিজ্ঞা থেকে একচুলও সরে আসেননি। গান্ধীজি ঠিক তাঁর মতোই হতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন, "হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যবাদী কেন সবাই হতে পারে না?" এই প্রশ্নটি দিন-রাত তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

গান্ধীজি তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও হরিশ্চন্দ্র এবং শ্রবণ—উভয়েই তাঁর কাছে ছিলেন রক্তমাংসের গড়া জীবন্ত ও বাস্তব মানুষ।

গান্ধীজি তাঁর বইতে স্কুলের দিনগুলোর আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যার জন্য পরবর্তীকালে তাঁকে গভীর অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

হাইস্কুলে পড়ার সময় গান্ধীজির এমন একজন বিশেষ বন্ধু ছিল, যাকে অন্য কেউ পছন্দ করত না। সবাই গান্ধীজিকে পরামর্শ দিত সেই বন্ধুর সঙ্গ এড়িয়ে চলতে। তারা বলত, "এই ছেলেটি বিপথে চলে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে।" কিন্তু গান্ধীজি সেসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করতেন না। তিনি কারও কথাই শুনতেন না।

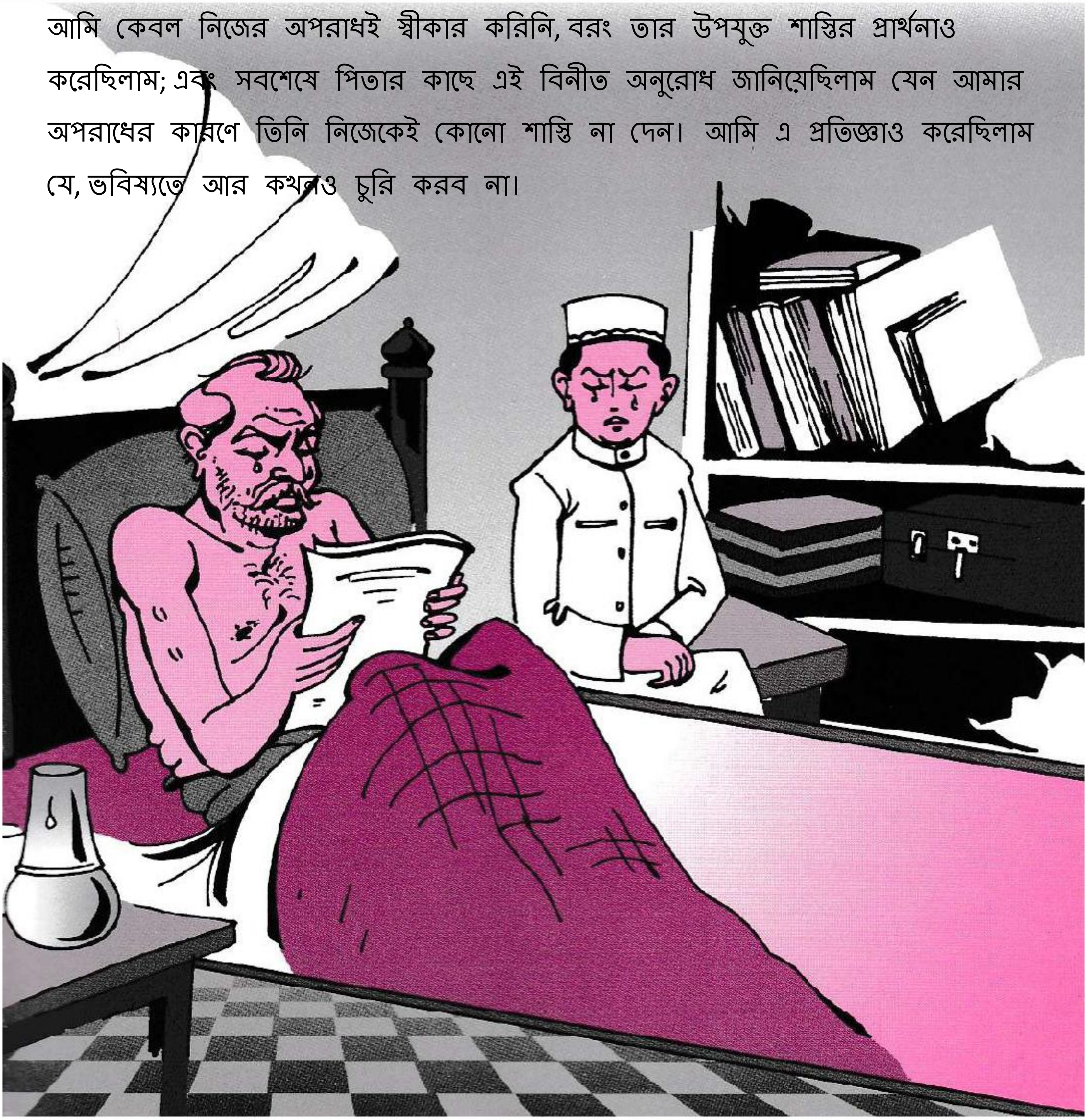
ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, সেই বন্ধুটি গান্ধীজির ওপর এক গভীর ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো। তাঁর মনের গতিপথ বদলাতে শুরু করল। যখন সেই দুই বালক একসঙ্গে থাকত, তখন তারা কিছু নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করত। তারা সিগারেট টানত, এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু করত।

এমনকি এই বন্ধুত্বের অবসান ঘটার পরেও, গান্ধীজি এমন সব কাজ চালিয়ে গেলেন যা তিনি নিজেও জানতেন যে ভুল। তিনি তো টাকাও চুরি করেছিলেন!

কিন্তু অবশেষে তাঁর বিবেক বিদ্রোহ করে উঠল। এই সময়ের একেবারে শেষভাগে তাঁর মনে যে প্রবল মানসিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, গান্ধীজি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেই মানসিক যন্ত্রণা তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, আর কখনও চুরি করবেন না। এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পিতার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করবেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই সেই কথাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

...আমি মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলাম না...। আমি ভয় পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমার অপরাধের কথা জানলে পিতাকে হয়তো ভীষণ মানসিক কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু আমার মনে হলো, এই ঝুঁকিটুকু নেওয়া প্রয়োজন; কারণ অপরাধ স্বীকার না করলে মনের কলুষতা দূর করা সম্ভব নয়।

অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নিজের অপরাধের কথা লিখে ফেলব, সেই স্বীকারোক্তি পিতার হাতে তুলে দেব এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি কাগজের একটি টুকরোয় সেই কথাগুলো লিখলাম এবং স্বয়ং পিতার হাতে তা তুলে দিলাম। সেই চিঠিতে আমি কেবল নিজের অপরাধই স্বীকার করিনি, বরং তার উপযুক্ত শাস্তির প্রার্থনাও করেছিলাম; এবং সবশেষে পিতার কাছে এই বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলাম যেন আমার অপরাধের কারণে তিনি নিজেকেই কোনো শাস্তি না দেন। আমি এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করব না।



পিতার হাতে সেই স্বীকারোক্তি তুলে দেওয়ার সময় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। তখন তিনি 'ফিসচুলা' (ভগন্দর) রোগে ভুগছিলেন এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর বিছানা বলতে ছিল কেবল একটি সাধারণ কাঠের তক্তা। আমি তাঁর হাতে সেই চিঠিটি তুলে দিলাম এবং তক্তাটির ঠিক উল্টো দিকে বসে পড়লাম।

তিনি পুরো চিঠিটি পড়ে শেষ করলেন; আর ঠিক তখনই তাঁর গাল বেয়ে মুক্তার মতো স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল, যা কাগজের টুকরোটিকে ভিজিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চোখ বুজলেন, আর তারপর সেই চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিটি পড়ার জন্য তিনি উঠে বসেছিলেন; পড়া শেষে তিনি পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আমিও কেঁদে ফেললাম। আমি আমার পিতার অন্তরের সেই গভীর যন্ত্রণা যেন নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি যদি একজন চিত্রশিল্পী হতাম, তবে আজ আমি সেই পুরো দৃশ্যটির একটি ছবি এঁকে ফেলতে পারতাম। দৃশ্যটি আজও আমার স্মৃতিতে এতটাই জীবন্ত হয়ে আছে।

ভালোবাসার সেই মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়কে কলুষমুক্ত করেছিল এবং আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিল। একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই ভালোবাসার স্বরূপ কী, যিনি নিজে কখনও এমন ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

আমার কাছে এটি ছিল 'অহিংসা'-র এক পরম শিক্ষা। সেই সময়ে আমি এর মধ্যে পিতার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি; কিন্তু আজ আমি জানি যে, তা ছিল বিশুদ্ধ 'অহিংসা'। যখন এই 'অহিংসা' সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে, তখন তা যারই সংস্পর্শে আসে—সবকিছুকেই রূপান্তরিত করে দেয়। এর শক্তির কোনো সীমা নেই।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। বহু জ্ঞানী-গুণী ও কবি সেখানে সমবেত হতেন। স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও একসময় উজ্জয়িনীতে অবস্থান করেছিলেন। এটি ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। সে ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ!

বিক্রমাদিত্য একজন শক্তিশালী ও গুণবান রাজা হিসেবে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত ছিলেন। প্রজাদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা ও সহমর্মিতার কারণে তাঁর প্রজারা তাঁকে খুব ভালোবাসত। তবে যে গুণটি বিক্রমাদিত্যকে চিরস্থায়ী খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তা হলো তাঁর বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি। যখনই তিনি কোনো বিবাদের মীমাংসা করতেন, উভয় পক্ষই সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেত। তাদের পারস্পরিক তিক্ততা প্রশমিত হতো এবং তারা নিশ্চিত হতো যে, প্রকৃত ন্যায়বিচারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বহু বছর ধরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। কিন্তু হায়! কালের অমোঘ নিয়মের কাছে উজ্জয়িনীও হার মানল। কালক্রমে সেই নগরীর সুউচ্চ অট্টালিকা ও মিনারগুলো ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সর্বত্রই অবাধে গজিয়ে উঠল ঘাস ও ঝোপঝাড়। বিক্রমাদিত্য নিজে বেঁচে রইলেন কেবল অন্যান্য রাজাদের স্মৃতিতে, লোকগাথাগুলোতে, এবং নবজাত পুত্রসন্তানদের নাম হিসেবে।

তবে রাজা ভোজের সুশাসনের যুগে তাঁর স্মৃতি পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ঘটেছিল এই রকম :





একদা একদল রাখাল বালক একটি মাঠে খেলা করছিল। সেই মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্রচুর পাথরখণ্ড ও মাটির ঢিবি।

বালকেরা কখনো ঢিবিগুলোর ওপর চড়ে বসত, আবার কখনো পাথরখণ্ডগুলোর আড়ালে 'লুকোচুরি' খেলত।

ঢিবিগুলোর মধ্যে একটি ছিল বাকি সবগুলোর চেয়ে উঁচু। সেটি ছিল ফুলে ও কোমল সবুজ ঘাসে আবৃত—যেন কোনো রাজার সিংহাসন! একটি বালক দৌড়ে সেই ঢিবির চূড়ায় উঠল এবং সেখানে বসে পড়ল। খেলার ছলে সে তার বন্ধুদের বলল, "আমি এখন বিচারক! তোমরা তোমাদের সব বিবাদ বা নালিশ আমার কাছে নিয়ে এসো!"

অন্যান্য বালকেরা এতে বেশ আনন্দ পেল। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি কাল্পনিক মামলার বিষয়বস্তু ঠিক করে নিল। বালকদের মধ্যে দুজন সেই ঢিবির সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, "হে পরম শ্রদ্ধেয় বিচারক! আমার প্রতিবেশী এবং আমি আমাদের জমির সীমানা নিয়ে একমত হতে পারছি না। দয়া করে আপনি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দিন।"

হঠাৎ করেই ঢিবির ওপর বসে থাকা সেই বালকটির মধ্যে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এল! তার চালচলন ও কন্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছিল, সে যেন সত্যিই একজন বিচারক। এবং সে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত একটি রায় প্রদান করল।

কী চমৎকার এক খেলা! বালকেরা একে একে তাদের বন্ধুর কাছে আরও অনেক বিবাদের মীমাংসার জন্য এল। সেই বিবাদগুলোর মীমাংসা করার সময় বালকটি এমনভাবে কথা বলছিল, যেন সে বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। সবাই তার বিচারবুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত তারা সেই নতুন খেলাটি খেলেই চলল। এবার বিচারক তাঁর বিচারাসন থেকে নিচে নেমে এলেন। তিনি আবার সেই ছোট্ট বালকটিতে পরিণত হলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি ও ঠাট্টা-তামাশায় মেতে উঠলেন। দিনের শেষে যেমনটা হয়, ঠিক সেভাবেই তারা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু দিনটি তো মোটেও কোনো সাধারণ দিন ছিল না!

সেই ঘটনার পর থেকে, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি কখনো কোনো প্রকৃত বিবাদ দেখা দিত, তবে শিশুরা সেই বালকটিকেই তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করত। তারা সেই নির্দিষ্ট স্থানে যেত, আর বালকটি সেখানে বসে একটি ন্যায়সংগত রায় প্রদান করত।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষজন তাদের বিবাদ-বিসংবাদ নিয়ে সেই বালকটির কাছে আসতে শুরু করল। সে সেই মাটির ঢিবির ওপর বসে প্রতিটি মামলার সমাধান করে দিত। বিবাদমান পক্ষগুলো সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে সেখান থেকে ফিরে যেত।

এই সব কথা শীঘ্রই রাজা ভোজের কানে পৌঁছাল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সত্যটা অনুমান করলেন: "ঐ বালকটি নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসে আছে!" তিনি তাঁর লোকদের ঢিবিটি খুঁড়তে পাঠালেন। সত্যিই, তারা একটি সিংহাসন খুঁজে পেল। তার পাদদেশে উড়তে উদ্যত ডানাবিশিষ্ট ২৫ জন দেবীর মূর্তি খোদাই করা ছিল।

রাজা ভাবলেন, "যদি আমি এই সিংহাসনে বসি, তবে নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের কৃপা আমার উপর বর্ষিত হবে। আমি সমস্ত বিবাদের বিচক্ষণতার সাথে বিচার করব এবং আমার রায়ে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হব।"

সিংহাসনটি শহরে আনা হলো। একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা সেটিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। বাদক, গায়ক এবং নর্তকীরা এর সঙ্গে ছিল। বিক্রমাদিত্যের অলৌকিক বিচারাসনটির এক ঝলক দেখার জন্য লোকেরা ভিড় জমাল।

সেদিনটি ছিল এক শুভ দিন। উচ্চপদস্থ অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সকলের দৃষ্টি রাজার উপর নিবদ্ধ ছিল, তিনি সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই, খোদাই করা দেবীদের মধ্যে একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। "থামো!" তিনি বললেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসার আগে ভালোভাবে চিন্তা করো। তুমি কি এই সম্মানের যোগ্য?

রাজা দ্বিধা করলেন।

দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি অন্য কোনো রাজার রাজ্য অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করেছ?”

“হ্যাঁ, করেছি,” রাজা বললেন। “আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যোগ্য নই।”





"তিন দিন অপেক্ষা করো," দেবী বললেন। "এই দিনগুলো উপবাস ও ধ্যান করে কাটাও। তারপর আবার চেষ্টা করো।"

তিনি তাঁর খোদাই করা ডানা মেলে উড়ে গেলেন।

তিন দিন ধ্যান ও উপবাসের পর রাজা আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন। খোদাই করা দেবীদের মধ্যে আরেকজন তাঁকে থামতে আদেশ দিলেন। "তুমি কি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য?" রাজা আবার দ্বিধা করলেন।

"তুমি কি অন্য কোনো মানুষের সম্পদ অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করেছ?" দেবী জিজ্ঞাসা করলেন। "হ্যাঁ, করেছি," তিনি বললেন। "আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যোগ্য নই।"

"তিন দিন অপেক্ষা করো," দেবী বললেন। "এই দিনগুলো উপবাস ও ধ্যান করে কাটাও। তারপর আবার চেষ্টা করো।" তিনি উড়ে গেলেন।

এভাবেই প্রায় একশো দিন কেটে গেল! এখন শুধু একটি খোদাই করা দেবী অবশিষ্ট রইলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মন কি একটি শিশুর মনের মতো?"

"না, তা নয়," তিনি উত্তর দিলেন।

এ কথা শুনে দেবী সিংহাসনটি তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনকে মানুষের চোখে সেটাই শেষবার দেখা।

ভালো রাজা ভোজ প্রায়ই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের এই রহস্য নিয়ে ভাবতেন। এমন কী করে হয় যে একজন সামান্য রাখাল সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে, কিন্তু একজন রাজা পারেন না? অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন:

কেবলমাত্র যার হৃদয় পবিত্র, যার মন শিশুর মতো নির্মল, সেই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী হতে পারে। আর কেবল এমন ব্যক্তিই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে পারে।

সিস্টার নিবেদিতার একটি গল্প অবলম্বনে

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

দেখার জন্য তিন দিন



হেলেন কেলার (১৮৮০-১৯৬৮) ছিলেন একজন দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী; তিনি তাঁর সমগ্র জীবন মানবসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন।

দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে হেলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর লেখা এমনই একটি প্রবন্ধ—যার শিরোনাম 'Three Days to See' (দেখার জন্য তিন দিন)—থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

সম্প্রতি আমার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন; তিনি তখন বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরেছেন মাত্র। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি সেখানে বিশেষ কী কী নিরীক্ষণ করেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, "বিশেষ কিছু না।"

আমি মনে মনে ভাবলাম—এ কি করে সম্ভব? এক ঘন্টা ধরে হাঁটার পরেও এমন কিছুই চোখে পড়ল না যা উল্লেখ করার মতো? অথচ আমি—যার দৃষ্টিশক্তি নেই—কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই কত শত বিষয় খুঁজে পাই যা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি একটি পাতার সূক্ষ্ম ও সুষম গঠন অনুভব করি। আমি পরম মমতার সঙ্গে আমার হাত বুলিয়ে দিই 'সিলভার বার্চ' গাছের মসৃণ বাকলের ওপর, কিংবা কোনো পাইন গাছের অমসৃণ ও কর্কশ বাকলের ওপর। বসন্তকালে, শীতের দীর্ঘ ঘুম শেষে প্রকৃতির জেগে ওঠার প্রথম লক্ষণ—অর্থাৎ একটি নতুন কুঁড়ির সন্ধানে—আমি পরম আশার সাথে গাছের ডালপালা স্পর্শ করি। মাঝে মাঝে, যদি আমি খুব ভাগ্যবান হই, তবে কোনো ছোট গাছের ওপর আলতো করে হাত রেখে আমি অনুভব করতে পারি—সেখানে বসে কোনো পাখি হয়তো তখন পূর্ণ কণ্ঠে গান গাইছে, আর তার শরীরের সেই আনন্দের শিহরণ আমার হাতে এসে লাগছে।

কখনো কখনো, এই সবকিছু নিজের চোখে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। আমি যদি কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই এতখানি আনন্দ লাভ করতে পারি, তবে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে যে কত অপার সৌন্দর্য আমার সামনে উন্মোচিত হতো! আমি মনে মনে কল্পনা করেছি—যদি আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তবে সবার আগে আমি কী দেখতে চাইতাম। আহা! যদি মাত্র তিন দিনের জন্য আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতাম, তবে কত কিছুই না আমি দেখতে পেতাম!

প্রথম দিনটি কাটত অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। আমি আমার সকল প্রিয় বন্ধুকে আমার কাছে ডেকে নিতাম এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম—যাতে তাদের অন্তরের সৌন্দর্যের যে বাহ্যিক প্রকাশ, তা আমি আমার মনের গভীরে গেঁথে নিতে পারি।



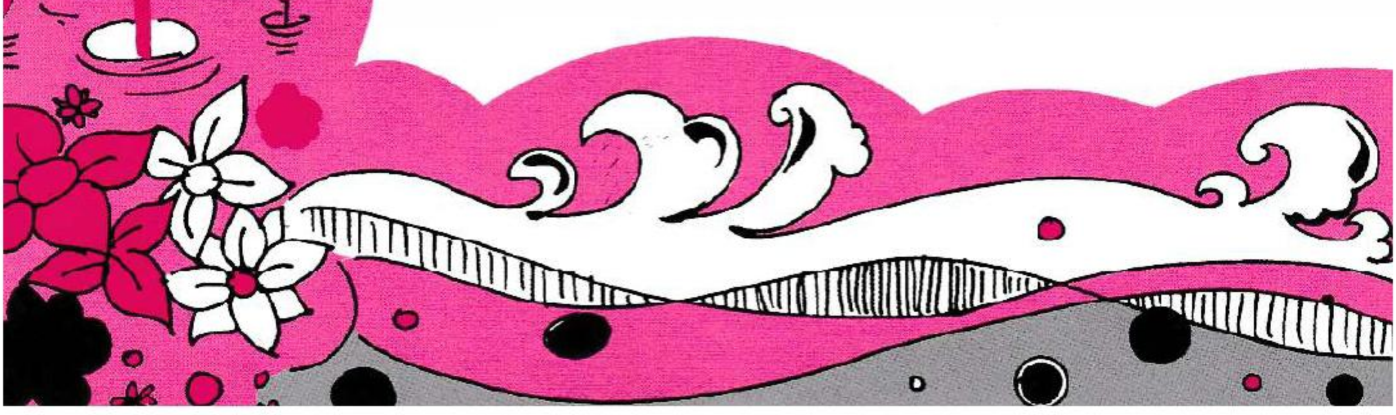


আমি আমার বন্ধুদের চিনি কেবল তাদের মুখের স্পর্শের মাধ্যমে। আমার আঙুলের ডগার স্পর্শেই আমি তাদের মুখের আদল বা অবয়ব 'দেখতে' পাই। আমি তাদের হাসি–কান্না এবং আরও অনেক সুস্পষ্ট আবেগ–অনুভূতি স্পর্শের মাধ্যমেই বুঝতে পারি। কিন্তু আমি জানি না—চোখের মাধ্যমে, যা কি না 'আত্মার জানালা' হিসেবে পরিচিত—কীভাবে একজন বন্ধুর অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করা যায়।

সবার আগে আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে চাই আমার প্রিয় শিক্ষিকার মুখের দিকে—যিনি আমার শৈশবে আমার জীবনে এসেছিলেন এবং আমার সামনে এই বিশাল বহির্জগৎ–এর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমি তার চোখে সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখতে চাই, যা তাকে প্রতিকূলতার মুখে অবিচল থাকতে সক্ষম করেছে; এবং সেই সম্পূর্ণ মানবজাতির প্রতি সমবেদনা দেখতে চাই, যা তিনি আমার কাছে এতবার প্রকাশ করেছেন । আমি সেই বইগুলো দেখতে চাই, যা আমার কাছে মানবজীবন ও মানবাত্মার গভীরতম প্রবাহগুলোকে উন্মোচিত করেছে। আর আমি আমার কুকুরগুলোর সেই বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই—যাদের উষ্ণ, কোমল ও কৌতুকময় বন্ধুত্ব আমাকে অপার স্বস্তি এনে দেয়।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সেই প্রথম দিনের বিকেলে আমি বনের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটব এবং প্রকৃতির জগতের সৌন্দর্যে আমার চোখকে বিভোর করে তুলব। আর আমি একটি রঙিন সূর্যাস্তের মহিমার জন্য প্রার্থনা করব। আমার মনে হয়, সেই রাতে আমি আর ঘুমাতে পারব না।

পরের দিন আমি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই জেগে উঠব এবং সেই রোমাঞ্চকর অলৌকিক দৃশ্যটি দেখব, যার জাদুতে রাত রূপান্তরিত হয় দিনে। আমি সবিস্ময়ে সেই আলোর চমৎকার দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে থাকব, যার স্পর্শে সূর্য ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলে।





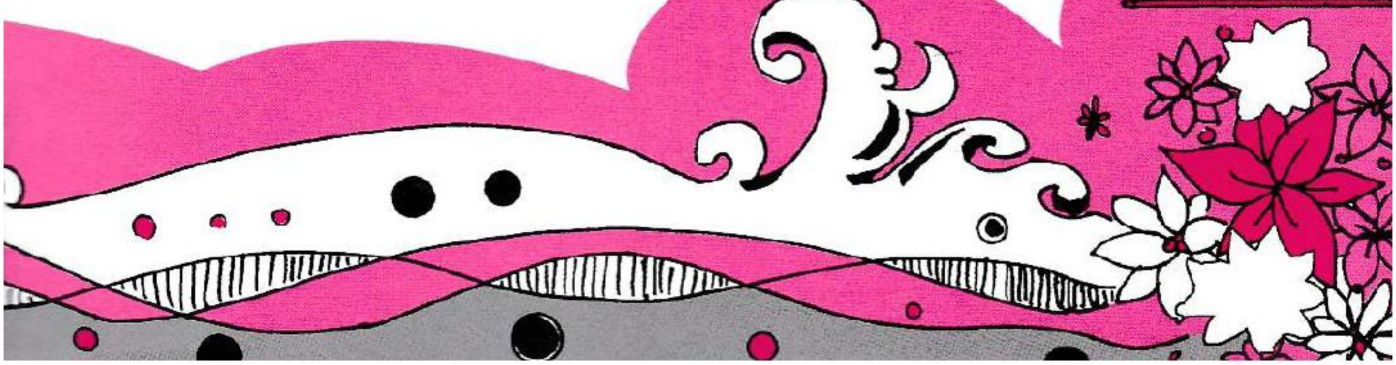
এই দিনটি আমি উৎসর্গ করব অতীত ও বর্তমানের জগতকে এক পলক দেখে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। জাদুঘরগুলোতে গিয়ে আমি মানুষের অগ্রগতির সেই শোভাযাত্রাটি প্রত্যক্ষ করতে চাইব। সেখানে আমার চোখ দেখবে পৃথিবীর ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত রূপ—প্রাণী ও মানুষের ছবি, যা তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্রিত; দেখব ডাইনোসর ও ম্যাসটোডনদের বিশাল বিশাল কঙ্কাল—যারা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগেই এই ধরায় বিচরণ করত।

আমার পরবর্তী গন্তব্য স্থল হবে শিল্পকলা জাদুঘর। দৃষ্টিশক্তির এই দ্বিতীয় দিনে, আমি মানুষের শিল্পের মধ্য দিয়ে তার আত্মার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করব। যে ভাস্কর্যগুলোকে আমি কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই চিনতাম, এখন আমি সেগুলোকে স্বচক্ষে দেখব। আরও চমৎকার বিষয় হল, চিত্রকলার সেই বিশাল ও মহিমান্বিত জগতটি আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

দৃষ্টিশক্তির এই দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাটি আমি কোনো নাট্যশালা কিংবা সিনেমা হলে কাটাব। আমি ভাবি—আপনাদের মধ্যে কতজনই বা আছেন, যারা কোনো নাটক, চলচ্চিত্র কিংবা কোনো দৃশ্যকাব্য দেখার সময় সেই 'দৃষ্টিশক্তির অলৌকিকতা'র কথা উপলব্ধি করেন এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান—যে দৃষ্টিশক্তি আপনাদের সেই দৃশ্যের রঙ, লাবণ্য ও গতিময়তা উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়? আমি একজন নৃত্যশিল্পীর লাবণ্যকে কেবল অস্পষ্টভাবেই কল্পনা করতে পারি; যদিও ছন্দের আনন্দ সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা আছে, কারণ অনেক সময় মেঝের কম্পনের মধ্য দিয়ে আমি সঙ্গীতের তাল বা স্পন্দন অনুভব করতে পারি। আমি বেশ ভালোভাবেই কল্পনা করতে পারি যে, সেই ছন্দোবদ্ধ গতিময়তা নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যতম মনোরম একটি দৃশ্য।

পরের দিন সকালে, আমি আবার ভোরের আলোকে অভ্যর্থনা জানাব—নতুন নতুন আনন্দ এবং সৌন্দর্যের নতুন নতুন রূপ আবিষ্কারের প্রবল আগ্রহ নিয়ে। আজ—অর্থাৎ এই তৃতীয় দিনটি—আমি কাটাবো কর্মচঞ্চল বাস্তব জগতে; সেই সব জনাকীর্ণ স্থানে, যেখানে মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শহরই হয়ে উঠবে আমার গন্তব্য স্থল।





প্রথমে আমি শহরের কোনো এক ব্যস্ত মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই; কেবল মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং তাদের দেখার মধ্য দিয়েই তাদের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে কিছু বোঝার চেষ্টা করি। আমি মানুষের মুখে হাসি দেখি, আর তাতে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমি দেখি মানুষের চোখে দৃঢ় সংকল্প, আর তাতে আমি গর্ব অনুভব করি। আমি দেখি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আর তাতে আমার হৃদয়ে গভীর সহমর্মিতা জেগে ওঠে।

এরপর আমি ‘ফিফথ অ্যাভিনিউ’ ধরে হেঁটে চলি। আমি আমার দৃষ্টিকে কিছুটা অস্পষ্ট বা ঝাপসা করে ফেলি—যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে আমার নজর না পড়ে, বরং চোখের সামনে কেবল রঙের এক জীবন্ত ও বিচিত্র জগত ভেসে ওঠে। আমি নিশ্চিত যে, জনসমুদ্রের ভিড়ে নারীদের পোশাকের বিচিত্র রঙের যে সমাহার ভেসে বেড়ায়, তা নিশ্চয়ই এক অত্যন্ত চমৎকার দৃশ্য—যা দেখে আমি কখনোই ক্লান্ত হবো না।

ফিফথ অ্যাভিনিউ থেকে আমি পুরো শহরটি ঘুরে দেখি—বস্তিতে যাই, কারখানায় যাই এবং সেই সব পার্কে যাই যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। সুখ ও দুঃখ—উভয় জগতের সব দৃশ্য দেখার জন্য আমি আমার চোখ দুটিকে পুরোপুরি মেলে রাখি; যাতে আমি মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারি এবং আমার উপলব্ধির জগতকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি।

4মধ্যরাতে অন্ধত্ব থেকে আমার এই সাময়িক মুক্তি বা বিরতি শেষ হয়ে যাবে; আর আবার আমাকে গ্রাস করে নেবে সেই চিরস্থায়ী অন্ধকার রজনী। স্বভাবতই, এই স্বল্পস্থায়ী তিনটি দিনের মধ্যে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত সব দৃশ্য দেখে শেষ করতে পারব না। কেবল তখনই—যখন আবার অন্ধকারের চাদর আমাকে ঢেকে ফেলবে—আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারব যে, কত কিছুই না আমার দেখা বাকি রয়ে গেল! কিন্তু আমার মন এমন সব চমৎকার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে যে, অনুশোচনা করার মতো সময় আমার হাতে খুব কমই থাকবে। এরপর থেকে, যেকোনো বস্তুর স্পর্শই আমার মনে সেই বস্তুর রূপের এক উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে।

সম্ভবত, দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আমি কীভাবে আমার সেই তিনটি দিন অতিবাহিত করব—তার এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি আপনার নিজের ঠিক করা কর্মসূচির সাথে মিলবে না; বিশেষ করে যদি আপনি আগে থেকেই জানতেন যে, আপনি শীঘ্রই অন্ধ হয়ে যেতে চলেছেন। তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনি যদি সত্যিই এমন পরিণতির মুখোমুখি হতেন, তবে আপনি আপনার চোখ দুটিকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন—যা আগে কখনো করেননি। আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসা প্রতিটি বস্তুই তখন আপনার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠত। আপনার চোখ যেন তার স্পর্শ ও আলিঙ্গন দিয়ে আপনার দৃষ্টিসীমার ভেতরের প্রতিটি বস্তুকে আপন করে নিত। আর ঠিক তখনই—অবশেষে—আপনি প্রকৃত অর্থে 'দেখতে' পেতেন; আর আপনার সামনে উন্মুক্ত হতো সৌন্দর্যের এক সম্পূর্ণ নতুন জগত।

আমি—যিনি দৃষ্টিহীন—দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষদের উদ্দেশ্যে একটি পরামর্শ দিতে পারি। আপনারা আপনাদের চোখ দুটিকে এমনভাবে ব্যবহার করুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনারা অন্ধ হয়ে যাবেন। আর এই একই পদ্ধতি আপনারা আপনাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। মানুষের কন্ঠস্বর, পাখির কলতান কিংবা কোনো অর্কেস্ট্রার সুগম্ভীর সুর—সবকিছুই এমনভাবে শুনুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনারা বধির হয়ে যাবেন। প্রতিটি বস্তুকে এমনভাবে স্পর্শ করুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনাদের স্পর্শশক্তি লোপ পেতে চলেছে। ফুলের সুবাস নিন, প্রতিটি গ্রাস পরম তৃপ্তির সাথে আস্বাদন করুন—যেন মনে হয়—আগামীকাল থেকে আপনারা আর কখনোই কোনো কিছুর ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না। আপনাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। তবে সবকটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, আমি নিশ্চিত যে—দৃষ্টিশক্তিই হল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy